চিন্ময় বঙ্গ

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা - ৯

উৎসর্গ

বর্তমান ভারতের নবযুগের মহানায়ক শ্রীমহাত্মা গান্ধীর নামে চিন্ময় বঙ্গ গ্রন্থ বিনীতভাবে সমর্পণ করি।

ক্ষিতিমোহন সেন

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন রচিত গ্রন্থাবলী

বাংলা

- কবীর
- দাদূ
- ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা
- জাতিভেদ
- প্রাচীন ভারতে নারী
- ভারতের সংস্কৃতি
- বাংলার সাধনা
- হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ
- ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা
- বাংলার বাউল
- যুগগুরু রামমোহন
- বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা

হিন্দী

- ভারতবর্ষমেঁ জাতিভেদ
- সংস্কৃতি সংগম

গুজরাতী

- চীন জাপান যাত্রা
- শিক্ষণ সাধনা
- অংত্রনী সাধনা

ইংরেজী

- মিডিয়াভেল মিস্টিসিজম অব ইণ্ডিয়া
- দি বাউলস অব বেঙ্গল

নিবেদন

১৯২০ সালের গুজরাত সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হন। শান্তিনিকেতন হইতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চার্লস এন্‌ড্রুজ, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার এবং আমি আমেদাবাদে যাই।

সাবরমতী আশ্রমে বসিয়া বাংলা নববর্ষের দিনে বাংলাদেশ সম্বন্ধে মহাগুরু মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে গুরুদেবের সেই সময় দীর্ঘ আলোচনা চলে। ভারতের নিরক্ষর সাধকদের চিন্তাধারা লইয়া আমি জীবনের অধিকাংশ দিন কাটাইয়াছি। জ্ঞানময় বিদগ্ধ জগতের সান্নিধ্যে আসিয়াছি শুধু লোক-সাধনার সঙ্গে ছন্দের মিল দেখিতে।

এই দুই মহাপুরুষের মিলনে সেই সন্ধান অনেকটা সহজ হইয়া আসে।

সাবরমতী আশ্রমের আলোচনায় শ্রোতা হিসাবে শান্তিনিকেতনের আমাদের দল ছাড়া সেদিন ছিলেন গুজরাতের করুণাশঙ্কর কুবেরজী ভট্ট, হরিপ্রসাদ মেহতা, মহাদেব দেশাই, ইন্দুলাল যাজ্ঞিক এবং আশ্রমিকবৃন্দ। আলোচনায় এই কথাই স্বীকৃত হয় যে, কোনো জাতি বা গোষ্ঠী যদি নিজের সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য বা চিন্তাধারা হারাইয়া ফেলেন তাহা হইলেই এক দল অপর দলকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত হন। ফাঁকাবুলির সাহায্যে জাতিগত বা সমাজগত বাহবা লইয়া থাকেন। ইহাই বর্তমান ভারতের প্রাদেশিকতার রূপ লইয়াছে। সাবরমতী আশ্রমে এবং পরে সাহিবাগে গুরুদেবের সঙ্গে মহাত্মার আলোচনার সময়ে এই ধরণের লেখার কথা আমার মনে আসে।

'চিন্ময় বঙ্গ' গ্রন্থখানির নানা অংশ নানা সময়ে অবসরমত লেখা; একটানা লেখা নয়। তাই একটা কথা একাধিক স্থলে উল্লিখিত

হওয়া অসম্ভব নয়। পূর্বে লেখা হইয়া থাকিলেও দুই-একটি টিপ্পনী হয়তো অনেক পরে যুক্ত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বাংলার বৈদ্যক গ্রন্থের বিষয়ে গুরুপদ হালদার প্রণীত বৈদ্যক-বৃত্তান্ত গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা গেল।

'চিন্ময় বঙ্গ' গ্রন্থের কোনো কোনো অংশ বহুদিন পূর্বে প্রবাসী প্রভৃতি মাসিক পত্রে অংশত বাহির হইয়াছিল।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমার বন্ধুবান্ধবগণ যে সহায়তা করিয়াছেন তাহার সম্যক উল্লেখ অসম্ভব। বিশেষতঃ বন্ধুবর শ্রীনন্দলাল বসুর ঋণশোধের প্রয়াস একেবারে অচিন্তনীয়। প্রচ্ছদপটে তাঁহার অপূর্ব সৃষ্টি শ্রীচৈতন্যদেবের চিত্রখানির তুলনা করার শক্তি আমার নাই।

জীবন-সায়াহ্নের ক্লান্ত শরীরে এই গ্রন্থের প্রুফ ইত্যাদি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব হয় নাই; ভুল-ত্রুটি থাকিলে পাঠক অপরাধ মার্জনা করিবেন।

ক্ষিতিমোহন সেন

॥ সূচীপত্র ॥

বীরাচার ও পশ্বাচার

আমাদের দেশের সাধকরা বলেন কায়া দুই প্রকার, মৃন্ময় ও চিন্ময়। মৃন্ময়ের সীমা এই দেহেরই মধ্যে। চিন্ময় কায়াকে কর্ম জ্ঞান ও প্রেমের দ্বারা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করিতে পারা যায়। মানুষেরই এই আত্মবিস্তৃতির সাধনায় অধিকার, পশুর ইহাতে অধিকার নাই। যে মানুষ আপনাকে বহুদূর ব্যাপ্ত করিতে পারে সে-ই বীর, নহিলে সে পশু। ইহাই যথার্থ বীরাচার ও পশ্বাচারের মর্মকথা।

পশুও তাহার আপন সন্তান ও কখনও কখনও আপন দলের মধ্যে আপনাকে ব্যাপ্ত করে কিন্তু সে ব্যাপ্তি সামান্য, এবং অনেক সময় তাহার মূলে স্বার্থ লোভ ও দুর্বলতা। নিস্বার্থ নিষ্কাম অহেতুক ব্যাপ্তির মূলে চাই বৃহৎ বীর্য ও সাধনা। তাই বীরাচার ও পশ্বাচার স্বতন্ত্র বস্তু।

বীর সাধকেরও কায়া থাকে, ক্ষুধা তৃষ্ণা জীবনসংগ্রাম তাহারও আছে কিন্তু তবু তাহার অন্তরে এমন একটি ঐশ্বর্য আছে যে সে আপনাকে কর্মে জ্ঞানে বা প্রেমে বহুদূর প্রসারিত না করিয়া পারে না। বুদ্ধ বা চৈতন্য মৈত্রীর দ্বারা আপনাকে সর্ব-জীবে ব্যাপ্ত করিতে পারিয়াছেন, এবং সে জন্য তাঁহাদিগকে কম দুঃখ সহিতে হয় নাই।

পশুকায়া স্থানে কালে সীমাবদ্ধ, বীরকায়া বহুদূর ব্যাপ্ত কিন্তু এই ব্যাপ্তির জন্যই যুগে যুগে সাধকের দল অশেষ দুঃখ সহিয়া আসিয়াছেন।

প্রদীপ যেমন আপন মৃৎপাত্রে যতদিন সীমাবদ্ধ ততদিন সে সুখেই থাকে। যেই মুহূর্তে সে আলোক পরিবেশনের দ্বারা আপনাকে বহুদূরে ব্যাপ্ত করিতে চায় তখন হইতে তাহাকে আপন সকল সঞ্চয় ক্ষয় করিয়া পলে পলে জ্বলিয়া মরিতে হয়। অথচ এই ব্যাপ্তি ছাড়া তাহার সার্থকতাই নাই।

ব্যক্তির মত জাতিরও পশু ও বীর এই দুই সাধনাই আছে। যখন জাতির সাধনা তাহার আপন সীমার মধ্যেই বদ্ধ তখন সেই পশু-সাধনাকে কিছুতেই বীর-সাধনা বলা চলে না। কিন্তু যখন তাহার সাধনা তাহার সঙ্কীর্ণ মৃন্ময় সীমাকে অতিক্রম করিল তখনই হইল তাহা বীরের ধর্ম।

বন্ধন ও মুক্তি

জাতীয় জ্ঞান ও সংস্কৃতি যদি আপন সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকে তবে তাহা অমেধ্য। অশ্বমেধের অশ্ব যখন সর্ব দেশে জয়ী হইয়া ফেরে তখনই তাহা হয় মেধ্য—অর্থাৎ যজ্ঞের যোগ্য। আস্তাবলের ঘোড়াকে দিয়া মজুরী করান চলে, কিন্তু যজ্ঞ করান চলে না কারণ তাহা অযজ্ঞীয়।

চিকিৎসকেরা বলেন, বাসগৃহ ছাড়িয়া মুক্তবায়ুতে নিয়মমত বিচরণ না করিলে স্বাস্থ্য থাকে না। নির্জন কারাগারে বন্দী হইলে বড় বড় শক্তিশালী মানুষও যক্ষ্মাগ্রস্ত হইয়া পড়েন।

কুলার্ণব তন্ত্র বলেন মধুলুব্ধ ভৃঙ্গ যদি এক পুষ্পে বসিয়া থাকে তবে তাহার চলে না, ফুল হইতে ফুলে সে তার বস্তু খুঁজিয়া বেড়ায় তেমনি সাধকও তাহার সাধনার খোঁজে গুরু হইতে গুরুতে গমন করিতে বাধ্য।

মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্বন্তরং ব্রজেৎ॥

কুলার্ণব, ১৩শ উল্লাস।

তাই নানা তীর্থের জল একত্র না করিলে দেবতার পূর্ণাভিষেক হয় না।

তবে ভারতবর্ষ কেন এক সময় তাহার সীমার মধ্যেই বদ্ধ হইল? কোন্ অভিশাপে সে এইরূপ সীমাবদ্ধ হইল? একদিন যখন তাহার অর্ণবপোত সর্বদিকে ধাবিত হইত, তখন তাহার শক্তি ও সম্পদের অন্ত ছিল না। অধ্যাপক সিলভ্যান লেভি বলেন, যেই দিন হইতে ভারতের সমুদ্রযাত্রা বন্ধ হইল তাহার অনতিকাল পরেই তাহার দ্বারে অন্যের আক্রমণ উপস্থিত হইল। জগৎ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ভারত সেই যে হারিতে আরম্ভ করিল তাহার পর তাহার দুর্গতির আর কোথাও অন্ত দেখা গেল না।

আত্মপ্রসার

কাজেই দেখা যাইতেছে ব্যক্তির মত জাতিরও আপনার সীমার বাহিরে না গেলে চলে না। এখন দেখা যাউক আমাদের বাংলা দেশের এই প্রসারের ইতিহাস কিরূপ। বাংলা যদি আপনার ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম না করিতে পারিত তবে মনে করিতাম তাহার মধ্যে জীবন ছিল না। কিন্তু যুগে যুগেই বাংলা দেশের এই প্রসারলীলা দেখা গিয়াছে। চিন্ময় বা বৃহত্তর বঙ্গের ইহাই মূল কথা।

প্রসারের জাতিভেদ নানা কারণে এক এক দেশ আপন সীমাকে ছাড়াইয়া যায়। মানুষের জাতিভেদের ন্যায় এই যাত্রারও জাতিভেদ আছে।

ব্রাহ্মণ-যাত্রা—যখন ধর্ম, জ্ঞান বা সংস্কৃতির প্রচারার্থ বা তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে লোকে বাহিরে যায় বা জ্ঞান বা শিক্ষার জন্য দূর হইতে আহূত হইয়া তাহাকে বাহিরে যাইতে হয়, তখন তাহা ব্রাহ্মণ-যাত্রা। তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে ধর্ম ও জ্ঞান প্রচারার্থ এক কালে এদেশের সব জ্ঞানী ও ধার্মিকগণ যাইতেন তাহাকে এই শ্রেণীর মধ্যে ধরা যায়। তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে যাত্রাও এই শ্রেণীর। ব্রাহ্মণ-যাত্রার আরও উদাহরণ পরে বলা যাইবে।

ক্ষত্রিয়-যাত্রা—দেশ জয়, প্রতিশোধ গ্রহণ প্রভৃতি কারণে দেশ যদি সীমাকে অতিক্রম করে, তাহাকে ক্ষত্রিয়-যাত্রা বলা যায়। পাল রাজারা, বিশেষ করিয়া ধর্মপাল মালব দেশ, অবন্তী, গান্ধার, মদ্র প্রভৃতি রাজাকে বিনত করেন, কান্যকুব্জপতি ইন্দ্ররাজকে সরাইয়া চক্রায়ুধকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। তাম্রলিপ্তপতি অনন্তবর্মা উৎকল জয় করিয়া গঙ্গাবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সব ক্ষত্রিয়-যাত্রা। কলহনের "রাজতরঙ্গিণী" গ্রন্থে গৌড় সৈন্যদের একটি বীরত্বের কাহিনী চমৎকার ভাবে লিখিত হইয়াছে। কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য গৌড়রাজের শত্রু ছিলেন। ললিতাদিত্য এক সময়ে গৌড়রাজকে কাশ্মীরে নিমন্ত্রণ করেন। এমন অবস্থায় যাওয়া নিরাপদ নহে মনে করিয়া গৌড়রাজ যখন নিমন্ত্রণ গ্রহণে ইতস্ততঃ করিতেছেন তখন ললিতাদিত্য বলিলেন, "আমাদের পূজ্য নারায়ণ-বিগ্রহ 'পরিহাস কেশব' আমার আতিথ্যের প্রতিভূ থাকিবেন, তাঁহার বিনা আদেশে কিছুই অনুষ্ঠিত হইবে না।" এই প্রতিশ্রুতি পাইয়া গৌড়রাজ কাশ্মীরে প্রবেশ করেন। তথাপি ললিতাদিত্য গুপ্তঘাতকের হস্তে তাঁহাকে নিহত করেন। গৌড়পতির সামান্য যে কয়জন অনুচর তাঁহার সঙ্গে ছিল তাহারা এই নৃশংস শঠতায় ক্ষেপিয়া উঠিয়া মধ্যস্থ "পরিহাস কেশব" বিগ্রহকে চূর্ণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। কিন্তু তাহারা রজতময় রামস্বামীর মূর্তিকেই "পরিহাস কেশব" মনে করিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিল। কাশ্মীরের সৈন্যগণ অগণিত সংখ্যায় তাহাদের বেষ্টন করিয়া আক্রমণ করিল কিন্তু বীর গৌড়সৈন্যগণ যুদ্ধ করিতে করিতে একে একে সবাই প্রাণ দিল। কেহ একটুও সরিয়া আত্মরক্ষা করিল না। প্রাণ দিতে দিতে তাহারা পরিহাস কেশব ভ্রমে রামস্বামীর রজতমূর্তি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিল। (কলহনের রাজতরঙ্গিণী, চতুর্থ তরঙ্গ)

এই যাত্রাকে ক্ষত্রিয়-যাত্রা বলাই সঙ্গত।

পালরাজগণ যে বিহার হইতে বাংলায় আসেন নাই বরং বাংলা দেশ হইতে বিহার উত্তর-পশ্চিম প্রভৃতি দেশে রাজ্য-বিস্তার প্রসঙ্গে গিয়াছেন এই কথাটি স্বর্গীয় পণ্ডিত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় ও স্বর্গীয় রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় "গৌড় রাজমালার" ভূমিকায় সুন্দররূপে শিলালিপি প্রভৃতির সাক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

মন্ত্রী গর্গ পূর্বদিকের অধিপতি ধর্মপালকে সকল দিকের অধিপতি করিয়া দিয়াছিলেন।

ধর্ম্মঃ কৃতস্তদধিপ স্ত্বখিলাসু দিক্ষু।
স্বামী ময়েতি বিজহাস বৃহস্পতিং যঃ ॥[১]

দিনাজপুর বদাল, গরুড়স্তম্ভ লিপি, ২য় শ্লোক

পূর্বে গবেষকবৃন্দ "কৃতস্তদিধপ"কে ভুলে "কৃতস্তধিপ" পড়িয়াছিলেন। মুঙ্গেরে দেব পালের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় মুঙ্গেরে তাঁহার জয়স্কন্ধাবার ছিল।[২]

ভাগলপুরে প্রাপ্ত নারায়ণ পালের তাম্রশাসনে দেখা যায় নারায়ণ পালের জয়স্কন্ধাবার ছিল মুঙ্গেরে।[৩]

ইহাতে দেখা যায় ধর্মপাল ইন্দ্ররাজ প্রভৃতিকে পরাজয় করিয়া কান্যকুব্জ রাজ্যে চক্রায়ুধকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

বুদ্ধগয়ার মন্দিরের দক্ষিণে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে কেশব নামক এক পুণ্যার্থী মহীপতি ধর্মপালের নাম অঙ্কিত করিয়াছেন।[৪]

বিহার নগরের ৭ মাইল দক্ষিণ পূর্ব কোণে ঘোষরাবঁা নামক গ্রামে বীরদেবের একটি প্রশস্তি পাওয়া যায়। তিনি কাবুলের অন্তর্গত নগরহার দেশে দ্বিজকুলে জন্মগ্রহণ করেন (শ্লোক ৩)। তিনি বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ভগবান বুদ্ধের ধর্মগ্রহণ করেন। ভগবানের বজ্রাসনের বন্দনা করিতে তিনি বুদ্ধগয়া আসেন এবং যশোবর্মপুরে ভুবনাধিপ দেবপালের পূজা প্রাপ্ত হন (শ্লোক ৯)।[৫]

এই লিপিটি বিহারে উৎকীর্ণ হইলেও ইহাতে অনেক প্রাচীন বঙ্গাক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে।[৬]

গয়াতে কৃষ্ণদ্বারকা মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে ব্যবহৃত একটি পুরাতন লিপিতে জয়পাল দেবের নাম পাওয়া যায়।[৭]

বুদ্ধগয়াতে শক্রসেনের পাষাণ-লিপিতে "শ্রীগোপাল দেব রাজ্যে"—উৎকীর্ণ।[৮]

এই লিপিটির অক্ষর দিনাজপুরে বদালের গরুড়স্তম্ভ লিপির অনুরূপ হওয়ায় পণ্ডিতেরা মনে করেন ইনি দ্বিতীয় গোপাল দেব।[৯]

নালন্দায় বালাদিত্য পাষাণ লিপিতে মহীপাল দেবের রাজ্য সম্বৎ দেওয়া আছে।[১০]

কাশী সারনাথের প্রস্তর লিপিতে দেখা যায় কাশীতে ঈশান চিত্রঘণ্টাটি শত কীর্তিরত্ন নির্মিত হইলে, মহীপালের আদেশে অষ্টমহাস্থান মুলগন্ধকুটি পুনরায় নূতন করিয়া নির্মাণ করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্মচক্রের ও ধর্মরাজিকার জীর্ণ সংস্কার করা হয়।[১১]

কাশী বরুণা সঙ্গমের নিকটবর্তী কমৌলী গ্রামে বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন পাওয়া যায়। বৈদ্যদেব ছিলেন কুমারপালের মন্ত্রী। এই শাসনে দেখা যায় তিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষভুক্তিতে কামরূপমণ্ডলে কিছু ভূমি বরেন্দ্রীর সর্বোত্তর শ্রোত্রিয় সোমনাথ প্রভুকে দান করিয়াছেন।[১২]

এই শাসনে প্রসঙ্গক্রমে বাংলাদেশের বহু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যাইতেছে।

এই জাতীয় সব লিপির দ্বারা বুঝা যায় বাংলার বাহিরে বাঙ্গালীর বাহুবলেরও জয়যাত্রা চলিয়াছিল। ইহাকেও ক্ষত্রিয়-যাত্রা বলা যায়।

বাংলার পাল ও সেন বংশীয় রাজাদের বংশধরগণ হিমালয়ে কুলু, কেওনথাল, মাণ্ডী, সুকেত, নাহান প্রভৃতি রাজ্য স্থাপন করেন।[১৩]

রাজ-রাজড়াদের মধ্যে বিদেশের রাজকন্যা বিবাহ করিয়া আনার প্রথাও চলিত ছিল। গোপালের পুত্র ছিলেন মহীপাল। তাঁহার একটি বিবাহের কথা আমরা দেখিতে পাই মুঙ্গেরে প্রাপ্ত দেবপাল দেবের তাম্রশাসনে। "গৃহমেধী সেই ক্ষিতিপতি, রাষ্ট্রকূটতিলক শ্রীপরবলের কন্যা রন্নাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

শ্রীপরবলস্য দুহিতুঃ ক্ষিতিপতিনা রাষ্ট্রকূট তিলকস্য।
রন্নাদেব্যাঃ পাণির্জগৃহে গৃহমেধিনা তেন॥ (৯ম শ্লোক)

দেবপালদেবের মুঙ্গের তাম্রশাসন

এই ধর্মপালেরই বংশে জাত বিগ্রহপাল, হৈহয় রাজকন্যা লজ্জাদেবীকে বিবাহ করেন।[১৪]

পালবংশীয় রাজা পালক, পেগুর রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। এই রাজার ঔরসপুত্রের নাম অনঙ্গসেতু। তিনি বর্মাদেশস্থিত পেগুতে রাজত্ব করেন ও

১০৮৫ অব্দে রোশান (আরাকান) ও বঙ্গদেশে পরিদর্শনার্থ আসেন। তিনিও পালবংশে বিবাহ করেন।[১৫]

ত্রিপুরা পাটিকেরার রাজকুমার, ব্রহ্মদেশীয় পেগুরাজ ক্যানজিথার কন্যাকে বিবাহ করেন (১০৮৪-১১১২ খ্রীঃ)। আবার অলঙ্গস্থু (১১১২-৮৭) বিবাহ করেন পাটিকেরার রাজকন্যাকে। (ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল্ কোয়ার্টার্‌লি ১৯৩৬ পৃ—৫২৩) ইহাকেও ক্ষত্রিয়-যাত্রার মধ্যে ধরা যায়।

সারনাথে প্রাপ্ত কুমারদেবের লিপিতে দেখা যায়, "শ্রীকুন্দনাথে কৃতী বঙ্গাধিপতির প্রণয়ভাজন বলিয়া যে খ্যাত" তাহাতেই তিনি ধন্য।[১৬]

রামচরিতে সন্ধ্যাকর নন্দী জানাইয়াছেন মহারাজ রামপালের পিতা, বিগ্রহ পাল রাষ্ট্রকূট রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। সেই কন্যার ভাইয়ের নাম মহন বা মথন ছিল।[১৭]

আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া পত্রিকার ১৯২৫-২৬ সালের রিপোর্টে দেখা যায় (১৪৬-১৪৮ পৃ) আরাকানে একটি চন্দ্রবংশ রাজত্ব করিয়াছেন। আরাকানে ম্রোহঙ্গ নামক স্থানে সিথঙ্গ মন্দিরের ভিত্তিতে একটি পাষাণস্তম্ভ আছে। তাহার গায়ে অনেক লেখা। কিন্তু বহুকাল চেষ্টা করিয়াও তাহা পড়া যায় নাই। এখন আংশিকভাবে সেই লেখাগুলির পাঠোদ্ধার করা গিয়াছে। তাহাতে দেখা যায় সেখানকার ১৯ জন চন্দ্রবংশীয় রাজার কথা। ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল কোয়ার্টার্‌লি-তে (১৯৩১, পৃ—৩৭) শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বলেন, খুব সম্ভব এই রাজবংশের সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধ আছে।

স্থানান্তরে এই গ্রন্থেই দেখা যাইতেছে যে বাংলাদেশের সেনরাজদের বংশীয় রাজারা পশ্চিম হিমালয়ের নানা স্থানে গিয়া রাজ্য স্থাপন করেন।

বৈশ্য-যাত্রা : কবি কঙ্কনের চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থে যে দেখি বণিকেরা সিংহলাদি দেশে যাইতেছেন তাহাকে বৈশ্য-যাত্রা বলা যায়।

কিছুকাল যাবৎ যথেষ্ট কৃষি-যোগ্য ভূমির অভাবে যে ময়মনসিংহের কৃষকগণ আসামের নওগাঁ প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বসিয়াছে, ইহাও বৈশ্যযাত্রারই অন্তর্গত।

শূদ্র-যাত্রা : আর ইংরেজ রাজাদের সঙ্গে যে বাঙ্গালী কেরাণীর দল দেশে বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন তাহাকে শূদ্র-যাত্রা ছাড়া আর কি বলা যায়? বৈতনিক বাঙ্গালী লাল পলটনের যে বিদেশ যাত্রা তাহাও এই শ্রেণীর। দক্ষিণ দেশে তাহারা স্থল ও জলপথে ইংরাজের সহায়তার জন্য যাইত।[১৮]

এখনকার দিনের যুদ্ধের নামে যে পৈশাচিকতা, তাহা এই চারি শ্রেণীর বাহিরে। তাহাকে **রাক্ষস-যাত্রা** বলা যায়।

এই চারি জাতীয় সাধনাতেই বাংলাদেশ একসময়ে বিশেষ সৌভাগ্য ও যোগ্যতা দেখাইয়াছে! তাহার অশ্বমেধের অশ্ব কোথাও পরাজিত হয় নাই।

আমাদের মনে রাখা উচিত সৌভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু দুর্ভাগ্যও আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই বৈদিক যুগে বাংলা দেশের ভাষাকে ও বাংলা সংস্কৃতিকে ছোট করিয়া দেখান হইয়াছে। বাংলাদেশের লোককে এবং সেখানকার রচনাকে পাখীর কচকচির সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

বেদোত্তর যুগে বাংলাদেশকে অযজ্ঞীয় বলা হইয়াছে। তীর্থযাত্রা বিনা সে দেশে গেলে মানুষকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। সংস্কৃত সাহিত্যে এজন্য বঙ্গদেশ সম্বন্ধে অনেক গ্লানিকর কথা আছে।

কর্পূরমঞ্জরীপ্রণেতা রাজশেখর কবি একেবারে অনায়াসে লিখিলেন যে বাংলাদেশের গাথাসাহিত্য দেখিয়া সরস্বতী ব্রহ্মাকে বলিলেন যে, হে ব্রহ্মন তোমাকে জানাইতে চাই আমি আর সরস্বতীর কর্তব্য সম্পাদন করিতে চাই না। হয় গৌড়ীয় কবিগণ গাথাকবিতা পরিত্যাগ করুন না হয় আপনারা আর কাহাকেও সরস্বতীর কার্যভার দিন।

বিজ্ঞাপয়ামি ত্বাং ব্রহ্মণ্
স্বাধিকারজিহাসয়া।
গৌড়স্ ত্যজেতু বা গাথাম
অন্যা বাস্তু সরস্বতী॥

প্রমাণ-পঞ্জী

১ এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিয়া, ভলুম্-২ পৃষ্ঠা-১৫১

২ এসিয়াটিক রিসার্চেজ, ভ-১, পৃ-১২৩ ইণ্ডিয়ান্ এন্টিক্যোরি ভ-২১ পৃ—২৫৪

৩ ইণ্ডি, এন্টি, ভ-১৫, পৃ—৩০৫ জার্নাল্ অব্ এসিয়াটিক্ সোসাইটি অব্ বেঙ্গল ভ-৪৭, পৃ-১ প্লেট্‌স্-২৪,২৫

৪ জা এ, সো, বে, ভ-৪ নিউ সিরিজ পৃ—১০১-১০২

৫ ইণ্ডি, এন্টি, ভ-১৭ পৃঃ—৩০৭-৩১২

৬ গৌড়-লেখমালা, পৃ ৪৬

৭ জা, এ, সো, বে, ১৯০০, পৃ—১৯০-১৯৫

৮ জা এ, সো, বে, ভ-৪ (নিউ সিরিজ) পৃ ১০৫
৯ গৌড়-লেখমালা, পৃ ৮৮
১০ জা, এ, সো, বে, ভ-৪ (নিউ সিরিজ) পৃ—১০৬-৭
১১ ইণ্ডিঃ এণ্টি ভ-১৪, পৃ-১৩৯
১২ এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা, ভ-২ পৃ—৩৫০ গৌড়-লেখমালা, পৃ ১২৭
১৩ "সেব্লিঙ্গ হিন্দু ট্রাইব্‌স্ এণ্ড্ কাষ্টম্‌স" পৃ—১৭১-১৭৩
১৪ ইণ্ডি, এণ্টি, ভ-১৫ পৃ—৩০৫
জা, এ, সো, বে, ভ-৪৭ পৃ—১ প্লেট্‌স্-২৪,২৫
১৫ জা, এ, সো, বে, ভ-৪৭ (নিউ সিরিজ) পৃ-৩৮৪
১৬ এপি, ইণ্ডি, ভ-৯, পৃ—৩১৯ শ্লোক-২৬
১৭ এপি, ইণ্ডি, ভ-৯ পৃঃ—৩২১ পৃ ৩২১
১৮ বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী ৩. (২৯)

জৈনধর্ম ও বঙ্গদেশ

ব্রাহ্মণযাত্রার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইল ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারার্থ নিঃস্বার্থভাবে বিদেশযাত্রা। বাংলাদেশ হইতে অতি প্রাচীনকালে বহু জৈন ও বৌদ্ধ গুরু নানা দেশে গিয়াছেন। বাংলা দেশ যে এক সময় বৌদ্ধ ধর্মের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল তাহা সকলেরই জানা। পুরাতন কথা-সাহিত্য, গ্রন্থকাব্য, মূর্তি, মন্দির প্রভৃতি সবই তাহার সাক্ষী। এখনও বাংলার এই বৌদ্ধ মূর্তির ও মন্দিরের নানা অবশেষ মেলে। চীন পর্যটক সাধক প্রভৃতিরাও তাহার সাক্ষ্য দেন। সেই বৌদ্ধদেরও পূর্বে বাংলা দেশ ছিল জৈনধর্মের ভূমি। বিশেষ করিয়া পুণ্ড্রবর্ধন অর্থাৎ উত্তর-বঙ্গে ছিল জৈনদেরই প্রাধান্য। পাহাড়পুরও একটি জৈনস্থান পূর্বেই ছিল।

পৌণ্ড্রবর্ধনে জৈন বা নিগ্রন্থদের বাহুল্যের সাক্ষ্য পাওয়া যায় দিব্যাবদান গ্রন্থে। তাহাতে আছে অশোক যখন চণ্ডাশোক ছিলেন তখন পুণ্ড্রবর্ধনে নিগ্রন্থ-উপাসকেরা একটি পট আঁকিয়া বৌদ্ধধর্মের অবমাননা করায় ১৮০০০ "আজীবক"দের হত্যা করা হয়। নিগ্রন্থ অর্থেই আজীবক বলা হইয়াছে তাহা বুঝাই যায়। তবে দেখা যায় তখন হত্যার উদ্দেশ্যে পুণ্ড্রবর্ধনে ১৮০০০ নিগ্রন্থ বা জৈন পাওয়া গিয়াছিল। রাজেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত অশোকাবদানে গল্পটির একটু ভিন্ন আকার। একজন নিগ্রন্থ আচার্য বুদ্ধকে নিগ্রন্থের পাদমূলে পতিত এইভাবে চিত্রিত করিয়া পুণ্ড্রবর্ধনে চারিদিকে প্রচার করিয়া দেন। অশোক শুনিয়া বলিলেন, "যে ঐ আচার্যের মুণ্ড আনিবে তাহাকে পুরস্কার দিব।" একজন আভীর লোভবশত বীতশোককেই সেই নিগ্রন্থ আচার্য মনে করিয়া তাহার মাথা কাটিয়া লইয়া আসিল। অনুতপ্ত অশোক গুরু উপগুপ্তের কাছে সান্ত্বনা চাহিলেন।[১]

ক্রমে জৈনধর্ম বাংলাদেশে ক্ষীণ হইয়া বৌদ্ধধর্ম প্রবল হইতে লাগিল। বৌদ্ধযুগেও জৈনধর্ম নিঃশেষিত হয় নাই। হুয়েনে সাঙও বহু জৈন ও আজীবককে তখন বাংলাদেশে দেখিয়াছিলেন। আসলে বাহিরের লোকের দৃষ্টিতে জৈন ও আজীবকদের মধ্যে পার্থক্য খুব কম। ভগবতী-সূত্র মতে পুণ্ড্রপতি মহাপদ্ম ছিলেন আজীবকদের ভক্ত। আজীবক ও নিগ্রন্থ জৈনদের মধ্যে এত মিল ছিল যে এই-দুই নামে প্রায়ই গোলমাল হয়। বাংলাদেশে আজীবক ও নিগ্রন্থ (জৈন) উভয় সম্প্রদায়েরই প্রাদুর্ভাব ছিল।

বাংলাদেশেরই পাশে হিমালয়ের পাদমূলে শাক্যরাজ্যে বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি। তাহারও পূর্বে জৈন সাধনাও যে বাংলার আশে-পাশেই গড়িয়া উঠিতেছিল, বহুদিন

বিদেশী পণ্ডিতের দল তাহার সন্ধান রাখেন নাই। কেহ কেহ মনে করেন বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লিখিত "নিগ্রন্থ নাতপুত্ত" আর কেহ নহেন, তিনি জৈন মহাগুরু মহাবীর। তাঁহাদের মতে অতি পুরাতন নিগ্রন্থ সম্প্রদায়ের শিক্ষা ও সাধনাকে বিশুদ্ধ ও যুগোপযোগী করিয়া বর্ধমান মহাবীর এই ধর্মের পত্তন করিলেন।

ইহাঁদের ধর্ম অতি প্রাচীন হইলেও ইহাঁদের শাস্ত্র বহুকাল মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছিল। অনেককাল পরে তাহা লিপিবদ্ধ হয়। অনেকের মতে বৌদ্ধশাস্ত্র লিপিবদ্ধ হইবার পরে জৈনদের শাস্ত্রগুলি লিখিত হইতে আরম্ভ হয়।

এই জৈনধর্মের ধারা অতি প্রাচীন। অনেকে মনে করেন এই ধারা বেদ হইতেও প্রাচীন।[২]

ইহাঁদের আদি শাস্ত্র হইল চতুর্দশ "পূর্ব" বা প্রাচীন তত্ত্ব। তীর্থঙ্কর মহাবীর আপন শিষ্যগণকে এই শাস্ত্রে শিক্ষা দেন। কোনো কোনো মতে তাহারা ছয় পুরুষ অতীত হইয়া গেলে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালে আচার্য ভদ্রবাহু হইলেন জৈন সঙ্ঘের গণনায়ক। দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হওয়ার সূচনা দেখিয়া ভদ্রবাহু সঙ্ঘের এক ভাগ লইয়া কর্ণাটের দিকে গেলেন। সঙ্ঘের বাকি ভাগ দেশেই রহিল। তাহার নেতা হইলেন আচার্য স্থূলভদ্র।

ভদ্রবাহু সমগ্রশাস্ত্র অর্থাৎ চতুর্দশ পূর্ব যথাযথ ভাবে জানিতেন। তিনি বিদেশে গেলে শাস্ত্র ঠিক মত রক্ষা করা কঠিন হইল। তাই স্থূলভদ্রের নায়কত্বে পাটলিপুত্রে মহাসভা আহূত হইল। চতুর্দশ পূর্ব হইতে এগারটি অঙ্গ সংগৃহীত হইল, আর নানা স্থানের নানা প্রকীর্ণ অংশ জুড়িয়া দ্বাদশ অঙ্গ পূরা করিয়া দেওয়া হইল। এই জোড়াতাড়া দেওয়া দ্বাদশ অঙ্গ লইয়াই প্রচণ্ড মতভেদ সুরু হইল।

দুর্ভিক্ষ হেতু দক্ষিণদেশে পরিব্রজনরত ভদ্রবাহু কর্ণাটে শ্রবণবেলগোলাতীর্থে মারা গেলেন। ক্রমে দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী দুর্ভিক্ষের অবসান হইলে, ভদ্রবাহুর দল দেশে ফিরিল। মধ্যে এত বড় একটা যে দীর্ঘকালব্যাপী দুর্ভিক্ষ গেল, সেই জন্য ও বহুদিন পরস্পর হইতে দূরে থাকা প্রভৃতি অন্যান্য নানা কারণে ভদ্রবাহুর ও স্থূলভদ্রের দলে অনেক প্রভেদ দেখা গেল। ভদ্রবাহুর অনুচরেরা তখনও দিগম্বরত্ব প্রভৃতি সন্ন্যাসাশ্রমের প্রাচীন সব বিধি পুরাপুরি বজায় রাখিয়াছিলেন কিন্তু স্থূলভদ্রের অনুচরেরা তখন শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাই তাঁহারা শ্বেতাম্বরী আখ্যা পাইলেন। ভদ্রবাহুর দিগম্বর অনুচরেরা স্থূলভদ্র-চালিত পাটলিপুত্র মহাসভায় শ্বেতাম্বরদের সংগৃহীত শাস্ত্রকে স্বীকার করিতে চাহিলেন না। এই যে দিগম্বর ও শ্বেতাম্বরদের মধ্যে বিরোধ, তাহা আজও

মিটিল না, এখনও তীর্থে তীর্থে ইহাঁদের বিরোধ লাগিয়াই আছে। সমেতশেখর বা পার্শ্বনাথ পর্বতের জন্য উভয় দলের মামলা-মোকদ্দমায় যে বিপুল অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহাতে রৌপ্যময় এক পার্শ্বনাথ পর্বত তৈয়ার করা যাইত। কিছুদিন পূর্বে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে রাজস্থানের কেসরিয়াজী তীর্থে একটি পুরাতন ধ্বজা সংস্কার উপলক্ষে উভয় দলের দাঙ্গায় কত লোক প্রাণ হারাইল!

শ্বেতাম্বরদের যে দ্বাদশাঙ্গ শাস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছিল ক্রমে তাহাও নষ্ট ও লুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর আদিভাগে রাজা ধ্রুবসেনের সহায়তায় গুজরাট বল্লভী নগরে এক মহাসভা আহূত হয়। এবার এই সভায় নায়কতা করিলেন গণী (গণগুরু) আচার্য দেবর্ধি। আচার্য ক্ষমাশরণ নামেও তিনি অভিহিত।

তখন এগারটি অঙ্গ মাত্র চলিত ছিল; দ্বাদশ অঙ্গটি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। যাহা তখনও লোকের স্মরণে ছিল তাহা পুনরায় সংগৃহীত ও লিখিত হইল এবং যথাযথ ভাবে রক্ষা করা হইল। ইহার পর হইতে শ্বেতাম্বর জৈনশাস্ত্র সেইভাবেই চলিয়া আসিতেছে। বিশেষ কোনো পরিবর্তন আর হয় নাই।

পূর্বেও বলা হইয়াছে বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের পূর্বে জৈন মতেরই প্রাদুর্ভাব ছিল। বাঁকুড়া, মানভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় অর্থাৎ রাঢ় দেশে জৈন মূর্তি সর্বত্র পাওয়া যায়। পুরুলিয়া হইতে পাঁচ মাইল দূরে ছররা গ্রামে ১৯১৮ সালে চুনীবাবু ও ডাক্তার এ. জি. ব্যানার্জী শাস্ত্রী অনেকগুলি মূর্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। দামোদর নদীর ধারে বাঁকুড়ার শেষ সীমায় তেলকুপী গ্রামে খুব বিরাট বিরাট জৈনমূর্তি অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। হয়তো সেখানে কোনো জৈন বিহার বা তীর্থস্থান ছিল। মানভূম পাতকুমে নদীতীরে দেখা যায় চারিদিকে শুধু পাষাণ মূর্তি। তাহার মধ্যে অধিকাংশই হইল জৈন তীর্থঙ্করদের।

পঞ্চকোট রাজ্যে অনেক জৈনমূর্তি হিন্দু দেবতারূপে পূজিত, তাহার পূজক সব ব্রাহ্মণ। অথচ কোনো কোনো মূর্তির নীচে জৈন লেখ সব বর্তমান! স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই জন্য দুই একটি মূর্তি যে সরাইয়া লইয়া আসিয়াছিলেন সে গল্প তাঁহার কাছেই শুনিয়াছি। তবু তিনি জৈনমূর্তির অল্পতাই লক্ষ্য করিয়াছেন।[৩]

অনেক স্থানে এইসব মূর্তি ভৈরব নামে পরিচিত, কোথাও কোথাও বা এই সব জৈনমূর্তির কাছে এখন পশু বলিও দেওয়া হয়। প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীরামানন্দ বাবুর কাছেও তাঁহাদের দেশের বহু জৈনমূর্তির কথা শুনিয়াছি।

৬২ অব্দে (কোন অব্দে ?) রাঢ়ের জৈন সাধুর অনুরোধে মথুরাতে জৈনমূর্তি স্থাপিত হয়।[৪]

৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দের একটি জৈন লেখ ও কিছু প্রস্তর মূর্তি পাহাড়পুরে পাওয়া গিয়াছে।[৫]

বটগোহলী বিহারে অর্হতদের মন্দিরে ধূপদীপার্থ এক ব্রাহ্মণ দম্পতি ভূমি দান করিতেছেন দেখা যায়। এই বিহারপতি ছিলেন নির্গ্রন্থ গুরু গুহনন্দী।[৬]

পাহাড়পুরকে জৈনধর্মের কেন্দ্রস্থল বলিয়াই মনে হয়।[৭]

বাংলাদেশে প্রাপ্ত জৈনমূর্তির অধিকাংশই দিগম্বর সম্প্রদায়ের। বাংলাদেশে জৈনমূর্তি নির্মাণের প্রণালীও একটুও স্বতন্ত্র। হয়তো তাঁহাদের ধ্যান ও বিধির কিছু বিশেষত্ব ছিল (প্রমোদলাল পাল, ইণ্ডিয়ান কালচার ভ-৩ পৃ—৫২৯, ৫৩০) এখানে জৈনমূর্তিগুলির মধ্যে পালযুগের শিল্পপ্রভাবই লক্ষিত হয়।

'বসন্ত বিলাস' মতে দেখা যায় চালুক্য রাজা বীর-ধবলের মন্ত্রী বসন্তপালের তীর্থযাত্রা সময়ে তাঁহার সঙ্গে যে সব সঙ্ঘপতি ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেউ গৌড়বঙ্গের সংঘী বা সংঘপতিও ছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও বাংলাতে রীতিমত জৈনসংঘ ছিল। পাহাড়পুরের বিহার পূর্বে ছিল জৈন বিহার পরে হয় বৌদ্ধদের।

বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত মল্লিকার্জুন সূরী, গণপতি বিষ্ণু প্রভৃতির নমস্কার করিলেও নামেই বুঝা যায় জৈন। দ্বাদশ শতাব্দীতে তিনি বাংলা দেশে জীবিত ছিলেন।[৮]

রাঢ়দেশ ছাড়াও বরেন্দ্রভূমিতে এবং মধ্য ও পূর্ববঙ্গে বিস্তর জৈনমূর্তি পাওয়া যায়। এমন কি সুন্দরবনের মধ্যেও কাঁটাবেড়ে গ্রামে এক পার্শ্বনাথের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। কুলপী থানার অন্তর্গত ঘণ্টেশ্বরী গ্রামে আদিনাথের মূর্তি ও মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সুন্দরবনের ২৪নং লাটের মধ্যেও জৈনমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুত কালিদাস মিত্র মহাশয় সুন্দরবনে প্রাপ্ত দশটি জৈনমূর্তির উল্লেখ করিয়াছেন।[৯] সুন্দরবনে মথুরাপুর থানার ৩৯নং তৌজির মধ্যে ২৪নং লাটে রায়দীঘির নদীতে দুই হাত উচ্চ দিগম্বর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ঐখানেই ই-প্লটেএ একবিংশ তীর্থঙ্কর নেমিনাথের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিটি শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের। ঘণ্টেশ্বরী গ্রামে আদিনাথ মূর্তি দেখা গিয়াছে। এই খাড়িমণ্ডলে পার্শ্বনাথ মূর্তিও আছে। তাহা ছাড়া বহু বৌদ্ধমূর্তিও এখানে পাওয়া যায়।[১০]

এখন প্রশ্ন এই—বাংলাদেশে জৈনমূর্তির এত বাহুল্য কেন? নিশ্চয়ই একসময় এই দেশে জৈনমতের বিশেষ প্রভাব ছিল। এইসব বিষয় আমি বহুকাল পূর্বে আমার লিখিত "জৈনধর্মের প্রাণশক্তি" প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এইখানে নূতন কিছু তথ্য সহ সেই প্রবন্ধের কিছু কিছু কথা পুনরায় উপস্থিত করিলাম।

পালরাজাদের সময়ে জৈনধর্ম ক্ষীণ হইয়াছিল এবং বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল। বাংলার অধিকাংশ জৈনমূর্তিতেই পালযুগের শিল্পরীতিই লক্ষিত হয়।

পরেশনাথ পর্বতের জৈন নাম সমেতগিরি। এখানে জৈনদের ২৪ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে ২০ জনই নির্বাণ প্রাপ্ত হন। প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের নির্বাণ স্থান কৈলাস, দ্বাদশ তীর্থঙ্কর বাসুপূজ্যের নির্বাণস্থান ভাগলপুর চম্পাপুরী, দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর নেমিনাথের নির্বাণস্থান গির্ণার অর্থাৎ রৈবতক পর্বত, চতুর্বিংশ তীর্থঙ্করের নির্বাণস্থান বিহার রাজগৃহের নিকট পাবাপুরী। আর ২০ জন তীর্থঙ্কর হইলেন অজিতনাথ, সম্ভব বা শম্ভুনাথ, অভিনন্দন বা অভয়ানন্দ, সুমতিনাথ, পদ্মনাথ, সুপার্শ্বনাথ, চন্দ্রপ্রভ, সুবিধি বা পুষ্পদণ্ড, শীতলনাথ, শ্রেয়াংসু বা অংশুনাথ, বিমলনাথ, অনন্তনাথ, ধর্মনাথ, শান্তিনাথ, কুন্থুনাথ, অরনাথ, মল্লিনাথ বা মল্লনাথ, সুব্রতনাথ, নিমিনাথ ও পার্শ্বনাথ। ইহাঁদের সকলেরই নির্বাণ তীর্থ সমেতগিরি। শেষ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের নামে এই তীর্থ এখন পার্শ্বনাথ পর্বত হইয়া গিয়াছে।

সকল জৈনমত বিচার করিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করেন যে মহাবীরের নির্বাণকাল ৪৬৭ খ্রীঃ পূর্ব হওয়া উচিত, যদিও পূর্ববর্তী অনেকের মতে ৫৪৫ খ্রীঃ পূর্ব হওয়াই সঙ্গত। কিন্তু এখন অনেকে তাহা স্বীকার করেন না।[১১]

পার্শ্বনাথের জন্ম তাহারও ২৫০ বৎসর পূর্বে। পূর্ববর্তী তীর্থঙ্করেরা আরও অনেক প্রাচীন। কাজেই বুঝা যায় সমেত শেখর কত প্রাচীন জৈনতীর্থ। সেখান হইতে আরম্ভ করিয়া রাঢ় মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলা দিয়া এই জৈনধর্ম উড়িষ্যায় প্রবেশ করে। ভুবনেশ্বরের খণ্ডগিরির নানা গুহা, মন্দির ও শিলালিপিতে বুঝা যায় যে খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত এই জৈন প্রভাব কলিঙ্গ দেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল।[১২]

আলোচনার অভাবে এবং পরম্পরা নষ্ট হওয়ায় বাঁকুড়া, মানভূম, বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি জেলার বহুস্থানে এখনও অতি প্রাচীন সব জৈন মূর্তি লোক-লোচনের অগোচরে পড়িয়া আছে।

এখনও সেইসব মূর্তি সম্বন্ধে ভালরূপ অনুসন্ধান তো হয়-ই নাই কয়টা মূর্তিরই বা সন্ধান পণ্ডিতজনেরা পাইয়াছেন? কচিৎ কোথাও দুই একটি মূর্তির মাত্র খোঁজ খবর হইয়াছে।

আচারাঙ্গ সূত্রে দেখা যায় তীর্থঙ্কর বর্ধমান যে দ্বাদশ বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি লাঢ় দেশের জঙ্গলের মধ্যে বহু কষ্ট (উবসগ্গা) পাইয়াছিলেন। "লাঢ়ের বজ্জভূমি ও সুব্ভভূমি কণ্টকতৃণ মাছি-মশায় পূর্ণ। সেখানে পথঘাট ছিল না, কুশয্যায় ও কু-আসনে তাঁহাকে দিন কাটাইতে হইয়াছে।"[১৩]

"সেখানকার লোকে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে, এবং সেই কঠিন দেশের মধ্যে যেখানে লোকে ধর্ম মানে সেখানেও তাঁহাকে কুকুর আক্রমণ করিয়াছে!"[১৪]

"অনেকেই এই সব কুকুরকে বাধা না দিয়া বরং আরও 'ছুকছুক' করিয়া লেলাইয়া দিয়াছে।"[১৫]

"এইজন্য বজ্জভূমির ভিক্ষুরা কঠিন খাদ্যে অভ্যস্ত এবং তাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য লাঠি ও নালী ব্যবহার করেন।"[১৬]

প্রাণীদের প্রতি দণ্ডব্যবহার ত্যাগ করায় অনাগরিক ভগবান নানা ভাবে গ্রামকণ্টক (কুব্যবহার, কুবাক্য প্রভৃতি) সহ্য করিয়াছেন।[১৭]

এই লাঢ়দেশে কোনো কোনো গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতে গেলেই তিনি প্রবেশই পান নাই (অলদ্ধ পূব্বো)।[১৮]

এই লাঢ় কেহ বলেন গুজরাতের দক্ষিণ ভাগ, কেহ বলেন রাঢ়। জ্যাকোবি বলেন বাংলা রাঢ় দেশ।[১৯] এই যা বর্ণনা তাহাতে লোভ করিয়া দাবী করার কিছুই নাই।

এখনও বঙ্গদেশীয় আচারের ব্যবহারের মিলে ও গরমিলে অনেক জৈন মত ও আচারের পরিচয় পাই। জন্মের পর জাতকের ষষ্ঠ দিনে যে ষষ্ঠীদেবীর পূজা হয় তাহাতে বাংলাদেশে মায়েরা সন্তানের কপালে দেবী আসিয়া ভবিষ্যৎ লিখিবেন মনে করিয়া প্রতীক্ষা করেন। জৈনদের মধ্যে এই আচারের বিলক্ষণ চলন আছে।[২০]

শূর, চন্দ্র, গুপ্ত, মিত্র, দত্ত, দেব, বসু, সেন, নন্দী, ধর, ভদ্র প্রভৃতি উপাধিতে জৈন সংস্রবের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়। শ্বেতাম্বর জৈনদের ৮৪ গচ্ছ বা শাখা আছে।[২১] দিগম্বরদেরও গচ্ছ আছে। তাহার মধ্যে নন্দী-গচ্ছ আছে—চালুক্য দ্বিতীয় অম্মরাজ লিপি।[২২]

শ্রবণ-বেল-গোলা লিপিতেও নন্দী-গচ্ছের উল্লেখ পাই।[২৩] গুপ্তি গুপ্তের শিষ্য মেঘনন্দী নন্দীসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা।[২৪] দিগম্বর পত্র জৈন-সিদ্ধান্ত-ভাস্করের মতে এই সঙ্ঘগুরুদের উপাধি প্রায় নন্দী, চন্দ্র, কীর্তি ও ভূষণ।

জৈন সিদ্ধান্ত ভাস্করের মতে ভদ্রবাহুর পুত্র জিন সেন, সেনগণের প্রতিষ্ঠাতা। এই গণের মধ্যে এই নামগুলি উল্লেখযোগ্য :—

নন্দী	৪৩৫ খ্রীঃ পূর্ব
মেঘ নন্দী	১৭ খ্রীঃ পূর্ব
দেব নন্দী	২৫ খ্রীঃ অব্দ
জয় নন্দী	২৯৬ খ্রীঃ অব্দ
গুণ নন্দী	৩০৭ খ্রীঃ অব্দ
বজ্র নন্দী	৩২৯ খ্রীঃ অব্দ
কুমার নন্দী	৩৬০ খ্রীঃ অব্দ
ভানু নন্দী	৪৫১ খ্রীঃ অব্দ
নয়ন নন্দী	৪৬৮ খ্রীঃ অব্দ
বসু নন্দী	৪৭৪ খ্রীঃ অব্দ
বীর নন্দী	৫০৪ খ্রীঃ অব্দ
রত্ন নন্দী	৫২৮ খ্রীঃ অব্দ
মাণিক্য নন্দী	৫৪৪ খ্রীঃ অব্দ
বিষ্ণু নন্দী	৬৬৯ খ্রীঃ অব্দ
শ্রীনন্দী	৭০৮ খ্রীঃ অব্দ
ধর্ম নন্দী	৭৫১ খ্রীঃ অব্দ
বিদ্যা নন্দী	৭৮৩ খ্রীঃ অব্দ

ইহা ছাড়া আরও ১০ জন নন্দী আছেন। সেন উপাধিধারী গুরুদের নাম :—

জয় সেন	২৯৮ খ্রীঃ পূর্ব
নাগ সেন	২৮০ খ্রীঃ পূর্ব
কৃষ্টি সেন	২৪৮ খ্রীঃ পূর্ব
বিজয় সেন	২৩২ খ্রীঃ পূর্ব
ধর্ম সেন	১৮৪ খ্রীঃ পূর্ব
ধ্রুব সেন	৯৩ খ্রীঃ পূর্ব

ইহা ছাড়া সেনগণের মধ্যে জিন সেন, রবি সেন, রাম সেন, কনক সেন, বন্ধু সেন, বিষ্ণু সেন, মল্লি সেন, ভব সেন, অজিত সেন, গুণ সেন (১ম), সিদ্ধ সেন, বীর সেন (১ম), জিন সেন (২য়), নেমি সেন, ছত্র সেন, আর্য সেন, ব্রহ্ম সেন, স্বর সেন, দুর্লভ সেন, ধর্ম সেন (২য়), শ্রীসেন, লক্ষ্মী সেন, সোম সেন, ধর সেন,—ইহা ছাড়া আরও ১৫ জন "সেন" এই সেনগণে আছেন।

ইহা ছাড়া জৈনসিদ্ধান্ত ভাস্করের লিখিত কণ্ঠসঙ্ঘের ২৩ জন সেন-নামাংশ-ধারী গুরুর পরিচয় পাই।

দিগম্বরদের মূল ও অন্যান্য গ্রন্থে চন্দ্র ও ভদ্র উপাধিধারীও আছেন। চন্দ্র নামাংশধারী তো অসংখ্য গুরু। শুভ চন্দ্রের একটি শাখাই আছে। জিন চন্দ্র (১ম) (৮০ খ্রীঃ পূর্ব), প্রভাতচন্দ্র, নেমিচন্দ্র, মেঘচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র, রামচন্দ্র, অভয়চন্দ্র, নবচন্দ্র, নাগচন্দ্র, হরিচন্দ্র, মহীচন্দ্র, মাঘচন্দ্র, লক্ষ্মীচন্দ্র, গুণচন্দ্র, লোকচন্দ্র, ভবচন্দ্র, মহীচন্দ্র, আরও [illegible] জনের নামাংশে চন্দ্র দেখা যায়।

ভদ্রনামাংশধারী যথা—যশোভদ্র (৩৯ খ্রীঃ পূর্ব), সমন্তভদ্র, গুণভদ্র, সমন্তভদ্র (২য়) ইত্যাদি। এই সব তালিকা ভাল করিয়া দেখিতে চাহিলে পূরণ-চন্দ্র নাহার মহাশয় কৃত এন্ এপিটোম অব জৈনিজম পুস্তকের শেষভাগে দেখিলেই পাইবেন।

বাঙ্গালীর নামের মধ্যাংশে যে "চন্দ্র", "নাথ" প্রভৃতি দেখা যায় তাহাও হয়তো জৈন প্রভাবেরই ফল।

ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশেই লোকের নাম অর্থযুক্ত ও সুন্দর। অনেকে মনে করেন তাহা জৈন প্রভাবেরই ফল!

আদিনাথ, পার্শ্বনাথ প্রভৃতি নাম বাংলাদেশে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহারও মূল জৈনধর্মে।

বাংলাদেশে প্রচলিত পদ্মপুরাণের বেহুলার কথা কেহ কেহ বলেন জৈনদেরই নিকট পাওয়া। জৈনদেরও পদ্মপুরাণ আছে; তাহার একাদশ সর্গে শ্রীপার্শ্বনাথ চরিতে দেখা যায় ফণীদের অধিপতি পদ্মাবতীর সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—

পদ্মাবত্যা সমং দেবম্ উপতস্থৌ ফণীশ্বরঃ॥

১১শ, ৭৭ শ্লোক।

তাহার পর সামান্য কিছু কথা। জৈনদের কথাকোষেও এইরূপ নাগদেবতার কথা পাওয়া যায়।

অন্তিম জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের নির্বাণকাল কাহারও মতে ৪৬৭ খ্রীঃ পূর্বাব্দে। কেহ কেহ বলেন, ৪৮০ হইতে ৪৬৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ তাঁহার নির্বাণকাল (জৈনিজম ইন নর্দার্ন ইণ্ডিয়া, পৃ—৩১)। কেহ কেহ বলেন তাঁহার তিন শিষ্য। তাঁহাদিগকে তীর্থঙ্কর না বলিয়া "কেবলী" অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞানী বলা হয়। তাঁহাদের পরে ৫ জন "শ্রুতকেবলী"। এই শ্রুতকেবলীদের শেষ জন হইলেন ভদ্রবাহু। অর্থাৎ মহাবীর হইতে তিনি অষ্টম। কিন্তু এই কথা তাঁহার স্বরচিত কল্পসূত্র মতেই টিকিতে চায় না।[২৫]

ভদ্রবাহু হইলেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক ও তাঁহার গুরু। চন্দ্রগুপ্ত সহ ভদ্রবাহু দক্ষিণ দেশে যাত্রা করেন ও শ্রবণ-বেল-গোলা আসিয়া নিজ অন্তিম সময় বুঝিতে পারিয়া সেখানে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় রহিয়া যান এবং শিষ্য বিশাখাচার্যের অধীনে ভিক্ষুসঙ্ঘকে মহীশূর পুন্নাট ধামে প্রেরণ করেন। এই কথা প্রায় সকলেই জানেন।[২৬]

শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহু

স্থানকবাসী-শ্বেতাম্বরীরা বলেন চন্দ্রগুপ্তের সময়ে উত্তর ভারতে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। পূর্ব হইতেই এই দুর্ভিক্ষের সূচনা দেখিয়া চন্দ্রগুপ্তের গুরু ভদ্রবাহু বলিলেন, "এইখানে যদি থাকি তবে গৃহস্থগণের ক্লেশ হইবে। আমরা পরিব্রাজক, দেশান্তর গমনে বাধা নাই, অতএব দক্ষিণদেশে যাত্রা করা যাউক, দুর্ভিক্ষ গত হইলে এদেশে ফিরিয়া আসা যাইবে।" সঙ্ঘের অর্ধভাগ অর্থাৎ ১২ হাজার ভিক্ষু এই কথায় রাজি হইলেন, বাকি অর্ধেক আচার্য স্থূলভদ্রের অধীনে দেশেই রহিয়া গেলেন। দুর্ভিক্ষকালে ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য নানা দিকে বাহির হইতে বাধ্য হইয়া ভিক্ষুগণ বস্ত্রাদি পরিধান করিলেন এবং আরও কিছু কিছু নিয়ম শিথিল করা হইল। দুর্ভিক্ষের পরও সেই সব নিয়ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা গেল না। ইহাতেই ভদ্রবাহুর দল দিগম্বর রহিয়া গেলেন ও স্থূলভদ্রের দল শ্বেতাম্বর হইলেন;[২৫ক] পূর্বেও এই দক্ষিণযাত্রার কথা বলা হইয়াছে। দিগম্বরীরা আরও বলেন, মহাবীরের অষ্টম পীঢ়ীতে ভদ্রবাহুর সময়ে নিয়মাদি শিথিল হইয়া যাওয়ায় অর্ধফালক মতের উৎপত্তি হয়, ক্রমে তাহা হইতে শ্বেতাম্বর মত গড়িয়া ওঠে।

স্থানকবাসীদের মতেও ভদ্রবাহুর অনুপস্থিতি কালে স্থূলভদ্রের দল একটি মহাসভা আহ্বান করিয়া প্রাচীন শাস্ত্রসংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। তাহাতে একাদশ অঙ্গ

সংগৃহীত হয়; দ্বাদশ অঙ্গের সন্ধান মিলে নাই। স্থূলভদ্র সেই দ্বাদশ অঙ্গ মিলাইয়া দেন। ভদ্রবাহুর দল ফিরিয়া আসিয়া সেই দ্বাদশ অঙ্গকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাহাতেই এই মতভেদ। পূর্বেও এই কথা বলা হইয়াছে।

জৈনদের সকল শাস্ত্র সকল দলের স্বীকৃত নহে। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায় কতক অংশ মানেন; কতকটা আবার নিজ নিজ সম্প্রদায়ের আদৃত। ১৪টি পূর্ব, ১২টি অঙ্গ, ১২টি উপাঙ্গ, ১০টি পেন্ন বা প্রকীর্ণ; ৬টি ছেদসূত্র; ৪টি মূলসূত্র, এবং দুইটি স্বতন্ত্র সূত্র,—নন্দীসূত্র ও অনুযোগদ্বার সূত্র,—শ্বেতাম্বরীরা স্বীকার করেন, দিগম্বরীরা করেন না।

আচার্য উইণ্টারনিট্‌জ বলেন আয়ারঙ্গ সূত্রের দ্বিতীয় ভাগ অনেকটা পরবর্তী। ইহার বিভিন্নাংশগুলি "চুলা" অর্থাৎ পরিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত, কাজেই বুঝা যায় এইগুলি মূল শাস্ত্রের সঙ্গে পরে যুক্ত। তৃতীয় চূলায় মহাবীরের জীবনীর সব উপাদান রহিয়াছে, ভদ্রবাহুর কল্পসূত্রের সেই সব উপাদান কাজে লাগিয়াছে।[২৬ক]

অভিধান রাজেন্দ্র মতেও "চুলা" অর্থে উত্তরতন্ত্র দেওয়া আছে।

উইণ্টারনিট্‌জের মতে কল্পসূত্রের তিনটি অঙ্গ একই ব্যক্তির রচনা হইতে পারে না।

কল্পসূত্রের তৃতীয় অঙ্গ সমাচারী হইল যতিদের পজ্জুসনকালের নিয়মাবলী। ইহাই বোধহয় এই গ্রন্থের প্রাচীনতম অংশ। পজ্জুসন অর্থাৎ বর্ষাকালে পর্যুষণের উৎসবে কল্পসূত্র পাঠ করা হয়, তাই ইহার নাম পজ্জুসন কপ্‌প। পর্যুষণের সঙ্গে তৃতীয় অঙ্গটিরই সঙ্গতি আছে। কথা আছে, পূর্বে কল্পসূত্র জৈনশাস্ত্রের অর্থাৎ সিদ্ধান্তের অন্তর্গত ছিল না। দেবর্ধি-গণী নাকি তাহা সিদ্ধান্তভুক্ত করিয়া লয়েন। কথাটা অসঙ্গত নহে।

জৈনাচার্যদের মতে এক ভদ্রবাহুই বিস্মৃত সব "পূর্ব" জানিতেন। নবম "পূর্ব" হইতেই তৃতীয় চতুর্থ ছেদসূত্র তিনি সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন। "দশাও" তাঁহারই রচনা। নিজ্জুত্তিগুলি হইল ছন্দোবদ্ধ সংক্ষিপ্ত টীকা। তাহাও ভদ্রবাহুর রচিত বলিয়াই খ্যাত।

ভদ্রবাহু-সংহিতা জৈনদের একখানি প্রখ্যাত স্মৃতিশাস্ত্র গ্রন্থ। ইহা দ্বাদশ সহস্র শ্লোকাত্মক। একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ ঝালার পাটন গ্রন্থ-সংগ্রহে আছে। জে এল জৈনী মহাশয় দায়ভাগ সম্বন্ধে দুইটি প্রকরণ তাহা হইতে লইয়া পুস্তকাকারে বাহির করিয়াছেন। আরা জৈনগ্রন্থ প্রচারমালা হইতে তাহা বাহির হইয়াছে।

দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর মতের সম্বন্ধে পরস্পরের নানাবিধ এত প্রকারের ইতিকথা আছে যে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

স্থানকবাসীরা বলেন, ৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বজ্রসেন রাজা ছিলেন দুর্বলচিত্ত। তাঁহার সময়ে এই বিচ্ছেদটি ঘটে। শ্বেতাম্বরীরা বলেন শিবভূতি নামে এক ভিক্ষুককে রাজা একখানি রত্নকম্বল দেন। অন্য সাধুরা বলিলেন, "ভিক্ষুর পক্ষে এইরূপ মহার্ঘ কম্বল গ্রহণ করা অন্যায়।" তাই তাঁহারা কম্বলখানি ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ধূলা ঝাড়ার কাজেই ইহা ব্যবহার করিলেন। শিবভূতি দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "যদি এই কম্বলই ব্যবহার করা অন্যায় হয় তবে কিছুই ব্যবহার করিয়া কাজ নাই।" এই বলিয়া তিনি বসন প্রভৃতি পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়া দিগম্বর হইলেন। ইহাই দিগম্বরদের আদিকথা।

এই বিষয়ে সাম্প্রদায়িক এত মতভেদ ও তর্ক আছে যে আমাদের পক্ষে আগাগোড়া সব কথা আলোচনা করা অসম্ভব। জৈনদের মধ্যেও কোনো কোনো প্রাচীন সম্প্রদায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন আর সেই সব সম্প্রদায় দেখা যায় না। জায়সওয়াল বলেন, কর্ণাট লিপিতে দেখা যায় যাপনীয় সঙ্ঘ এইরূপ একটি দল।[২৭]

রত্ননন্দী তাঁহার ভদ্রবাহু চরিত্রেও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।[২৮]

ভদ্রবাহুর চরিত্রই এখন আমাদের আসল লক্ষ্য। পূর্বেই বলা হইয়াছে মহাবীরের পর যাঁহারা মহাপুরুষ তাঁহারা হয় কেবলী নয় তো শ্রুতকেবলী। শ্রুতকেবলীদের মধ্যে অন্তিম মহাপুরুষ এই ভদ্রবাহু। তাঁহার রচিত কল্পসূত্র জৈনদের বিখ্যাত গ্রন্থ। পূর্বে বলা হইয়াছে যে চাতুর্মাস্যের পর্যুষণ উৎসবে তাহা অতি শ্রদ্ধার সহিত পঠিত ও শ্রুত হয়।

ইহাতে পঞ্চ অধ্যায়ে মহাবীরের চরিত্র লিখিত। তাহার পরে পার্শ্ব ও অরিষ্টনেমির চরিত্র। ইহার পর মধ্যবর্তী তীর্থঙ্করদের যুগ-বর্ণনা। তাহার পর ঋষভ-চরিত্র বর্ণিত। তাহার পর স্থবিরাবলীর একটি সুদীর্ঘ তালিকা। সর্বশেষে সামাচারী অর্থাৎ যতি ধর্ম বর্ণনা। ইহা অনেকটা বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের বিনয়-শাস্ত্রের মত।

সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের চতুর্থ ভাগ হইল ছেদসূত্র। ছেদসূত্রেরই অঙ্গ হইল এই কল্পসূত্র। ছেদসূত্রেই আসলে যতিদের সব নিয়মাদি লিখিত। ছেদসূত্রের মধ্যে কল্প ও ব্যবহার সূত্র ভদ্রবাহুর। আচার্য উইণ্টারনিট্জ প্রভৃতির মতে ছেদসূত্রের অনেক অংশ অতিশয় প্রাচীন। "আয়ার দশাও"র রচয়িতা ভদ্রবাহু।[২৯]

স্টিভেনসন বলেন, দশাশ্রুতস্কন্ধ, অষ্টমাধ্যয়ন, এবং প্রত্যাখ্যানের নয় শাখা অবলম্বনে ভদ্রবাহু এই কল্পসূত্র রচনা করেন।[৩০]

মতবিশেষে ভদ্রবাহু যদিও মহাবীর হইতে অষ্টম পীঢ়ীতে তবু তাঁহার স্বরচিত থেরাবলী বা স্থবিরাবলী অনুসারে তিনি নিজে মহাবীর হইতে ষষ্ঠ পীঢ়ীর। তাঁহার মতে—

কাশ্যপ গোত্রীয় তীর্থঙ্কর	**মহাবীর**	তাঁহার শিষ্য
অগ্নিবেশায়ন গোত্রীয় আর্য	**সুধর্মা**	তাঁহার শিষ্য
কাশ্যপ গোত্রীয় আর্য	**জম্বুনাথা**	তাঁহার শিষ্য
কাত্যায়ন গোত্রীয় আর্য	**প্রভব**	তাঁহার শিষ্য
বাৎস গোত্রীয় আর্য	**সয়্যম্ভ**	তাঁহার শিষ্য
তুঙ্গিকায়ন গোত্রীয় আর্য	**যশোভদ্র**	তাঁহার শিষ্য
প্রাচীন গোত্রীয় আর্য	**ভদ্রবাহু** এবং	
মাঠর গোত্রীয় আর্য	**সম্ভুতবিজয়**	তাঁহার শিষ্য

এইখানে সংশয় হয় থেরাবলী কি তাঁহার রচনা, তবে তিনি নিজেকে আর্যদের মধ্যে কি ধরিতে পারিতেন? আর তাঁহার পরে বহুদূর পর্যন্ত পরবর্তী বংশাবলী দেওয়া হইয়াছে তাহা কি তাঁহার দেওয়া সম্ভব? তাঁহার থেরাবলীতেই সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত যে দুইরকম ধারা দেওয়া আছে যদি ইহা তাঁহার নিজের রচিত হইত তবে সঙ্গতও হইত না সম্ভবও হইত না।

ভদ্রবাহুর সম্বন্ধে আমাদের এত কৌতূহলের হেতু কি?

দিগম্বরী জৈন রত্ননন্দীর যে "ভদ্রবাহু-চরিত" পাই তাহার মতে দেখি ভদ্রবাহুর জন্ম পৌণ্ড্রবর্ধনে অর্থাৎ উত্তর বঙ্গে। রত্ননন্দীর ভদ্রবাহুচরিতই বেশি প্রচলিত। বিশেষতঃ যখন অনেকের মতে, ভদ্রবাহুর দলের সঙ্গে মতভেদেই শ্বেতাম্বর মতের উদ্ভব।

আমার পরমবন্ধু শ্বেতাম্বর মতাবলম্বী সন্ন্যাসী শ্রী মুনি জিনবিজয়ী খরতরগচ্ছের যে পট্টাবলী সংগ্রহ এই শান্তিনিকেতন হইতেই বাহির করিয়াছেন তাহাতে দেখি, গুরুভদ্রবাহু সকল সূত্রসমূহের নির্যুক্তি রচনা করিয়াছেন এবং তিনি সঙ্ঘের কল্যাণার্থে উপসর্গহর স্তোত্র রচনা করিয়াছেন।[৩১]

পট্টাবলী [১] তালিকায় দেখি—"ভদ্রবাহুস্বামী উবসগ্গ হরং কর্তা বীরাৎ ১৭০" (পৃ ৯)। অর্থাৎ তিনি উপসর্গহর স্তোত্র রচয়িতা, মহাবীর হইতে ১৭০ বৎসর পরে তাঁহার স্বর্গারোহণ কাল।

পট্টাবলী [২] তালিকায় লেখা ভদ্রবাহু স্বামী প্রাচীন গোত্রীয়, প্রতিষ্ঠান-পুরবাসী, উপসর্গহর স্তোত্র রচনার দ্বারা মহোপকারী, চতুর্দশ "পূর্ব"-বিৎ, কল্পসূত্র-আবশ্যক-নির্যুক্তি আদি বহু গ্রন্থ রচয়িতা। তিনি ৪৫ বৎসর গৃহী ছিলেন, ১৭ বৎসর সামান্য ব্রতে ছিলেন, ১৪ বৎসর যুগপ্রধান ছিলেন। ৭৬ বৎসর বয়সে, মহাবীর হইতে ১৭০ বৎসর পরে, স্বর্গগমন করেন (পৃ ১৬-১৭)। মনে রাখা উচিত এইসব পট্টাবলী বহু পরবর্তী কালের গ্রন্থ।

দিগম্বর পট্টাবলী মতে কুন্দকুন্দাচার্য প্রথম শতাব্দীর মানুষ। তাঁহার গুরু নাকি ভদ্রবাহু। অথচ পট্টাবলী মতে তিনি ভদ্রবাহু হইতে পঞ্চম পীঢ়ীর। ভদ্রবাহবী সংহিতা নামে জ্যোতিষগ্রন্থের রচয়িতা একজন ভদ্রবাহু আছেন, তিনিও বহুকাল পরে জন্মগ্রহণ করেন। ভদ্রবাহু কি তবে একাধিক ছিলেন? কারণ স্টিভেনসন বলেন ৪১১ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাতপতি ধ্রুবসেনের সময় এক ভদ্রবাহু জীবিত ছিলেন।[৩২]

আসলে, আদি ভদ্রবাহু মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সময়ে জীবিত ছিলেন, ইহাই ঠিক। জৈনশাস্ত্র মতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে ৩৫৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, জ্যাকোবি কারপেনটার বলেন ২৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। ধ্রুবসেনের সময় (ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে) দেবর্ধিগণীর শাস্ত্র সংগ্রহ ঘটিয়াছিল, তাহাতে ভদ্রবাহুর গ্রন্থ ও কাল প্রভৃতি নির্ণীত হইয়াছিল।[৩৩]

প্রাচীনকালে ভাদ্র শুক্লাপঞ্চমীতে কল্পসূত্র পাঠ আরম্ভ হইত। ভিক্ষুরা নিয়মভঙ্গ অপরাধ স্বীকার করিলে পর ইহা পঠিত হইত। অন্য সব সাধুরা বসিয়া শ্রবণ করিতেন। ধ্রুবসেনের সময় এই নিয়মের কিছু পরিবর্তন ঘটিল। তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় রাজা শোকার্ত হ'ন, তাই কিছু নিয়মের অদল বদল হইয়া নয়টি পাঠে এই পাঠ সমাপ্ত হইত।

পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে কল্পসূত্রের চারিখানি টীকা রচিত হয়। যশোবিজয় সংস্কৃত টীকা রচনা করেন, আর তিনজন টীকাকার দেবীচন্দ্র, জ্ঞানবিমল ও সাময় সরল ভাষাতে টীকা লেখেন।

জৈন সাধুদের মধ্যে যে নিয়মভঙ্গ অপরাধ স্বীকৃত হইত তাহা হইতেই বোধ হয় খ্রীষ্টীয় কনফেসনের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।[৩৪]

বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের মধ্যেও এই অপরাধ স্বীকার করার প্রথা বিলক্ষণরূপে প্রচলিত ছিল। প্রতিমোক্ষ গ্রন্থগুলিই তাহার প্রমাণ।

আচার্য জ্যাকোবি বলেন ভদ্রবাহুর পরে জৈনমত আর বিশেষ পরিবর্তিত হয় নাই।[৩৫]

জৈন শাস্ত্রগ্রন্থ রচনার সঙ্গে সঙ্গে "নির্যুক্তি"র (নিজ্জুক্তি) রচনাও চলিতেছিল। দেবর্ধির সময়ে যে সব শাস্ত্রগ্রন্থ রচিত হয় তাহার পূর্বেই জৈন ভিক্ষুগণ কতকটা টীকার মত নির্যুক্তি রচনা করিতে আরম্ভ করেন। চতুর্থ কল্পসূত্রের পিণ্ড এবং "ওঘনিজ্জুত্তি" শাস্ত্রবৎ মান্য; যদিও "ওঘনিজ্জুক্তি" কোনো কোনো "পূর্ব" হইতে গৃহীত। ইহাতে ধর্মজীবনের কথা ও সাধনার জন্য নিয়মাদি আলোচিত হইয়াছে।

এইসব টীকাকারদের মধ্যে ভদ্রবাহু প্রাচীনতম। তিনি শাস্ত্রীয় ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে দশটি "নিজ্জুক্তি" রচনা করেন। আচারাঙ্গ, সূত্রকৃতাঙ্গ, সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি, দশশ্রুতস্কন্ধ, কল্প, ব্যবহার, আবশ্যক, দশবৈকালিক, উত্তরাধ্যায়ন, ঋষিভাষিত, এই দশটি বিষয়। বানারসী জৈনের মতে তাঁহার আবশ্যক-নির্যুক্তিই পূর্ব-ভবের অর্থাৎ ঋষভদেবের পূর্বজন্মের প্রাচীনতম প্রামাণিকগ্রন্থ।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্ণয় সাগর প্রেস হইতে বেণীচন্দ্র শাহ "ওঘনির্যুক্তি"র একটি পুঁথি সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। তাহার মুখপত্রে লিখিত আছে—

"শ্রুতকেবলি শ্রীমদ্ ভদ্রবাহু বিরচিত নির্যুক্তি শ্রীমৎ পূর্বাচার্য বিরচিত ভাষ্যযুতানবাঙ্গী বৃত্তিশোধক নির্বৃত্তি কূলভূষণ শ্রীমদ্ দ্রোণাচার্য্য সূত্রিত বৃত্তিভূষিতা শ্রীমতী ওঘনির্যুক্তিঃ"

শ্রেষ্টিদেব চন্দ্রলাল ভাই জৈনপুস্তকোদ্ধার গ্রন্থমালার ৪৪নং গ্রন্থ হইল— "শ্রীপিণ্ডনির্যুক্তিঃ", তাহা শ্রীভদ্রবাহু স্বামী প্রণীতা, সভাষ্যা, শ্রীমন্মলয়গির্যাচার্য্য বিবৃতা।

"উবসগ্‌গহর স্তোত্র' যদি ভদ্রবাহুর রচিত হয় তবে তাহা প্রাচীনতম জৈন স্তোত্রের রচনা। ইহা পার্শ্বের উদ্দেশ্যে রচিত স্তোত্র।

পুণ্ড্রবর্ধন বর্ণন

পূর্বে উল্লিখিত জ্যোতিষগ্রন্থ ভদ্রবাহবীসংহিতা বোধ হয় আর কোনো ভদ্রবাহুর। বরাহমিহির জৈন জ্যোতিষাচার্য সিদ্ধসেনের নাম করিলেও ভদ্রবাহবী সংহিতার নাম করেন নাই, কাজেই মনে হয় ইহা পরবর্তী কোনো ভদ্রবাহুর রচিত।

তাঁহার জীবনচরিত "ভদ্রবাহু চরিত্র" জৈনদের মধ্যে বিখ্যাত গ্রন্থ। কিন্তু রচয়িতা দিগম্বর মতের রত্ননন্দী বহু পরবর্তী কালে জন্মিয়াছেন। তিনি গুজরাতের লুঙ্কা শাহ প্রবর্তিত পৌত্তলিকতা বিরোধী "ঢুংঢায়" সম্প্রদায়ের উল্লেখ

করিয়াছেন ৩৫। "ঢ়ুংঢীয়" সম্প্রদায়ের সময় ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে। হয়তো রত্নন্দী সেই সময়কারই মানুষ। কাজেই তাঁহার লেখা, ঢ়ুংঢীয় মতের প্রতি আক্রমণের ঝাঁঝটা অত্যন্ত বেশি। রত্ননন্দী বহু পরবর্তী লোক। বোধ হয় পশ্চিম ভারতে তাঁহার বাড়ী। পূর্বভারতের ভূগোলগত সংস্থানও তাঁর জানা নাই ; বহু পুরাতন কথা বলিয়া অনেক কিছু গোলমালও তাঁহার হইয়াছে। তবু তিনি তাঁহার ভদ্রবাহুচরিতে, প্রথম পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন, "ভারতের ললাটে তমালপত্রের মত হইল পৌণ্ড্রবর্ধন দেশ।" এক কথায় সুজলা শ্যামলা বাংলা-দেশের একটি অপূর্ব চিত্র এই গ্রন্থে পাই।

তমালপত্রবৎ তস্য দেশোত্নুভূৎ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনঃ ॥ (২২ শ্লোক)

কাজেই এতকাল পরে এত দূরের কথা লিখিতে গিয়া রত্ননন্দীর অনেক ভুলভ্রান্তি হইবার কথা। তবু তাঁর বর্ণিত গ্রন্থে দেখি, দেশের গ্রামগুলিও ধনধান্য-জনাকীর্ণ এবং গোমণ্ডল বিমণ্ডিত।

ধনধান্যসমাকীর্ণা গোমণ্ডলসমন্বিতাঃ ॥ (২৩)

যে দেশের ক্ষেত্রসকল নদী ও বৃষ্টির জলে সমৃদ্ধি, সেখানকার ভূমি অভীষ্ট শস্য দানে চিন্তামণি সদৃশ।

নদী-মাতৃকসদ্দেব-মাতৃক ক্ষেত্রমস্তিতা।
চিন্তামণীয়তে যত্র স্বেষ্টশস্যপ্রদা মহী ॥ (২৫)

যেখানে ভ্রমরসহ কমলে শোভিত সব সরসী বিরাজিত······

সরস্যো যত্ররাজন্তে মালি বারিজলোচনৈঃ।(২৬)

মোটকথা, ভদ্রবাহু চরিত্রগ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে, ২২শ—২৯ শ্লোকে, রত্ননন্দী পুণ্ড্রবর্ধনের এমন একটি চিত্র দিয়াছেন, যাহাতে মনে হয় তাহা একটি কল্পলোক।

এই পুণ্ড্রবর্ধন দেশে কোট্টপুর নামে নগর ছিল। সেই নগরটি একটি স্বর্ণখণ্ডের মত ছিল শোভমান। বৃহৎ উত্তুঙ্গ অট্টালিকা পরিখা প্রাকার ও গোপুরের নগরদ্বার দ্বারা ও উত্তুঙ্গ প্রাসাদ পঙ্‌ক্তিতে সেই স্থান বিরাজিত ছিল।

তত্র কোট্টপুরং রম্যং দ্যোততে নাকখণ্ডবৎ।
অগাধোত্তুঙ্গ সাট্টালৈঃ খাতিকা-শাল-গোপুরৈঃ ॥
প্রোত্তুংগ শিখরা যাত্রাংবভুঃ প্রাসাদ পংক্তয়ঃ। (৩০, ৩১)

পুণ্ড্রবর্ধন তো বুঝিলাম মালদহ, দিনাজপুর, বরেন্দ্র প্রভৃতি গৌড়ভূমি। কিন্তু

এই কোট্টপুর নগরটি ছিল কোথায়? রত্ননন্দী বলেন, সেখানে নির্মলশুভ্র পুণ্যপিণ্ডের মত সমুজ্জ্বল ভব্যজনের সেব্য সব জিনালয় বিরাজিত ছিল।

বিশদাঃ পুণ্যপিণ্ডাভা ভব্যসেব্যা জিনালয়াঃ ॥ (৩৩)

সেখানকার সমস্ত লোক ধর্মাচরণে দীপ্তজীবন ছিলেন।

তত্রত্যাস্তেংখিলা লোকা রেজিরে ধর্ম্মবর্ত্তনাৎ ॥ (৩৬)

প্রথম পরিচ্ছেদে ৩০শ হইতে ৩৬শ পর্যন্ত ৭টি শ্লোকে কোট্টপুরের লোকোত্তর ঐশ্বর্য ও মহত্ত্বের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

পুণ্ড্রবর্ধনের রাজা ছিলেন পদ্মধর। তিনি নিজ তেজে অন্য সকল ভূপালকে করদ করিয়া লইয়াছিলেন।

তত্রবাজায়তে ভূপঃ পদ্মধরাভিধঃ।

করদীকৃত নিঃশেষ ভূপালো নিজতেজসা ॥ (৩৭)

তাঁহার পুরোহিত ছিলেন সোমশর্মা (৩৯)। তিনি ছিলেন বিবেকী শুদ্ধান্তঃকরণ বেদবিদ্যা বিশারদ।

বিবেকী বিশাদস্বান্তো বেদবিদ্যাবিশারদঃ ॥ (৪০)

তাঁহার পুত্রের নাম সকলে রাখিলেন ভদ্রবাহু (৪৮)।

তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে শ্রীগোবর্ধনাচার্য পৌণ্ড্রবর্ধনে কোট্টপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন (৫৫-৫৭)।

প্রতিভাশালী ভদ্রবাহুকে দেখিয়া গোবর্ধনাচার্য এত প্রসন্ন হইলেন যে তাঁহাকে শিষ্য করিতে চাহিলেন (৭৪)। পিতা মাতাও তাহাতে আনন্দে সম্মতি দিলেন (৭৭)। গোবর্ধনাচার্য ছিলেন জৈনাচার্য। ভদ্রবাহুও জৈনমত গ্রহণ করিলেন।

ভদ্রবাহু নিজ গৃহে ফিরিয়া স্বীয় জ্ঞানের দ্বারা সকলকে পরাজিত করিয়া জৈনমত স্থাপন করিলেন (৯৫-৯৬)।

রাজাও প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিলেন (৯৭)। ভদ্রবাহু কিছুদিন পর গোবর্ধনাচার্যের নিকট গিয়া একেবারে সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করিলেন (১১৩, ১১৪)।

ক্রমে সঙ্ঘপতি গোবর্ধন ভদ্রবাহুকে সকল গুণসাগর বুঝিয়া তাঁহার নিজের পদে অর্থাৎ সঙ্ঘপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

গোবর্দ্ধনো গণী জ্ঞাত্বা সমগ্র গুণ সাগরম্।

স্বপদে যোজয়ামাস ভদ্রবাহুং গণাগ্রিমে ॥ (১২৬)

৩৫ক চতুর্থ পরি, ১৫৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেখা যায়, কিছুকাল পরে গোবর্ধনাচার্য তপস্যায় তনুত্যাগ করিলেন (২)। এমন সময় উজ্জয়িনীরাজ (রত্ননন্দীর এইরূপ ভুল মাঝে মাঝে আছে) চন্দ্রগুপ্ত এক দুঃস্বপ্ন দেখিলেন (১০-১৭)। ইহার মর্ম আর কেউ, বুঝাইতে পারিলেন না। ভদ্রবাহু তাহা বুঝাইয়া দিলেন। তাহাতে বৈরাগ্য উদয় হওয়ায় চন্দ্রগুপ্ত পুত্রকে স্বীয় রাজ্য দিয়া ভদ্রবাহুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন (৫৩-৫৫)।

"শ্রুতকেবলী" ভদ্রবাহু নানা নিমিত্তের দ্বারা বুঝিলেন সেই মালব দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ আসিতেছে। ১২ বৎসর সেই দুষ্কাল থাকিবে। তাই সাধুদের আর এখানে থাকা উচিত নহে (৭০-৭১)।

তাহাতে কুবেরমিত্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠিরা বলিলেন, "প্রভু ভয় নাই, আমাদের বহু অর্থ সঞ্চিত আছে" (৭৫-৭৬)। কিন্তু ভদ্রবাহু বুঝিলেন, তাহাতে কুলাইবে না। তাই তিনি কর্ণাট দেশে যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলেন (৮৬)।

রামল্যস্থস্থুলাচার্যলভদ্রাদি সাধুগণ কিন্তু ঐ সঙ্গে গেলেন না। তাঁহারা শ্রেষ্টিগণের কথায় দেশেই রহিয়া গেলেন (৮৮)।

ভদ্রবাহু দক্ষিণ দেশে চলিলেন (৯০), তাঁহার সঙ্গে বার হাজার তপস্বীও যাত্রা করিলেন।

দ্বাদশর্ষিসহস্রেণ পরীতো গণনায়কঃ। (৯১)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ বর্ণনায় দেখিতে পাই, পথে যাইতে যাইতে ভদ্রবাহু বুঝিলেন তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। তাই তিনি বিশাখাচার্যের উপর সঙ্ঘকে লইয়া যাইবার ভার দিয়া তাঁহাকে সঙ্ঘপতি পদে ব্রত করিলেন।

বিশাখাচার্য তাঁহাকে ফেলিয়া অগ্রসর হইতে সম্মত হইলেন না। তখন সেই সঙ্গে ছিলেন গৃহীত-ভিক্ষু-ব্রত সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। গুরুর নিষেধ সত্ত্বেও তিনি ভদ্রবাহুর সেবার সকল ভার অঙ্গীকার করিলেন ও সঙ্ঘকে অগ্রসর হইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

বিশাখাচার্য সঙ্ঘ সহ চোলদেশে উপস্থিত হইলেন। ভদ্রবাহু গুহায় রহিয়া তপস্যায় দেহত্যাগে উদ্যত হইলেন; সঙ্গে রহিলেন শুধু চন্দ্রগুপ্ত। তাঁহার নাম তখন প্রভাচন্দ্র।

এই স্থানটি উত্তর কর্ণাটের কটবপ্র পর্বতের নিকটে। এই স্থানই হইল লোকপ্রসিদ্ধ শ্রবণবেলগোলা তীর্থ। কলবপ্পু পর্বতের উপর ভদ্রবাহুর সমাধি

এখনও বর্তমান। এখন এই পর্বতের নাম চন্দ্রগিরি। এখানে তাঁহার একমাত্র সঙ্গী ও অনুচর ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত বা প্রভাচন্দ্র।

শ্রবণবেলগোলা তীর্থটি জৈন মাত্রেরই মহাপুজিত। জৈনরা মনে করেন চাণক্যও জৈন ছিলেন। চাণক্য বৃদ্ধ বয়সে জৈনদের মতই সল্লেখন ব্রতের দ্বারা প্রাণত্যাগের চেষ্টা করেন।[৩৬] জ্যাকোবি এবং টমাস এডোয়ার্ড এই কথার সমর্থন করেন।[৩৭]

চাণক্য নাকি জীবনশেষে নর্মদাতীরে শুক্লতীর্থে গিয়া বাস করেন। বেলগোলা অর্থও শুক্লসরোবর।

চন্দ্রগুপ্তের জৈনধর্ম গ্রহণের কথা জায়সওয়ালও বিশ্বাস করেন।[৩৮]

হেমচন্দ্র রচিত ত্রিষষ্টিশলাকপুরুষ চরিত্র পরিশিষ্টে স্থবিরাবলী চরিত্রে, অষ্টম সর্গে চাণক্য চন্দ্রগুপ্ত কথার এক সুন্দর উপাখ্যান আছে। তাহা অন্যরূপ। এখানে বাহুল্য ভয়ে তাহা দেওয়া গেল না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ভদ্রবাহু স্বীয় ভক্ত শিষ্য চন্দ্রগুপ্তকে লইয়া শ্রবণ-বেলগোলা রহিলেন এবং বিশাখাচার্যের সঙ্গে সঙ্ঘকে মহীশূরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে পুন্নাট ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিলেন।

বার বৎসর অতীত হইলে, দেশে সুভিক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইলে, বিশাখাচার্য দেশে ফিরিবার জন্য উত্তর ভারতের দিকে প্রত্যাবর্তনার্থ যাত্রা করিয়া যেখানে শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুর নিকট বিদায় লইয়াছিলেন সেখানে পুনরায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে তখন পরলোকগত ভদ্রবাহুর সমাধির পাশে সেবারত চন্দ্রগুপ্তকে দেখিলেন ও গুরুর সমাধিস্থানকে বন্দনা করিলেন।

চন্দ্রগুপ্তও বিশাখাচার্যকে বন্দনা করিয়া সৎকার করিলেন। কিন্তু এই নির্জন প্রদেশে জৈন গৃহস্থ-বিরহিত স্থানে চন্দ্রগুপ্ত কি ভাবে ভিক্ষুধর্ম পালন করিতে পারিয়াছেন এইসব মনে সন্দেহ করিয়া বিশাখাচার্য আর তাঁহাকে প্রতিবন্দনা করিলেন না।

পরে যখন তিনি চন্দ্রগুপ্তের শুদ্ধ চরিত্র ও আচারের বিষয় বুঝিতে পারিলেন তখন বিশাখাচার্য তাঁহাকে প্রতিবন্দনা করিলেন। এই তৃতীয় পরিচ্ছেদের অন্তভাগে ভদ্রবাহুর প্রতি একটি চমৎকার নমস্কার শ্লোক দেওয়া হইয়াছে।

"সূর্যের ন্যায় নিরন্তর অনন্তগতাত্মবৃত্তি, এবং দুর্বোধান্ধকারসমূহ দূরকারী, বিশুদ্ধ চরিত্র ভদ্রবাহুকে আকাঙ্ক্ষিত আনন্দ সিদ্ধির জন্য নমস্কার করি।"

নিরন্তরামন্ত গতাত্মবৃত্তিং
নিরস্ত দুর্বোধতমো বিতানম্।
শ্রীভদ্রবাহুঞ্চকরং বিশুদ্ধং
বিমংনমী মীহিত শাত সিদ্ধয়ে ॥ (৯৯)

চতুর্থ পরিচ্ছেদে প্রধানতঃ বিশাখাচার্যের সঙ্ঘের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও স্থূলাচার্য প্রভৃতির সঙ্গে মতভেদ বর্ণিত। তাহাতে আমাদের বিশেষ কোনো প্রয়োজন নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের অন্তভাগে রত্ননন্দী বলিতেছেন, "মহারাজ শ্রেণিকের প্রশ্নে বীর জিনেন্দ্র যেইরূপ ভদ্রবাহুচরিত্র বর্ণনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ জিনশাস্ত্রানুযায়ী আমিও ভদ্রবাহুচরিত বর্ণনা করিলাম।

শ্রেণিক প্রশ্নতোহ্ বোচদ্ যথা বীরজিনেশ্বরঃ।
তথোদ্দিষ্টং ময়াৎত্রোপি জ্ঞাত্বা শ্রীজিনসূত্রতঃ ॥ (১৭১)

ইহাতে বুঝা যায় রত্ননন্দীর পূর্বেও বীর জিনেন্দ্র মুনি প্রভৃতির রচিত আরও ভদ্রবাহুর চরিত প্রচলিত ছিল।

আচার্য হেমচন্দ্রের ত্রিষষ্টিশলাক পুরুষ চরিত্রে ৬৩ জন মহাপুরুষ চরিত্র বর্ণিত। তাহার পরিশিষ্টভাগে স্থবিরাবলি চরিত্রেও ভদ্রবাহুর চরিত্র বর্ণিত (ষষ্ঠ, নবম সর্গ)। তবে সেখানে ভিন্নরূপ কথা। সেখানে দেখি নেপালে ভদ্রবাহু ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে স্থূলভদ্র "দৃষ্টিবাদ" অর্থাৎ দ্বাদশ অঙ্গ শিক্ষা করিয়া আসেন।

মনোরম শ্রীকোট্টপুর

৪র্থ পরিচ্ছেদের শেষভাগে আবার তিনি ভদ্রবাহুর প্রতি নিজের ভক্তি জানাইতেছেন;

"অমরপুর হইতে মনোরম শ্রীকোট্টপুরে সোমশর্মা ব্রাহ্মণের ঘরে সুন্দরী সোমশ্রীর গর্ভে অনেকগুণাকর পুত্ররূপে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়া, যোগ্য গুরুকে আশ্রয় করিয়া, নির্মল জ্ঞান-দুগ্ধ জলধিকে উত্তীর্ণ হইয়াছেন সেই গণনেতা ভদ্র ও মহাগুরু ভদ্রবাহু আমার চিত্তে দীপ্যমান হউন।"

যঃ শ্রীকোট্টপুরে জিতামরপুরে সোমাদিশর্ম-দ্বিজা
দাসীদেকগুণাকরোৎঙ্গজবরঃ সোমশ্রিয়াং সুশ্রিয়াম্।
প্রোত্তীর্ণোৎমলবোধ দুগ্ধ জলধিং শ্রিত্বা গরীয়ো গুরুং
ভদ্রোৎসৌ সম ভদ্রবাহুগণষেঃ প্রদ্যোততাং মানসে ॥ (১৭২)

পরিশেষে রত্ননন্দী আপন পরিচয় আর কিছুমাত্র না দিয়া শুধু নিজ গুরুর নামটি জানাইয়া বিদায় লইলেন। "আমার শিক্ষাগুরু শ্রীললিতকীর্তিমুনীন্দ্রকে স্মরণ করিয়া আমি শ্রীরত্ননন্দী মুনি এই অনঘ চরিত্র বর্ণনা করিলাম।"

স্মৃত্বা শ্রীললিতাদিকীর্ত্তিমনুষাং শিক্ষাগুরুং সদ্‌গুরুং
চক্রে চারু চরিত্র মেতদনঘং রত্নাদিনন্দী মুনিঃ ॥ (১৭৫)

ললিতকীর্তি হইলেন অনন্তকীতির শিষ্য।

এখানে বলা উচিত আমরা এই ভদ্রবাহু চরিত দিগম্বরসম্প্রদায়ী রত্ননন্দীর গ্রন্থানুসারেই বিবৃত করিলাম।

শ্রেণিক রাজার জন্য বীর জিনেশ্বরকৃত যে ভদ্রবাহু চরিত তাহাতেও ভদ্রবাহুর জন্মস্থান পৌণ্ড্রবর্ধন।

সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভদ্রবাহু চরিত যাহা আমরা পাই তাহা হইল হরিষেণকৃত বৃহৎকথাকোষ গ্রন্থে।

বৃহৎকথাকোষ গ্রন্থখানি সিংঘী জৈন গ্রন্থমালার সপ্তদশ গ্রন্থরূপে শ্রীযুক্ত আদিনাথ নেমিনাথ উপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত হইয়া এখন বাহির হইয়াছে। ইহার ৩১৭ পৃষ্ঠায় ১৩১ তম অধ্যায়ে "ভদ্রবাহুকথানকম্" অর্থাৎ ভদ্রবাহুর কথা আছে। তাহাতে দেখা যায়—

অথাস্তি বিষয়ে কান্তে পৌণ্ড্রবর্ধননামনি।
কোটীমতং পুরং পূর্বং দেবকোট্টং চ সাম্প্রতম্ ॥ ১
তত্র পদ্মরথো রাজা নতা শেষ নরেশ্বরঃ।
বভূব তথতা দেবী পদ্মশ্রী রতিবল্লভা ॥ ২
অত্রৈব ভূপতে রাসীৎ সোমশর্মাভিধে দ্বিজঃ।
[illegible] সোমশ্রীতৎপ্রিয়া প্রিয়া ॥ ৩

কুর্বানং সর্ববন্ধুনাং ভদ্রং ভদ্রাশয়ো যতঃ।
ভদ্রবাহুস্ততঃ খ্যাতো বভূব তনয়োঽনয়োঃ॥ ৪
ভদ্রবাহুঃ সমুঞ্জঃ সন্ বহুভির্ব্রহ্মচারিভিঃ।
দেবকোট্ট পুরান্তেঽসৌ রমমাণো বিতিষ্ঠতে॥ ৫

অর্থাৎ "পৌণ্ড্রবর্ধনে পূর্বে কোটীপুর নামে এক নগর ছিল, এখন সেই নগরের নাম দেবকোট্ট। সেখানে চক্রবর্তী রাজা ছিলেন পদ্মরথ (রত্নন্দীয়মতে পদ্মধর) এবং তাহার রাণী ছিলেন পদ্মশ্রী। এই রাজার আশ্রিত সোমশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম সোমশ্রী। ইঁহাদের পুত্র ভদ্রবাহু সকলের কল্যাণসাধনে রত ছিলেন। ভদ্রবাহু উপনয়নের পর বহু ব্রহ্মচারীর সঙ্গে নগরপ্রান্তে খেলিতেছিলেন।"

এমন সময় বর্ধমান হইতে চতুর্থ আচার্য শ্রুতকেবলী গোবর্ধন তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে কোটীনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ঊর্জয়ন্তং গিরিং নেমিং স্তোতুকামো মহাতপাঃ।
বিহরন্ ক্বাপি সংপ্রাপ কোটীনগরমুদ্ধজম্॥ ১০

দিনাজপুরের অনতিদূরে পূর্ণভবা নদীর বামতীরে দেবীকোটের কথা তবাকাৎ-ই-নসিরির মধ্যে পাওয়া যায়। দিনাজপুর জেলার একটি পরগণা দেবীকোট।

গোবর্ধন তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া অতিশয় তুষ্ট হইলেন এবং আপন শিষ্য করিয়া লইলেন। কালক্রমে ভদ্রবাহু গোবর্ধনের নিকটই সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। কাজেই ভদ্রবাহু এইমতে হইলেন পঞ্চম শ্রুতকেবলী। ইহার পরবর্তী কথাপ্রসঙ্গে রত্নন্দীর আখ্যানের সঙ্গে হরিষেণ লিখিত আখ্যানের একআধটুকু পার্থক্য আছে। তবু পৌণ্ড্রবর্ধনে তাঁহার জন্ম সেই কথা ঠিকই আছে।

এই দেবকোট যে বাংলাদেশের বরেন্দ্রভূভাগে ছিল তাহাও এই বৃহৎকথা কোষগ্রন্থে দেখিতে পাই।

পূর্বদেশে বরেন্দ্রস্য বিষয়ে ধনভূষিতে।
দেবকোট্ট পুরং রম্যং বভূব ভুমি বিশ্রুতম্॥ ১

১৬শ কথানক, পৃ ৩০

অর্থাৎ ধনভূষিত পূর্বদেশে বরেন্দ্রবিষয়ে জগদ্বিখ্যাত রমণীয় দেবকোট নগর ছিল।

সেই নগরে সোমশর্মা নামে চতুর্বেদজ্ঞ ষড়ঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন।

সোমশর্মা ভবদ্ বিপ্রশ্চতুর্বেদষড়ঙ্গধীঃ ॥ ২

তিনি বিষ্ণুদত্তের কাছে ধন লইয়া বিদেশে বাণিজ্যে গেলেন (৫ম শ্লোক) দস্যুরা ধন লুটিয়া লইয়া গেলে দরিদ্র সোমশর্মার বৈরাগ্যোদয় হইল। ভদ্রবাহুর কাছে তিনি সন্ন্যাস লইলেন। কিন্তু বিষ্ণুদত্ত তাঁহাকে টাকার জন্য চাপিয়া ধরিলে দৈবকৃপায় তিনি ঋণমুক্ত হন।

এই গ্রন্থে তাম্রলিপ্তিতে ধনী শ্রেষ্ঠী ধনদত্তের কথা আছে (৫৬ নং গল্প)।

১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য দেবচন্দ্র কর্ণাটভাষায় রাজাবলী কথা রচনা করেন। তাহাতে ভদ্রবাহুচরিতকথা আছে। তাহা অনেকটা রত্নানন্দীর বর্ণনার অনুরূপ। তাহাতে আরও কিছু কিছু তথ্যও জানা যায়। ইহাতে দেখা যায় ভদ্রবাহুর জন্মস্থান কোটিকট্টরের অর্থাৎ পৌণ্ড্রবর্ধনের রাজধানীতে ছিল। জৈনমহাগুরু জম্বুস্বামীর সমাধিস্থানে তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গেই গোবর্ধনাচার্য সেইখানে শ্রুতকেবলী বিষ্ণু, নন্দীমিত্র, অপরাজিত এবং পঞ্চশত শিষ্যসহ আসিয়া উপস্থিত হন।

কবি চিদানন্দ ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাট ভাষাতে মুনিবংশাভ্যুদয়-কাব্য রচনা করেন। তাহাতেও ভদ্রবাহুর চরিত্র বর্ণিত। বাহুল্যভয়ে এখানে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা দিলাম না।

শ্রবণবেলগোলা প্রভৃতি দক্ষিণ জৈনতীর্থধামের বহু লেখের মধ্যে ভদ্রবাহুর নাম ও চরিত্র উৎকীর্ণ পাই। ভদ্রবাহু গুহায়ও সব লেখ আছে। সেই সমস্ত লেখগুলি দেখিলে ইতিহাসরসিকেরা বহু তথ্যের সন্ধান পাইবেন।

কাজেই নানাভাবেই দেখিতেছি ভদ্রবাহু ছিলেন পুণ্ড্রবর্ধন অর্থাৎ উত্তর বাংলাদেশের অধিবাসী।

এই ভদ্রবাহু যে বাঙ্গালী ছিলেন তাহা তাঁহার কল্পসূত্রে দেখিলেও বুঝা যায়। তিনি তাঁহার কল্পসূত্রের অন্তভাগে যতিধর্মনির্দেশক সমাচারী শাস্ত্রে লিখিয়াছেন, "যে সব সাধু ও সাধ্বী (ভিক্ষু-ভিক্ষুণী) সুস্থ ও সবল শরীর, তাঁহারা পর্যুষণ কালে এই নয়টি জিনিষ যেন গ্রহণ না করেন ; দুগ্ধ, দধি, নবনীত, ঘৃত, তৈল, শর্করা, মধু, মদ্য ও মাংস।"

মাংস তো জৈনদের, বিশেষতঃ যতিদের এমনিই নিষিদ্ধ। তখনকার দিনে

কি তাহা চলিত ছিল ? অথবা মাংসাহারে অভ্যস্ত পুণ্ড্রবর্ধনের লোক হওয়ায় তিনি, অন্ততঃ পর্যুষণ কালে, এই নিষেধটি বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ক্ষুদ্রনদীর কথায় তিনি এই প্রকরণেই কুণালের পার্শ্ববর্তী ইরাবতী নদীর কথায় মজা করিয়া বলিয়াছেন, "যাহাতে এক পা ডুবাইয়া আর এক পা শূন্যপথেই অন্যপারে নেওয়া যায়।" (১৩)

পশ্চিম ভারতের ছোট ছোট তথাকথিত নদী দেখিলে বাংলাদেশের লোকের এই কথাই মনে হয়।

স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে ভদ্রবাহু বড় সাবধান। তিনি বলেন, পর্যুষণ কালে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ যে সব স্থানে মলমূত্র ও নিষ্ঠীবন ত্যাগ করেন তাহা যেন বারবার ভাল করিয়া দেখেন, অর্থাৎ সে সব স্থান যেন মলিন না হয়। (৫৫)

ভদ্রবাহুর কল্পসূত্রে যে জাতকের জন্মের ষষ্ঠ রাত্রিতে ষষ্ঠীদেবী আসিয়া কপালে শিশুর ভবিষ্যৎ ভাগ্য লিখিয়া দেন ইহা বাংলার একটি বিশেষ বিশ্বাস। এই সংস্কারটি কি পুণ্ড্রবর্ধন হইতে ভদ্রবাহু মহারাষ্ট্র কর্ণাট পর্যন্ত সমগ্র জৈনদেশে প্রচলিত করিলেন ? এই সংস্কারের কথা পুর্বেই বলা হইয়াছে।[৩৯]

জৈন প্রাকৃতের ও জৈন অপভ্রংশের সঙ্গে বাংলার প্রাকৃতের ও অপভ্রংশের মিল আছে। এমন কি বাংলার সংস্কৃত রচনাতেও তাহা অনেক সময় দেখা যায়।

বাংলায় ন্যায়শাস্ত্র ও জৈন সপ্ত-ভঙ্গী ন্যায়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তাহার আলোচনা আরও ভালরূপে হওয়া প্রয়োজন।

জৈন কল্পসূত্রের স্থবিরাবলীতে দেখা যায় ভদ্রবাহু ছিলেন প্রাচীন গোত্রীয়। তাঁহার কাশ্যপ গোত্রীয় চারিজন শিষ্য। আদি শ্রুতকেবলীর ভদ্রবাহুর সেই শিষ্য চতুষ্টয়ের মধ্যে এক শিষ্যের নাম গোদাসগণী (৬, ১) গোদাসগণীয় শিষ্য সন্ততির চারটি শাখার উল্লেখ সেখানেই পাই। তাহার প্রথম শাখা "তামলিত্তিয়া" (তাম্রলিপ্তীয়া), দ্বিতীয় শাখা "কোডিবরিসিয়া" (কেটিবর্ষীয়া), তৃতীয় শাখার নাম "পোংডবদ্ধনিয়া" (পৌণ্ড্রবর্ধনীয়া), চতুর্থ শাখার নাম "দাসী-খব্বডিয়া"।

এখানে সেই যুগের ভূগোলগত তথ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম কাহারও কাহারও তাহাতে একটু মতভেদও আছে। তাই এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নেপালরাজার গুরু শ্রীহেমচন্দ্র শর্মা তাঁহার সুলিখিত কাশ্যপসংহিতার ভূমিকায় (১৩৭ পৃ) লিখিয়াছেন যে কেটীবর্ষ হইল বর্তমান কাটোরা (কাটোয়া)। শব্দ

সাম্যে তাহা যুক্তিযুক্ত মনে হইলেও আমরা শাসন লিপিতে একটু অন্যরকম দেখিতেছি।

পার্জিটার সাহেবের মতে পুণ্ড্র ও পৌণ্ড্র ভিন্ন স্থান। পুণ্ড্র হইল গঙ্গার উত্তরে, পৌণ্ড্রদেশ গঙ্গার দক্ষিণে বর্তমান বীরভূম জেলায়।

তাম্রলিপ্তের নাম সুবিখ্যাত। মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয় বর্ণনা প্রসঙ্গে তাম্রলিপ্তের সঙ্গে কর্বটদেশের নাম আছে।

তাম্রলিপ্তং চ রাজানং কর্বটাধিপতিং তথা

সভাপর্ব, ৩০ অধ্যায়, ২২৪

কাজেই তাম্রলিপ্তের সঙ্গেই কর্বটের নাম।

বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় দেখি :

ব্যাঘ্রমুখ সুহ্ম কর্বট চান্দ্রপুরাঃ (১৪, ৫)

মার্কণ্ডেয় পুরাণেও কর্বটাশন নামে মানবাচলের পরই চন্দ্রেশ্বরের নাম (৫৮,১১)। ইহাতে মনে হয় কর্বট সুহ্ম ও তাম্রলিপ্তের কাছাকাছি। মেদিনীপুরের কাছাকাছিই কর্বট দেশ ছিল।

কোটিবর্ষ বিষয়ে আমরা পুরাতন তাম্রশাসনে অনেক উল্লেখ পাই।

বাংলাদেশের অনেকগুলি তাম্রশাসনেই কোটিবর্ষের নাম দেখিতে পাই। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত আমগাছি গ্রামে তৃতীয় বিগ্রহ পাল দেবের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। তাহাতে দেখা যায় পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষ বিষয় (২৪ পঙ্‌ক্তি)। দিনাজপুরের অন্তর্গত বাণগড়ের ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে প্রথম মহীপাল দেবের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। তাহাতে দেখা যায় পরম সৌগত রাজা মহীপালদেব তাঁহার নবম রাজ্যাঙ্কে পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষ বিষয়ে (৩০, ৩১ পঙ্‌ক্তি) চূটপল্লিকাবর্জিত কুরট পল্লিকা গ্রাম বুদ্ধ ভট্টারকের উদ্দেশ্যে মহাবিষুব-সংক্রান্তি দিনে কৃষ্ণাদিত্য দেবশর্মাকে দান করেন।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দিনাজপুর জেলার মনহলি গ্রামে পুষ্করিণী খননকালে মদন পাল দেবের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। পরম সৌগত রাজা মদনপাল দেব তাঁহার অষ্টম রাজ্যাঙ্কে মহারাণী চিত্রমতিকা দেবীকে মহাভারত শুনাইবার দক্ষিণারূপে চম্পাহিট্টি গ্রামবাসী বটেশ্বরস্বামী শর্মাকে পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির মধ্যে কোটিবর্ষ বিষয়ে (৩২ পঙ্‌ক্তি) ইলাবর্ত মণ্ডলে কোষ্ঠ গিরি গ্রামে ভূমিদান করিয়াছেন।

১৯৩৩ সালের ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিকাল কোয়ার্টার্লি পত্রিকায় প্রভাসচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন যে, বগুড়া মহাস্থানগড়েই পুরাতন পুণ্ড্রবর্ধনের স্থান। এখানে বহু জৈনমূর্তিও পাওয়া যায়। পাহাড়পুরের কথাও কেহ কেহ মনে করেন।

দেখা যাইতেছে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির বা প্রদেশভাগের অন্তর্গত কেটিবর্ষ একটি বিষয় বা জেলা। এখন পুণ্ড্রবর্ধনের একটি জৈনসম্প্রদায় শাখা থাকা সত্ত্বেও যখন তাহার অন্তর্গত কেটিবর্ষে আর একটি স্বতন্ত্র শাখা থাকার প্রয়োজন দেখা গিয়াছিল তখন বুঝাই যায় উত্তর বঙ্গে জৈনমতের কতদূর প্রবলতা তখন ছিল।

তাম্রলিপ্তি, পৌণ্ড্রবর্ধন, কেটিবর্ষ কর্বট প্রভৃতি নাম দেখা যায় তখনকার দেশের বিখ্যাত সব স্থান।

আমার শ্রদ্ধাভাজন পরম বন্ধু মুনি জিন-বিজয়জী ১৯৩৮ সালের ২রা এপ্রেল তারিখে আমাকে এক পত্রে লিখিতেছেন যে বঙ্গদেশে ভদ্রবাহুর বহু শিষ্য ও বহু কেন্দ্রস্থান ছিল। এখনও সিংহভূম, মানভূম, ময়ুরভঞ্জ প্রভৃতি প্রদেশে জৈন ধর্মের বহু অবশেষ দেখা যায়।

বাংলায় অনেক শব্দের সঙ্গে জৈন শব্দের বিলক্ষণ মিল দেখা যায়। জৈন সাহিত্যে "পল্লীগ্রাম" শব্দের রীতিমত ব্যবহার দেখা যায়।[৪০]

জৈনসাধুদের উত্তরীয়ের নাম "পছেড়ী"; রাঢ়ে উত্তরীয়কে প্রাচীনেরা বলিতেন "পাছুড়ী", এই শব্দটি এখনও গ্রামে লুপ্ত হয় নাই। ধূলা ঝাড়িবার জন্য (রজোহরণার্থ) জৈনসাধুরা যে ঝাঁটা ব্যবহার করেন তাহাকে তাঁহারা "পীছী" বলেন, পূর্ববঙ্গে ঝাঁটাকে বলে "পিছা"। এইরূপ কত আর নাম করিব? ঢাকা জেলার লোহজংঘ নামটিও জৈনতীর্থ কল্পে পাওয়া যায়।[৪১]

নামের ও উপাধির দ্বারা জৈন সাধনা ও বঙ্গদেশের মধ্যে যে যোগ দেখা যায় তাহার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

পুরাতন বাংলা লিপির সঙ্গে জৈনলিপির যতটা মিল দেখা যায় এতটা মিল নাগরী লিপির সঙ্গে দেখা যায় না। এই সাম্যটি বিশেষ করিয়া বুঝা যায় যুক্তাক্ষরগুলি দেখিলে। গুজরাত, কাঠিয়াওয়াড় ও রাজস্থানের বহু জৈনপণ্ডিত এই সাম্যের হেতু কি তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

১৩৩২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীজিন-প্রভসূরি রচিত বিবিধতীর্থকল্পে জৈন তীর্থ পুণ্ড্রবর্ধনের নাম পাই।[৪১] পুণ্ড্রপর্বতের কথাও আছে।[৪১ক]

পুরাতন প্রবন্ধ সংগ্রহে জয়চন্দ্র প্রবন্ধে "বঙ্গালদেশে লখ্ণাবতীপুরী তত্র লখ্ণ সেনো রাজা। তস্ত দুর্গো দুর্গ্রাহ্যঃ"—ইত্যাদি কথা আছে।[৪১খ] ৩৮ নং শ্রীমাতা

প্রবন্ধে দেখা যায় লক্ষ্মণাবতী পুরীর রাজা লক্ষ্মণ সেন এক নারীর প্রাণ হরণ করিতে চান, কারণ সেই নারীর পুত্র রাজা হইবে এইরূপ কথা ছিল। পরে সেই নারী প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন ও তাঁর পৌত্রী পরমতপস্বিনী হন। তিনিই শ্রীমাতা।[৪২]

লক্ষ্মণাবতী নগরে রাজা লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার মন্ত্রী উমাপতি ধরের কথা মেরুতুঙ্গাচার্য তাঁহার প্রবন্ধচিন্তামণি গ্রন্থে চমৎকার চিত্রিত করিয়াছেন। রাজা চণ্ডাল কন্যার প্রেমে আসক্ত হইলে উমাপতি ধর তাঁহাকে যে শ্লোক দ্বারা সাবধান করেন তাহা অতি সুন্দরভাবে এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।[৪৩]

প্রবন্ধকোষে রাজশেখর সূরিও এই গল্পটি করিয়াছেন। সেখানে মাতঙ্গী প্রেমাসক্ত চিত্ত আর রাজাকে বপ্‌পভট্টি শ্লোক লিখিয়া সাবধান করিতেছেন। উভয় গ্রন্থেই দেখা যায় নীতি শ্লোকগুলি একই।[৪৪]

১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে রাজশেখর সূরিকৃত প্রবন্ধকোষে লক্ষ্মণাবতীর কথা আছে। সেখানকার রাজা লক্ষ্মণ সেন এবং সেখানকার দুর্গ দুগ্রহ।[৪৫]

জৈনাচার্য রাজশেখর সূরীর প্রবন্ধ কোষে বিংশ প্রবন্ধের নামই লক্ষ্মণ সেন কুমার দেব প্রবন্ধ। তুঙ্গাচার্যের প্রবন্ধচিন্তামণির পঞ্চম প্রকাশে পাই লক্ষ্মণ সেন উমাপতি ধর প্রবন্ধ।

জৈনাচার্য ছাড়াও রাজপুতানায় ডিংগল সাহিত্যে লক্ষ্মণ সেনের নাম পৌঁছিয়াছিল। ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কবি দামো লক্ষ্মণ সেন পদ্মাবতী চ উপর্হদ নামে কাব্য রচনা করেন। তাহাতে লক্ষ্মণ সেন ও পদ্মাবতীর প্রেমকাহিনী বর্ণিত।

প্রবন্ধকোষে লিখিত আছে গৌড়দেশে লক্ষ্মণাবতী নগরে ধর্ম নামে রাজা ছিলেন, তাঁহার সভায় কবিরাজ বাক্‌পতি ছিলেন সভাসদ্। জৈনাচার্য বপ্‌পভট্টির বিদ্যায় ও গুণে সন্তুষ্ট হইয়া লক্ষ্মণাবতীরাজ তাঁহাকে যথেষ্ট পূজা করেন।[৪৬]

বপ্‌পভট্টি রাজ-ধর্মের সৎকারে লক্ষ্মণাবতী নগরেই রহিয়া গেলে গোপগিরি রাজ আমনৃপতি তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে লক্ষ্মণাবতী যান। আম রাজা লক্ষ্মণ সেনের বারস্ত্রীর গৃহে রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন।[৪৭]

তখন গৌড়-লক্ষ্মণাবতীতে বর্ধনকুঞ্জর নামে একজন অসাধারণ বৌদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। বপ্‌পভট্টি তাঁহাকে বিদ্যাবলে অজেয় জানিয়া কৌশলে পরাভূত করেন।[৪৮]

রাজা যশোধর্ম লক্ষ্মণাবতী জয় করিয়া রাজা ধর্মকে হত্যা করেন এবং বাক্‌পতি কবিরাজকে বন্দী করেন। বন্দিশালায় কবিরাজ বাক্‌পতি গৌড়বধ কাব্য রচনা

করেন। তাহাতে তিনি মুক্ত হইয়া বপ্‌পভট্টির কাছে যান ও সেখানকার রাজা আমকে মহামহবিজয় নামে প্রাকৃত কাব্য শুনাইয়া সন্তুষ্ট করেন ও বহু পুরস্কৃত হন।[৪৯]

বাক্‌পতি প্রথমে নাকি মহাভারত কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। দ্বৈপায়ন আসিয়া তাঁহাকে ভারত রচনা ও সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিতে নিষেধ করেন।

তাই তিনি গৌড়বধ নামে প্রাকৃত গ্রন্থ রচনা করেন।[৫০]

পূর্বদেশে লক্ষ্মণাবতী নগরে লক্ষ্মণসেন নামে "প্রতাপী" ও "ন্যায়ী" রাজা ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন প্রজ্ঞাবিক্রমভক্তিসার কুমার দেব। বারাণসীরাজ গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র জয়ন্তচন্দ্র লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিলে কুমারদেবের বুদ্ধিবলে লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে জয়ন্তচন্দ্রের শত্রুতা গিয়া স্থাপিত হয় মিত্রতা।[৫১]

এমনকি ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দেও বাংলাদেশে বর্ধমানে জৈনাচার্য চিত্রসেন চিত্র চম্পূগ্রন্থ রচনা করেন।[৫২]

জৈনগ্রন্থসমূহে এইরূপ বহু আখ্যায়িকা আছে। তাহাতে গৌড়লক্ষ্মণাবতী প্রভৃতির উল্লেখ মেলে।

প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য হেমচন্দ্রের জীবনীতে পাওয়া যায় তিনি তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া তাম্রলিপ্তিতে আসিয়াছিলেন।[৫৩]

এইসব নানা কারণেই মনে হয় তখন জৈনদের সঙ্গে গৌড় ও বাংলা দেশের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

আর একটি বড় প্রমাণ হইল পূর্ববঙ্গে জৈন ব্যাকরণ কাতন্ত্রের এত বহুল প্রচার। আমাকে আমার বন্ধুবর শ্রীমুনি জিন-বিজয়জী লিখিয়াছেন, "কাতন্ত্র ব্যাকরণের কথা আমি বিশেষ জোরের সহিত বলিতে পারি না, ইহা বৌদ্ধদের ব্যাকরণও হইতে পারে।" কাতন্ত্র ব্যাকরণ সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র প্রকরণ এই গ্রন্থের মধ্যে লিখিয়াছি। তাহাতেই সব কথা বুঝা যাইবে। এখন গুজরাত প্রভৃতি দেশে উহার তত প্রচলন নাই, তাই মুনি জিন-বিজয়জী তাহার সম্বন্ধে ভাল করিয়া কিছু না বলিতে পারা আশ্চর্য নহে। একটি স্বতন্ত্র প্রকরণে কাতন্ত্র ব্যাকরণ সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করা যাইবে।

বাংলাদেশে মহাভাষ্যের অনুযায়ী ব্যাকরণ ব্যাখ্যাতা হইলেন 'ভাগবৃত্তি'কার। শ্রীপতিদত্তের কাতন্ত্র পরিশিষ্টে দেখা যায় ভাগবৃত্তিকারের নাম বিমলমতি (১, ১৪২)। খুব সম্ভব নবম কি দশম শতাব্দীতে ভাগবৃত্তি রচিত হয়। পদ্মপুরাণে দেখা যায় গৌড়ের রাজা ছিলেন নরসিংহ।[৫৪] তাঁহার সময়ে মহাভাষ্যকে

ফণীশ্বর পুনরুজ্জ্বল করেন।[৫৫] পুরী গোবর্ধন মঠের পাঠ 'ফণীশ্বরঃ' স্থানে "মুনীশ্বরঃ।" খুব সম্ভব বিমলমতি জৈন মুনীশ্বর ছিলেন। স্থানান্তরে এই বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

পূর্ববঙ্গের অন্যান্য ভাগেও জৈনমূর্তি প্রভৃতির অসদ্ভাব নাই। রাঢ়দেশ মানভূম প্রভৃতিতে জৈনদের যে বড় বড় সব স্থান ছিল তাহাতো পূর্বেই বলা হইয়াছে। এখনও সমেত শেখর প্রভৃতি সেই প্রদেশেই অবস্থিত। বাঁকুড়া, মানভূম, হাজারিবাগ প্রভৃতি প্রদেশে জৈনমূর্তি ছাড়াও সরাক জাতি নামে যে জাতি আছে তাহারা জৈনদের শ্রাবকদেরই অবশেষ। উড়িষ্যার বরম্বারাজ্যে বহু সরাকের বাস। তাঁহাদের পূজার্চনা তাঁহাদের নিজেদের আচার্যরাই করেন, ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয় না। বিবাহে মাত্র হোমটুকু করিতে ব্রাহ্মণকে ডাকা হয়, বাকি সব কাজ আচার্যের। তাঁহাদের প্রধান তীর্থ খণ্ডগিরির গুহামন্দির। বৎসরে সেখানে একবার তাঁহাদের যাওয়া চাই। গেট সাহেবের মতে তাঁহারা বৌদ্ধ।[৫৬]

রাঁচী জেলার অন্তর্গত খুংটি মহকুমার মধ্যে বাংলাভাষী এমন এক জাতির লোক বাস করেন যাঁহারা জীবহিংসা করেন না। তাঁহারা নিরামিষাশী। খুংটি হইতে ক্রোশ চারেক দূরে হাসা, গাগরা প্রভৃতি গ্রামে এইরূপ বহু লোক বাস করেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অল্প বিস্তর লেখাপড়া জানেন। আচারে ব্যবহারে রীতিনীতিতে সর্বভাবে তাঁহারা বাঙ্গালী। বেশভূষা ও কাপড় পরার রীতিও তাঁহাদের বাঙ্গালীর। মেয়েরা জল আনিতে কলসী কাঁখে লন। শুধু মাছ মাংস ইঁহারা খান না। জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "আমরা জৈন।" তাঁহাদের পূর্বপুরুষেরা নাকি মানভূম জেলা হইতে ঐ সব দেশে গিয়া বাস করেন; সে বহুকালের কথা। ইঁহাদের বিশেষভাবে জানেন বিহারের মৎস্য বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন। তাঁহার কাছেই আমি ইঁহাদের খবর পাইয়াছি। ইঁহারা হয়তো পুরাতন কোনো শ্রাবকদলেরই অবশেষ।

যে ভদ্রবাহু পৌণ্ড্রবর্ধন হইতে বাহির হইয়া পাটলিপুত্র, মালব, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, মহীশূর পর্যন্ত জৈনধর্ম প্রচার করিয়াছেন, আজ তাঁহাদেরই দেশে রাজপুতানা গুজরাত কাঠিয়াওয়াড় প্রভৃতি দেশ হইতে জৈনগণ আসিয়া জৈন মন্দির ও উপাশ্রয় সকল প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। এখন জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থান জৈনদের তীর্থের মত হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতাতেও পরেশনাথ প্রভৃতি মন্দির সকল জৈন ভক্তগণের আরাধ্য ক্ষেত্র।

বাংলার জৈনধর্ম বহুকাল পরে আজ বাংলাতেই ফিরিয়া আসিয়াছে বাঙ্গালী যেন যোগ্য সম্মান ও আদর দেখাইয়া এই ধর্মের সব জ্ঞান ও শিক্ষাকে। গ্রহণ করেন ; ইহাদের শাস্ত্র ও সিদ্ধান্তগুলির প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হ'ন ; সর্বভাবে এইসব শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা আপনাদিগকে ধন্য করেন। বাইবেল গ্রন্থে বর্ণিত আছে ঘরের ছেলে বহুকাল পরে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার প্রতি স্নেহ ও প্রীতি শতধারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি এই ধর্ম ও এই শাস্ত্রের প্রতি তেমনি অপরিমিত হউক।

প্রমাণ-পঞ্জী

১ স্যান্‌স্ক্রুট্ বুড্‌ডিষ্ট্ লিটারেচর্ অব নেপাল, ১৮৮২ পৃ—১১

২ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবাসী, ১৩৩৭ আশ্বিন, ৮১১ পৃ

৩ ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়ান স্কুল অব্ মিডিয়াভ্যাল স্কাল্‌প্‌চার্‌স্ পৃ—১৪৪

৪ জাঃ এঃ সোঃ বেঃ ভ-৫ পৃ—২৩৯

৫ মডার্ণ রিভিয়ু ১৯২৮ ভ-১, পৃ-৫০২ অ্যানুয়াল রিপোর্ট অব আর্কি সার্ভে অব ইণ্ডিয়া ১৯২৫-২৬, পৃ—১১০—ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিকাল্ কোয়ার্টারলির (১৯৩১, পৃ—৪৩৯) উদ্ধৃতি অনুসারে।

৬ এপিঃ ইণ্ডিঃ ভ-২০, পৃ ৩৯

৭ বিজয়নাথ সরকার ইণ্ডিঃ হিষ্টরিক্যাল কোয়ার্টারলি, ১৯৩১, পৃ—৪৪১

৮ ঐ, পৃ ৫২৮

৯ বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির রিপোর্ট, ১৯২৮, '২৯, '৩০

১০ কালিদাস দত্ত, ভারতবর্ষ, ১৩৩৬ আশ্বিন, পৃ ৫৬১—৫৭৭। মেদিনীপুরে তো রাঢ়ের মতই জৈনমূর্তির ছড়াছড়ি।

১১ জৈনিজম ইন নর্দার্ন ইণ্ডিয়া—চিমনলাল সাহ, পৃ—৩৩

১২ ঐ, পৃষ্ঠা ১৫১।

১৩ সেক্রেড্ বুক্স অব দি ইষ্ট আচারাঙ্গ সূত্র—১, ৮, ৩, ১—২

১৪ ঐ, S. B. E. ১, ৮, ৩, ৩ ; ম্যাক্রিউগ—উদাহরণ সুযম্. ৯, ৩. ১

১৫ ঐ—১, ৮, ৩, ৪

১৬ ঐ—১, ৮, ৩, ৫

১৭ ঐ—১, ৮, ৩, ৭

১৮ ঐ—১. ৮, ৩, ৮-৯ ম্যাক্রিউগ্, ঐ, ৮

১৯ জ্যাকোবি-আচারাঙ্গ সূত্র, পৃ ১৫

২০ দ্রষ্টব্য—কল্পসূত্র, রেভাঃ জে, ষ্টিভেন্‌সন্‌স্ পৃঃ ৭৮

২১ জৈনিজম্ ইন নর্দার্ন ইণ্ডিয়া পৃ—৭৮

২২ এপিঃ ইণ্ডিঃ ভ—৯, পৃ—৫৫

২৩ ঐ, ভ-৫, পৃ—১৮, ২৫০

২৪ ইণ্ডিঃ এণ্টিঃ ভ-২০ পৃ—৩৪১-৩৬১

২৫ এন্সাইক্লোপিডিয়া অব্ রিলিজিয়নস্ এণ্ড এথিক্স্ ভ-৯, পৃ—৬৬

২৬ এন্সাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন্স্ এণ্ড এথিক্স্ ভ৯, পৃ—৬৫-৬৬

২৫ক এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন এণ্ড এথিক্স, পৃ ১২৩

২৬ক ইণ্ডিয়ান লিটারেচার, পৃ ৪৩৭-৪৩৮

২৭ জার্ণাল অব বিহার উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি, চতুর্থ খণ্ড, পৃ ৩৮৯

২৮ ভদ্রবাহ চরিত, ৪,১৫৪ শ্লোক

২৯ জৈনিজম ইন নর্দার্ন ইণ্ডিয়া, পৃ ২৩৩-২৩৪

৩০ কল্পসূত্র : ভূমিকা, পৃ ১৩

৩১ সূরি পরংপরা প্রশস্তি, ১১

৩২ ভদ্রবাহুী সংহিতা : ভূমিকা, পৃ ৯

৩৩ জৈনিজম ইন নর্দার্ন ইণ্ডিয়া, পৃ ৩০

৩৪ কল্পসূত্র স্টিভেনসন : ভূমিকা, পৃ ২৪

৩৫ Z. D. M. G., XXXVIII, pp. 17

৩৬ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, জালি, পৃ ১০-১১

৩৭ জৈনিজম ইন নর্দার্ন ইণ্ডিয়া, পৃ ১৩৭

৩৮ জার্ণাল অব বিহার উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৪৫২

৩৯ কল্পসূত্র, স্টিভেনসন, পৃ ১৮

৪০ ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টার্লি, ১৯৩৩, পৃ ৭২২। প্রবন্ধ চিন্তামণি, মল্লবাদি প্রবন্ধ ২০২, পৃ ১০৭

৪১ সিংঘী জৈনগ্রন্থমালা, অপাপাবৃহৎকল্প, পৃ ৪১

৪১ক চতুরসূরি মহাতীর্থনাম সংগ্রহকল্প, পৃ ৮৬

৪১খ সিংঘী জৈনগ্রন্থমালা, পৃ ৮৮

৪২ পুরাতন প্রবন্ধ-সংগ্রহ, পৃ ৮৪

৪৩ সিংঘী জৈনগ্রন্থমালা, পৃ ১১২-১১৩

৪৪ বপ্পভট্টী সূরি প্রবন্ধ, পৃ ৩৮

৪৫ সিংঘী জৈনগ্রন্থমালা, পৃ ৮৮

৪৬ প্রবন্ধকোষ, বপ্পভট্টী সূরি প্রবন্ধ, পৃ ৩০

৪৭ প্রবন্ধকোষ, বপ্পভট্টী, সূরি প্রবন্ধ, পৃ ৩৩

৪৮ প্রবন্ধকোষ, বপ্পভট্টী, সূরি প্রবন্ধ, পৃ ৩৫

৪৯ প্রবন্ধকোষ, বপ্পভট্টী, সূরি প্রবন্ধ, পৃ ৩৭

৫০ পুরাতন প্রবন্ধ-সংগ্রহ, পৃ ১২২

৫১ পুরাতন প্রবন্ধ-সংগ্রহ—লক্ষ্মণসেন কুমারদেব প্রবন্ধ, পৃ ৮৮

৫২ হরিষেণ কথাকোষ, সিংঘী গ্রন্থমালা—১৭ : ভূমিকা, পৃ ১২০

৫৩ সিংঘী জৈনগ্রন্থমালা ১১শ সংখ্যক, পৃ ১০

৫৪ উত্তর, ১৮৯, ২

৫৫ উত্তর, ১৮৯, ৭

৫৬ এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন এণ্ড এথিক্স; পৃ ৪৯৫

জৈনমতের ব্যাকরণ, কাতন্ত্র

কেহ কেহ বলেন প্রাচীনযুগে বাংলাদেশে জিন-প্রভাবের সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ হইল বাংলাদেশে অবৈদিক ব্যাকরণ কাতন্ত্রের প্রচার। তাহার প্রমাণই হইল "দেবদেবং প্রণম্যাদৌ সর্বজ্ঞং সর্বদর্শিনম্' এই সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী জিন বা বুদ্ধ উভয়ই হইতে পারেন। কাতন্ত্র অর্থই সংক্ষিপ্তভাবে লেখা কোনো শাস্ত্র। যাঁহারা প্রাকৃত ভাষা জানেন তাঁহাদের পক্ষে সংস্কৃত ভাষা শিখিতে এই ব্যাকরণটি অতি সুন্দর পথ। আচার্য উইবার বলেন কচ্চায়ণের ব্যাকরণও এই কাতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীপাদ কৃষ্ণবেলবলকর মহাশয় তাঁহার 'সিসটেম অব স্যাংস্কৃট গ্রামারিয়ানস' নামক পুস্তকে কাতন্ত্র ব্যাকরণ সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইয়াছেন।

ব্যাখ্যান প্রক্রিয়াকার বলেন, "পণ্ডিতেরা পাণিনি প্রভৃতি বহু শ্রমসাধ্য বৃহৎ ব্যাকরণ আয়ত্ত করিতে পারেন কিন্তু যাঁহারা ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকার্য বা অন্য কাজ কারবার করেন যাঁহাদের সময় কম, তাঁহাদের জন্য এই সরল ব্যাকরণটি লেখা।" ব্যাখ্যান প্রক্রিয়া পুঁথি ডেককান কলেজ লাইব্রেরীতে রক্ষিত। সেই পুঁথি হইতে বেলবলকর এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন (৮২ পৃষ্ঠা)

বণিক্‌শস্যাদি সংসক্তা লোকযাত্রাদিষু স্থিতা

এই কাতন্ত্র ব্যাকরণের কথায় অনেকদিন পর্যন্ত কেহ বড় মনোযোগ দেন নাই যদিও উইবার প্রভৃতি পণ্ডিতের দল ইহার সামান্য উল্লেখ করিয়াছেন। এগেলিং-এর সম্পাদিত দুর্গসিংহবৃত্তি সহ প্রথমে তাঁহাদের দৃষ্টি কাতন্ত্রের দিকে আকৃষ্ট করে। বলার প্রভৃতি পণ্ডিতেরা তাঁহাদের রিপোর্টে ও কাশ্মীরের পত্রে কাতন্ত্রের নাম ও কিছু খবর দিয়াছেন।

ডাক্তার এ সি বারনেল তাঁহার 'অন অন্দ্র স্কুল অব স্যাংস্কৃট গ্রামারিয়ানস' পুস্তকে তাঁহার অনেকটা খবর দিয়াছেন। তাহাও ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের খবর। তারপর ডাক্তার শ্রীপাদ কৃষ্ণ বেলবলকর তাঁহার 'সিসটেম অব স্যাংস্কৃট গ্রামারিয়ানস' পুস্তকে আরও কিছু আলোচনা করিয়াছেন। তিনি অতিশয় যোগ্য লোক। তবু এই আলোচনা ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের। ইহার পর আরও বহু সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে।

এখন যোগ্য কেহ যদি এই ভার গ্রহণ করেন তবে অনেক কিছু নূতন খবর দিতে পারেন।

বাংলায় জনমত প্রভাবের কথা বলিতে গিয়া আমি কাতন্ত্রের কথা সামান্তভাবে কিছু জানাইতেছি।

পূর্ববঙ্গে কাতন্ত্র অর্থাৎ কলাপ ব্যাকরণেরই প্রচলন। পশ্চিমবঙ্গে মুগ্ধবোধ প্রভৃতির প্রভাব। কাতন্ত্র ব্যাকরণ কত দিনের প্রাচীন বলা সহজ নহে। আচার্য বারনেল বলেন, মনে হয় এই সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্কৃত ব্যাকরণটি স্বীয় প্রাচীন আকারে পাণিনিরও পূর্বে বিদ্যমান ছিল।[১] কথা সরিৎসাগরে (অধ্যায় ২-৭) এইরূপ একটি কথা থাকা সত্ত্বেও বেলবলকর প্রভৃতি পণ্ডিতেরা নানা যুক্তিতে ইহা স্বীকার করেন না।

এই ব্যাকরণের কতক শ্লোকাত্মক কতক সহজ সূত্রাকারে রচিত। তাহাতেই মনে হয় এখন এই ব্যাকরণের যেই রূপটি পাই তাহা নানাযুগের সাধনার ফল। যেখানে শ্লোকাকারে বা অন্যভাবে কিছু রূপান্তর করা হইয়াছে সেখানেও কারিকার মত হয়তো পূর্বসূত্রগুলিই অনুসৃত হইয়াছে, অর্থাৎ ইহার মূল বৈশিষ্ট্যটি অনেকটা বজায় আছে।[২]

তিব্বতের অনুবাদগুলিতে দেখা যায় কাতন্ত্র ব্যাকরণের অনুবাদের পরে, সপ্তদশ শতাব্দীতে, পাণিনীয় ব্যাকরণ গুলির অনুবাদ হইয়াছে, কারণ তাহাতে ভট্টোজী দীক্ষিতের নাম পাই।

কাতন্ত্র বা কলাপের প্রথম অনুবাদ তিব্বতীতে কখন হয় তাহা বলা কঠিন তবে কাতন্ত্রীয় ধাতুকোষের অনুবাদক তিব্বতীয় গ্রন্থসূচীমতে বু-স্তোন। তাঁহার সময় ১২৯০-১৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দ। ইহার কথা পরে বলা হইবে।

এইখানে বলা উচিত এইকথা আমরা কার্ডিয়ার হইতে গ্রহণ করিতেছি। তিনি যে সূচীর কথা বলেন তাহা আমাদের কাছে নাই যে মিলাইয়া দেখিব।

তিব্বতীয় অনুবাদগুলির মধ্যে প্রথমেই নাম করিতে চাই "শিষ্যহিতা কলাপ সূত্রবৃত্তি", Ka. la. Pa 'i, mdo'i. grel. pa. Slob. ma. la. phan. pa. ঐ গ্রন্থের রচয়িতার নাম যশোভূতি, Grags. 'byor। নার্থাং জাইলোগ্রাফ পুষ্পিকাতে "দ্রগ্ ব্যোর" বা রুদ্রভূতির নামও পাওয়া যায়।

ইহার অনুবাদক হইলেন মহা-অনুবাদক ভাষাদ্বয়ভাষী শাক্যভিক্ষু ধর্মস্বামী স্থিরমতি। তিব্বতীয় সূচীমতে তিনি দ্পল অধিবাসী। তিব্বত-সংস্কৃত পণ্ডিত। মঙ্গোলীয় সূচি অনুসারে অনুবাদকের নাম বোধিজগ্র। এই অনুবাদকার্যে সংস্কৃতে

মহাপণ্ডিত তিব্বতীয় আচার্য শাক্যভিক্ষু বোধিশিখর সহায়তা করিয়াছিলেন। মহাপুরুষ নায়ক আনন্দবজ্রের আজ্ঞায় এই অনুবাদটি সম্পাদিত হয়। এই অনুবাদটির লেখকের নাম হইল মহাপিটকধর বিদ্যারাজ। লাসার, Phrul-Suan বিহারে এই অনুবাদ কার্য সম্পন্ন হয়।

কিন্তু নার্থাং সংস্করণের "জাইলোগ্রাফ" এর পুষ্পিকায় পাইতেছি যে এই গ্রন্থ ভাষাদ্বয়ভাষী তিব্বতীয় শাক্যভিক্ষু বোধিশেখর অনুবাদ করেন। ভাষাদ্বয়ভাষিগণের শিরোমণি মুনীন্দ্র শ্রীধর্মস্বামীর স্থিরমতির প্রাসাদেই এই অনুবাদ সম্পন্ন হয়। ইহাতে মহাপুরুষ নায়ক আনন্দবজ্রের নাম বা লেখক মহাপিটকধর বিদ্যারাজের কোনো উল্লেখ পাই না। বিহারেরও কোনো উল্লেখ নাই।

কলাপসূত্রের তিব্বতীয় অনুবাদ আছে। ইহার মূল গ্রন্থের রচয়িতার নাম দেওয়া না থাকিলেও ইহার রচয়িতা শর্ববর্মাচার্য বা সর্ববর্মাচার্য, সপ্তবর্মাচার্য বা ঈশ্বরবর্মাচার্য বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এই গ্রন্থের অনুবাদক হইলেন স্থিরমতি, তৃতীয়। তিব্বতীয় সূচীমতে কীর্তিধ্বজ ইহার অনুবাদক। এই অনুবাদটি দুর্গসিংহকৃত বৃত্তি অনুসারে সম্পাদিত। অনুবাদকার্যে অনুবাদবিচক্ষণ মহাপণ্ডিত বজ্রধ্বজের ব্যাখ্যা অনুসরণ করা হইয়াছে। তিব্বতের শ্রীপাণ্ডুভূমি বিহারে এই অনুবাদটি সম্পন্ন করা হয়। এই গ্রন্থের পুষ্পিকাতে বহুশ্রুত বসুবন্ধুর নাম পাওয়া যায়।

দুর্গসিংহকৃত কলাপসূত্রবৃত্তিরও অনুবাদ তিব্বতীতে করা হইয়াছে। অনুবাদে নাম দেখা যায়—কলাপসূত্রবৃত্তিনাম। অনুবাদকের নাম ভিক্ষু শ্রীমৎ স্থিরমতি। তিব্বতীয় সূচীমতে অনুবাদক কীর্তিধ্বজ। ত্রিলোচন দাসকৃত পঞ্জিকার সহায়তায় এই অনুবাদটি সম্পাদিত হয়। Dpal. gnas. po. che বিহারে এই অনুবাদটি সম্পন্ন হয়।

কলাপধাতুসূত্রের যে তিব্বতীয় অনুবাদ, তাহাতে মূলগ্রন্থের রচয়িতার নাম জানা যায় না। মঙ্গোলীয় সূচী অনুসারে অনুবাদকের নাম মঞ্জুঘোষ খড়্গ। মহাপণ্ডিত বোধিশিখরের সহায়তায় এই অনুবাদ কার্যটি সুসম্পন্ন হয়।

দুর্গসিংহকৃত কলাপ-উণাদি সূত্র ও তিব্বতীতে ভাষান্তরিত করা হয়। Dpal. E. বিহারে পণ্ডিত আকাশভদ্র এই অনুবাদটি সম্পন্ন করেন। এখানে বলা উচিত যে নার্থাং সংস্করণের জাইলোগ্রাফের পুষ্পিকাতে দুর্গসিংহের নাম নাই।

দুর্গসিংহকৃত কলাপ-উণাদি-বৃত্তিরও তিব্বতীয় অনুবাদ হইয়াছে। অনুবাদক

ছইলেন দ্পল-ইবিহারবাসী বজ্রধ্বজ। ইহার ধর্মগুরু ও দর্শনশাস্ত্রগুরু মহাপণ্ডিত শ্রীমাণিক এবং বৈয়াকরণ ও নৈয়ায়িক শ্রীমৎ পুণ্যভদ্র। মহাধর্মরাজ তাই স্বতুর—কার্ডিয়ারের মতে সি-তু—সহায়তায় এই কর্ম সুসম্পন্ন হয়। তাই স্বতু সর্বজগৎকে পুত্রবৎ দেখিতেন বলিয়া উল্লিখিত।

ধাতুকায় গ্রন্থখানির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তিব্বতীয় ভাষাতে এই গ্রন্থখানি রূপান্তরিত করা হয়। গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায় না। কাডিয়ার বলেন পুষ্পিকাতে দেখা যায় দুর্গসিংহকৃত নবসংখ্যা ধাতুগ্রন্থের প্রেরণায় এই কাজ সুসম্পন্ন হয়।

তিব্বতীয় সূচিমতে এই অনুবাদকর্তার নাম বু-স্তন। মঙ্গোলীয় সূচিমতে তাঁহার নাম রত্নসিদ্ধি। নার্থাংএর জাইলোগ্রাফের পুষ্পিকায় দুর্গসিংহকৃত নবসংখ্যা-ধাতুগ্রন্থের নাম ও আকৃতির পরিচয় আছে। কিন্তু তাহাতে "প্রেরণায়" কোনো কথা স্পষ্ট উল্লিখিত নাই। এই পুষ্তিকাতে বু-স্তনের কোনো স্পষ্ট উল্লেখ নাই। ধাতুবৃত্তি অনুসারে এই অনুবাদটি পরে সংশোধিত হয়। ন্যায় ব্যাকরণ পণ্ডিত রত্নবিজয় এই গ্রন্থ শুদ্ধ করেন ও লিপিকর্ম সম্পন্ন করেন। অনুবাদক বু-স্তনের সময় জানা গিয়াছে। ১২৯০—১৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

"কলাপলঘু বৃত্তৌ শিষ্যহিতনাম" ব্যাকরণের আদি রচয়িতার নাম পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ যশোভূতি। মঙ্গোলীয় সূচিমতে ব্রাহ্মণ কীর্তিবোধি। তারকেশ্বরকৃত লঘুবৃত্তি নামে একখানা ব্যাকরণ ছিল। তারকেশ্বরের তিব্বতী অনুবাদ—Sqrol. ba'i. dbau. phyug। তাহা হইতে বারনেল সাহেব সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়াছেন মুক্তেশ্বর বা মুক্তস্বামী। অবশ্য তিনিও পণ্ডিত Schiefuer ও Csoma de Koros প্রভৃতির মত অনুসরণ করিয়াছেন। তারকেশ্বরের গুরুর নাম শ্রীমৎ সমাধিভদ্র পাদ বলিয়া জানা যায়।

তারকেশ্বরের দুরূহ লঘুবৃত্তি হইতে আপন শিষ্যদের সুবিধার জন্য যশোভূতি এই সুগম ও সরল টীকাটি রচনা করেন। কনকবিহারে বসিয়া দেবগুরু শান্তিপ্রভ এই অনুবাদ সম্পন্ন করেন।

তিব্বতীয় ব্যাকরণের আদি লেখক নাকি পণ্ডিত থোন-মি-সম্ভোট—বারনেল-এর মতে সম্বোধ। তাহার লিঙ্গাবতার নামক ব্যাকরণ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে লেখা।

এখানে বলা উচিত যে তিব্বতে পাণিনীয় ব্যাকরণগুলির অনুবাদের পূর্বেই কাতন্ত্র মতের ব্যাকরণগুলির প্রচলন ও অনুবাদ করা হয়।

বিদেশী পর্যটকদের মধ্যে আল-বেরুণী ছিলেন সংস্কৃতে বিশেষ পণ্ডিত। তিনি তখনকার দিনের—১২২০-১২৩০ খ্রীষ্টাব্দ—ভারতের সংস্কৃতি ও বিদ্যাচর্চার বিষয় সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তখনকার দিনের প্রচলিত ব্যাকরণের নাম করিতে গিয়া তিনি এই কয়খানির উল্লেখ করিয়াছেন

১। ঐন্দ্র

২। চান্দ্র

৩। শাকট

৪। পাণিনি

৫। কাতন্ত্র, শর্ববর্মরচিত

৬। শশিদেব বৃত্তি (শশিদেব কৃত)

৭। দুর্গ বিবৃত্তি

৮। শিষ্যহিত বৃত্তি, উগ্রভূতি রচিত।

উগ্রভূতির শিষ্যহিতবৃত্তি একটি বিখ্যাত কাতন্ত্রীয় ব্যাকরণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানির প্রতি লোকের অনুরাগ আকর্ষণ করিবার জন্য আচার্য উগ্রভূতির শিষ্য কাশ্মীরের রাজা আনন্দপাল যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। তাহাতে সেই দেশে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার হয়।[৩]

কাতন্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে উপাখ্যান আমাদের দেশে প্রচলিত তাহার সন্ধানও আল-বেরুণী পাইয়াছিলেন। তিনি তাহা লিখিয়াও গিয়াছেন। কাতন্ত্র ব্যাকরণের উৎপত্তিকথা তাঁহার লেখা হইতেই প্রথমে দেখান যাউক।

একদিন রাজা সাতবাহন যখন স্ত্রীগণের সঙ্গে জলক্রীড়ারত, তখন তিনি এক রাণীকে বলিলেন, "মোদকং দেহি" অর্থাৎ "মা-উদকম্ দেহি"—আমার উপরে জল ছিটাইও না। রাণী বুঝিলেন "মোদকং দেহি" অর্থাৎ "মিষ্টান্ন দাও", ইহাই রাজা বলিলেন। তাই তিনি শীঘ্র গিয়া মিষ্টান্ন আনিলেন। রাজা তাহাতে বিরক্ত হইলে রাণী তাঁহাকে কিছু কড়া কথা শুনাইয়া দিলেন। রাজা দুঃখিত হইয়া অন্নজল পরিত্যাগ করিয়া "গোসাঘরে" পড়িয়া রহিলেন। তখন একজন মহাজ্ঞানী আসিয়া তাঁহাকে ভরসা দিলেন যে সহজে সংস্কৃত শিখিবার মত একটি ব্যাকরণ তিনি রচনা করিয়া দিবেন। তিনি উপবাসে ও কৃচ্ছ্র তপস্যায় মহাদেবকে প্রসন্ন করিলে মহাদেব তাঁহাকে এই ব্যাকরণ রচনায় শক্তি দিলেন। জ্ঞানী কাতন্ত্র ব্যাকরণ রচনা করিয়া প্রথমে রাজাকে তাহা শিক্ষা দিলেন।

১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে জৈনাচার্য রাজশেখর সুরি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ, প্রবন্ধ কোষ

লেখেন। তাহাতে আছে, "রাজা সাতবাহনের পত্নীগণ ছিলেন ষড়্‌ভাষা কবিত্ব-বিৎ। রাজা ছিলেন অনধীত ব্যাকরণ। উষ্ণকাল আসিল, জলকেলি আরম্ভ হইল। চন্দ্রলেখা ছিলেন শীতে কাতর। পিচকারী দিয়া রাজা তাঁহার গায়ে জল ছিটাইতে লাগিলেন। চন্দ্রলেখা বলিলেন, "দেব, মাং মোদকৈঃ পূরয়"। রাজা কথাটা না বুঝিয়া রাণীর জন্য মোদক অর্থাৎ মিঠাই আনাইলেন। ইহা দেখিয়া রাণী উঠিলেন হাসিয়া। রাজা হাসিবার হেতু বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইলেন। তখন তপস্যায় ভারতীকে প্রসন্ন করিয়া রাজা মহাকবি হইলেন এবং সারস্বত ব্যাকরণাদি শাস্ত্রসমূহ রচনা করিলেন।"[৪]

১৩০৪ খ্রীষ্টাব্দে মেরুতুঙ্গাচার্য তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ, প্রবন্ধ চিন্তামণি রচনা করেন। তাহাতেও সাতবাহন প্রবন্ধ—দ্বিতীয় প্রবন্ধ—আছে, কিন্তু এই গল্পটি নাই। তিনি তাঁহার অষ্টম প্রবন্ধে—সিদ্ধরাজাদি প্রবন্ধ—পাণিনি, কাতন্ত্র শাকটায়ন, চান্দ্র, কণ্ঠাভরণ প্রভৃতিকে তিরস্কার করিয়া সিদ্ধহেমোক্ত ব্যাকরণকেই প্রাধান্য দিয়াছেন।[৫]

সিদ্ধহেমচন্দ্র ব্যাকরণ প্রচারে যে সব পণ্ডিতজন সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কাকল বা কাক্কল নামে একজন কায়স্থবংশীয় অতুলনীয় পণ্ডিত ছিলেন। সিদ্ধরাজ তাঁহাকে অনহিলরাড় পত্তনে ব্যাকরণের মুখ্যাচার্যপদে নিযুক্ত করেন।[৬]

সাতবাহনের নামে প্রচলিত এই গল্পটিই আমাদের দেশের নানা প্রদেশে নানা ভাবে প্রচলিত। শ্রীপাদ কৃষ্ণ বেলবলকার মহাশয় যে গল্পটি দিয়াছেন তাহাতে দেখি রাণী বলিলেন "মোদকং দেহি রাজন্"। রাজা তাহাতে "আমাকে আর জল দিও না" ইহা না বুঝিয়া বলিলেন—"মিষ্টান্ন দাও"। যখন রাজা তাঁহার ভুল বুঝিলেন তখন লজ্জিত হইয়া শর্ববর্মাচার্যকে একটি সরল সুখবোধ্য অল্পকাল-সাধ্য সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনার জন্য অনুরোধ করিলেন। আচার্য তপস্যায় শিবকে প্রসন্ন করিলেন। কার্তিকেয়কে শিব আজ্ঞা দিলেন আচার্যের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে। কার্তিকেয় তাঁহাকে সূত্রগুলি দিলেন। কুমারের দত্ত বলিয়া এই ব্যাকরণের নাম কৌমার, কার্তিকেয় বাহন কলাপী অর্থাৎ ময়ূরের নামে ইহা কলাপ নামে পরিচিত। সংক্ষিপ্ত সুগম শাস্ত্র বলিয়া ইহার নাম হইল কাতন্ত্র।

সাতবাহনের আজ্ঞায় শর্ববর্মাচার্য কাতন্ত্র ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন—ইহাই সর্বজন-প্রসিদ্ধ। কিন্তু সাতবাহন কোনো একজন রাজার নাম নহে। দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রবংশীয় কয়েকজন রাজা পরপর এই নাম ব্যবহার করিয়াছেন।

খ্রীষ্ট পূর্ব তৃতীয় হইতে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত তাঁহাদের কাল। বিশেষ-ভাবে খ্যাত সাতবাহন রাজার নাম গোতমীপুত্র। ১১৯-১২৮ খ্রীষ্টাব্দ তাঁহার সময়।

সরলতাই কাতন্ত্রের এত আদরের কারণ। ভারতের নানা প্রদেশ ছাড়া মধ্য এসিয়াতে কুচার নামক স্থানে কাতন্ত্র ব্যাকরণেরই অধ্যয়ন প্রচলিত ছিল। এই কুচারেই বিখ্যাত পণ্ডিত কুমারজীবের জন্মস্থান। বহু সংস্কৃত গ্রন্থ কুমারজীব চীনভাষায় রূপান্তরিত করেন। তাঁহার রচিত চীনভাষাও অপূর্ব বস্তু। কুচাতে যাত্রার ধরণে লেখা ভারতীয় নাটকের খুব সমাদর ছিল। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কুচার সকল বিদ্যা ও গ্রন্থ একেবারে ঝড়ঝঞ্ঝায় বালুকারাশিতে চাপা পড়িয়া যায়।[৭]

মধ্য এসিয়ার পথেই কুমারজীব প্রভৃতি চীনদেশে যান। সেই সঙ্গে একদিন কাতন্ত্র ব্যাকরণ চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশেও প্রভূত সমাদর লাভ করিয়াছে।

কাতন্ত্র রীতিমত প্রাচীন ব্যাকরণ। তাহার বৃত্তিকার দুর্গসিংহও ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের, পরবর্তী কালের নহেন। তিনি যখন কাতন্ত্রের বৃত্তি লেখেন তখনই মূল সূত্রাদির মধ্যে অনেক বিভিন্নতা আসিয়া পড়িয়াছে। কাজেই কাশ্মীরে কাতন্ত্রের যে রূপ তাহার সহিত দুর্গসিংহ বৃত্তির মিল নাই। ইহাতে মনে হয় দুর্গসিংহের পূর্বেও কাতন্ত্রের অনেক টীকাকার জন্মিয়াছিলেন। বেলবলকর মনে করেন কাতন্ত্রকার খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক।[৮]

বাংলাদেশে কাতন্ত্র ব্যাকরণ সাধারণতঃ কলাপ নামে পরিচিত। ইহার কৃৎপ্রকরণটি কাত্যায়ন বররুচি বা শাকটায়নের লেখা। দুর্গসিংহের মতে ইহা কাত্যায়ন রচিত। শ্রীকণ্ঠচরিতকার মঙ্খ ও পদপ্রকরণ সঙ্গতিকার যোগরাজ বলেন ইহা শাকটায়ন কৃত। কলাপতত্ত্বার্ণবকার রঘুনন্দন দুর্গসিংহ বৃত্তি টীকায় বলেন ইহা বররুচি লিখিত। কাত্যায়নের পালি ব্যাকরণটি একেবারে কাতন্ত্র রীতিতে রচিত।

কাতন্ত্রে পাণিনির প্রত্যাহার প্রভৃতি কৃত্রিম ও কঠিন বর্ণসমাবেশ প্রথা অনুসৃত হয় নাই। পাণিনির প্রণালী সংক্ষিপ্ত হইলেও সহজ নহে। তাই সকলের পক্ষে সুগম করিবার জন্য প্রাতিশাখ্যাদিতে যে পুরাতন সহজ প্রথা আছে তাহাই কাতন্ত্রে অনুসরণ করা হইয়াছে। তাই তিনি স্বর ব্যঞ্জন সমান প্রভৃতি সহজ সংজ্ঞাগুলি রাখিয়াছেন। ইহাতে পাণিনীয় সূত্র সংজ্ঞা প্রভৃতির

ঝঞ্ঝাট বাঁচিয়া গিয়াছে। তাই পাণিনির ৪০০০ সূত্র স্থলে তিনি সাড়ে আটশত সূত্রে সারিতে পারিয়াছেন।

কথা সরিৎসাগরের মতে পাণিনির পূর্বে ইন্দ্র বা ইন্দ্রগোমীর ইন্দ্র ব্যাকরণ চলিত ছিল। হুয়েনসাঙ্গও তাহাই বলেন। লামা তারানাথও ইহা স্বীকার করেন এবং তিনি বলেন চান্দ্র ব্যাকরণ পাণিনির অনুবর্তী, কলাপ ঐন্দ্রের অনুবর্তী।

বেলবলকর বলেন তৈত্তিরীয় সংহিতায়[১] ইন্দ্রকে প্রথম বৈয়াকরণ বলা হইয়াছে। কিন্তু আমি তাঁহার উদ্ধৃত বাক্য তৈত্তিরীয় সংহিতায় উল্লিখিত স্থানে খুঁজিয়া পাইলাম না। তৈত্তিরীয় সপ্তম কাণ্ডে, ৪র্থ প্রপাঠকে, সপ্তম অনুবাকে—মন্ত্র হইল বসিষ্ঠো হৃতপুত্রঃ ইত্যাদি। ব্যাকরণকার ঐন্দ্রের কোনো কথা সেখানে নাই। তাহা লেখা আছে তৈত্তিরীয় সংহিতার ৬ষ্ঠ কাণ্ডের ৪র্থ প্রপাঠকে, সপ্তম আরণ্যকের তৃতীয় চতুর্থ অনুবাকে। সেখানে আছে, "তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য ব্যাকরোৎ।"

দুর্গসিংহের ধাতুপাঠ চন্দ্রগোমীর ব্যাকরণকে আশ্রয় করিয়া লিখিত। আসল কলাপ ধাতুশাস্ত্র এখন দুষ্প্রাপ্য, তাহার তিব্বতী অনুবাদমাত্র এখন আছে।*

তিব্বতীয় অনুবাদ বিষয়ে আরও কিছু খবর বারনেল সাহেব তাঁহার পুস্তকে অন্দ্র স্কুল অব স্যাংস্কৃত গ্রামারিয়ানস ৫৯ পৃষ্ঠায় দিয়াছেন।

তোল কাপ্পিয়ম্ অতি প্রাচীন তামিল ব্যাকরণ। ঐন্দ্রের পদ্ধতির সঙ্গে তোল কাপ্পিয়মের পদ্ধতির মিল আছে। ঐন্দ্র পদ্ধতিই তাহাতে অনুসৃত। কাতন্ত্র, কচ্চায়ন ও প্রাতিশাখ্যের সঙ্গেও তোল কাপ্পিয়মের মিল দেখা যায়। এই সব কথা তামিল পণ্ডিতদের সুবিদিত।

বারনেল তাঁহার পুস্তকের দশম পৃষ্ঠায়—তোল কাপ্পিয়ম্, কাতন্ত্র ও কচ্চায়ন—তিনটি ব্যাকরণের বিষয় পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিয়া এই ঐক্যটি আরও ভাল করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।

কর্ণাটে ভাবসেনের দুর্গসিংহানুসারিণী লঘুবৃত্তি অতিশয় সমাদৃত।

এই লঘুবৃত্তির প্রারম্ভে নমস্কার শ্লোক হইল

সর্বজ্ঞং সর্ববাগীশং ভুক্তিমুক্তি প্রদায়কম্।
নত্বা কাতন্ত্রশাস্ত্রাণাং লঘুবৃত্তির্বিধাস্যতে॥ ইত্যাদি

শ্রীমদ্‌ভাবসেন ত্রৈবিদ্যদেব বিরচিত রূপমালা প্রক্রিয়া সহিত কাতন্ত্র ব্যাকরণের আদ্য নমস্কার শ্লোক এইরূপ :

বীরং প্রণম্য সর্বজ্ঞং বিনষ্টাশেষ দোষকম্।
কাতন্ত্র রূপমালেয়ং বালবোধায় কথ্যতে ॥ ইত্যাদি

গ্রন্থের আরম্ভে নাম লেখা—শ্রীমচ্ছর্ব-বর্মাচার্য প্রণীতং কাতন্ত্র ব্যাকরণম্, শ্রীমদ্-ভাবসেন ত্রৈবিদ্যদেব বিরচিত রূপমালা প্রক্রিয়া সহিতম্ ॥

পূর্ববাংলায় ব্যাকরণ বলিতে কলাপ ব্যাকরণই বুঝায়। বাংলাদেশে শর্ববর্মাচার্যের কাতন্ত্রের সঙ্গে দুর্গসিংহকৃতবৃত্তি, ত্রিলোচন-কৃত-পঞ্জী, সুষেণকৃত কবিরাজ টিপ্পনী, গোপীনাথকৃত পরিশিষ্টই পড়া হয়। ছাত্রদের সুবিধার জন্য পূর্বে গুরুনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের সম্পাদিত একটি কলাপ ব্যাকরণ ছিল, তাহাতে এই সবই আছে। এখন সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ও একখানি ভাল কলাপ ব্যাকরণ সম্পাদন করিয়াছেন।

পূর্ববাংলার ব্যাকরণের অধ্যাপকগণ এই কলাপ ব্যাকরণের সকল টীকা টিপ্পনী পড়াইয়া সমস্ত তাঁহাদের নখদর্পণে রাখিয়াছেন। ত্রিপুরা জেলার মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকিশোর ন্যায়রত্ন মহাশয় একাদিক্রমে ৬৭ বৎসর কলাপের অধ্যাপনা করিয়া ব্যাকরণসম্রাট আখ্যা পাইয়াছিলেন। কলাপ দিয়াই তিনি মহামহোপাধ্যায়।

পূর্বে বলা হইয়াছে কলাপের সূত্র সংখ্যা সাড়ে আটশত। ইহা কৃৎ বাদ দিয়া। কৃৎ ধরিলে প্রায় ১৪০০ সূত্র হয়।

পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে জৈনদের মধ্যে যে কাতন্ত্র ব্যাকরণ সাধারণতঃ পঠিত হয় তাহা শ্রীভাবসেন ত্রৈবিদ্যদেব বিরচিত রূপমালা প্রক্রিয়া সহিত। তিনি তাঁহার প্রথমা বৃত্তিতে তদ্ধিত পর্যন্ত ৫৭৪টি সূত্র দিয়াছেন। তিঙন্ত কৃদন্ত তাঁহার উত্তর বৃত্তি—তাহাতে ৮০৯টি সূত্র। মোট ১৩৮৩টি সূত্র এই ব্যাকরণে দেখা যায়।

ইন্দোরে পীপসী বাজারে জৈনবন্ধু যন্ত্রালয়ে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযশোদেব চারিত্রসিংহ রাজশেখর কৃত শ্রীকাতন্ত্র (সারস্বত) বিভ্রমসূত্র সবৃত্তিক মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাও জৈনদের মধ্যে সমাদৃত।

কাশ্মীর-সূত্রপাঠ, ভাবসেনের রূপমালা ও বাংলায় চতুষ্টয় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাজান। ভাবসেন তাঁহার রূপমালায় লেখেন :

সন্ধির্নাম সমাসশ্চ তদ্ধিতশ্চেতি নামতঃ।
চতুষ্কমিতি তত্রোক্তমিত্যে তচ্ছর্ববর্মণা ॥

তদ্ধিতান্ত শ্লোক

বাংলায় কিন্তু নাম, কারক, সমাস, তদ্ধিত এইভাবে সাজাইয়া চতুষ্টয় বৃত্তি।

কাতন্ত্রের মধ্যে শর্ববর্মাচার্যের রচনার পরেও অনেক কিছু জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন। তাহার মধ্যে কাশ্মীরের সূত্রপাঠে নিপাতপাদ, নামপ্রকরণে স্ত্রীপ্রত্যয়পাদ, কৃৎপ্রকরণে উণাদিপাদ পরে প্রয়োজনবোধে যুক্ত করা হইয়াছে। দুর্গসিংহের বৃত্তিতে এগুলি নাই, অথচ কাশ্মীরের সূত্রপাঠে এগুলিকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

কাশ্মীরের সূত্রপাঠের নামপ্রকরণের অন্তর্গত তদ্ধিতপাদের সম্বন্ধেও পণ্ডিতদের এইরূপ মত। তাঁহারা বলেন ইহা পরে যুক্ত। ইহাতে অনেক পরিমাণে সূত্রগুলি ছন্দোবদ্ধ।

বাংলাদেশের বিখ্যাত পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ও কাতন্ত্র ব্যাকরণের বৈদিক প্রকরণের অভাব দূর করিবার জন্য তাঁহার বিখ্যাত কাতন্ত্র ছন্দঃপ্রক্রিয়া লেখেন।

বিষয়টিকে সুগম করিবার জন্য কাতন্ত্রে প্রথমে বিস্তর জিনিষ বাদ দেওয়া হইয়াছিল। কারণ ইহা সর্বসাধারণের জন্য লেখা সহজ ব্যাকরণ শাস্ত্র। কিন্তু পরে ইহার এই অসম্পূর্ণতা দূর করিবার জন্য যুগে যুগে দেশে দেশে পণ্ডিতের দল নানা অংশ ইহাতে যুক্ত করিয়াছেন। তাহা ছাড়া বৃত্তি টীকা প্রভৃতির তো কথাই নাই।

দুর্গ বা দুর্গাত্মকৃত লিঙ্গানুশাসন আর্যা ছন্দে লিখিত। উনাদিপাঠ ও ধাতুপাঠ বিখ্যাত কাতন্ত্র বৃত্তিকার দুর্গসিংহ বিরচিত। কাতন্ত্র মতের একটি ঢুংটিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু রচয়িতার নাম জানা যায় নাই। দুর্গাচার্য নিরুক্তর উপর একটি টীকা লিখিয়াছিলেন।

দুর্গসিংহের বৃত্তিই কাতন্ত্র ব্যাকরণকে পূর্ণতা দান করিয়াছে। অথচ কাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যটুকু তাহাতে কোথাও খর্ব হয় নাই। জৈনাচার্য হেমচন্দ্র দুর্গসিংহ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। উনাদি-সূত্রে প্রারম্ভে দুর্গসিংহ শিবনমস্কার করিয়াছেন :

নমস্কৃত্যা শিবংভূরিশব্দ সন্তানকারিণম্।
উনাদয়ো বিধাস্তন্তে বালব্যুৎপত্তি হেতবে ॥

দুর্গসিংহবৃত্তির টীকাকার আর এক দুর্গ তাঁহার নমস্কার জানাইয়াছেন:

শিবমেকমেজং বুদ্ধং অগ্রাহ্যংচ স্বয়ম্ভুবম্।
কাতন্ত্র বৃত্তিটীকেয়ং নত্বা দুর্গেণ লিখ্যতে॥

কাতন্ত্র মতানুবর্তীদের মধ্যে দুর্গ নামের আর শেষ নাই।

পরবর্তী টীকাকারেরা অধিকাংশই দুর্গসিংহকৃত বিখ্যাত বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়াই লিখিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রথমেই নাম করা উচিত গুজরাতপতি কর্ণদেবের সভাপণ্ডিত বর্ধমানাচার্যের কাতন্ত্রবিস্তার। শিলাশাসনাদির দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে কর্ণদেব ১০৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য করিতেছিলেন।

ইহার পরেই কাতন্ত্রবৃত্তি পঞ্জিকাকার ত্রিলোচনদাসের নাম করা যাইতে পারে। শ্রীপতিকৃত কাতন্ত্রবৃত্তির পরিশিষ্ট যিনি রচনা করিয়াছেন সেই কাতন্ত্রোত্তর পরিশিষ্টকার ত্রিলোচন ভিন্ন ব্যক্তি। কাতন্ত্রবৃত্তি পঞ্জিকাকার ত্রিলোচনদাস জাতিতে কায়স্থ, তাঁহার পিতার নাম গদাধর। দুর্গসিংহের বৃত্তি ও ত্রিলোচনদাসকৃত কাতন্ত্রবৃত্তি পঞ্জিকা বাংলার সর্বত্র সমাদৃত। জৈনাচার্য জিনপ্রবোধ বা জিনপ্রভসূরীও ইহার টীকা লিখিয়াছেন। কুশল, রামচন্দ্র প্রভৃতি অনেক টীকাকার উত্তরকালে ইহার উপর টীকা লিখিয়াছেন।

কাব্যকামধেনু রচয়িতা বোপদেব আচার্য বর্ধমানের কাতন্ত্রবিস্তার হইতে বহুবার উদ্ধৃত করিয়াছেন। ত্রিলোচন দাসের পঞ্জিকা হইতেও বোপদেব উদ্ধৃত করিয়াছেন। সারস্বত টীকাকার বিট্ঠলও ত্রিলোচন দাস হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কাজেই বুঝা যায় ত্রিলোচন দাস বর্ধমানের প্রায় সমসাময়িক।

শব্দসিদ্ধির টীকাকার মহাদেব নিজেই তাঁহার সময় (১৩৪০ সম্বৎ) ১২৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জানাইয়া গিয়াছেন।

ইহা ছাড়া আর ঠিক ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী কোনো টীকা বড় একটা এখন মেলে না।

বাংলায় সমাদৃত কবিরাজ টিপ্পনী রচয়িতা সুষেণ কবিরাজ ত্রিলোচন দাসের পরবর্তী, হরিরাম তাঁহারও পরে। ব্যাখ্যাসার প্রণেতা রামদাস কুলচন্দ্র হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। গোপীনাথ তর্কাচার্যের পরিশিষ্ট প্রবোধের টীকা লিখিয়াছেন রামচন্দ্র, তিনি কাতন্ত্র বৃত্তি পঞ্জিকার টীকাও লিখিয়াছেন। শ্রীপতির কাতন্ত্র বৃত্তির উপরে গোপীনাথ তর্কাচার্য, রামচন্দ্র চক্রবর্তী, শিবরাম চক্রবর্তী ও পুণ্ডরীকাক্ষ টীকা রচনা করিয়াছেন। শ্রীপতির উত্তর পরিশিষ্টকার ত্রিলোচনের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

বাংলাদেশে কাতন্ত্রের টীকার অন্ত নাই এবং টীকাকারগণ অনেকেই বৈদ্য। যে সব টীকা টিপ্পনী পড়ান হয় তাহার নাম করা সত্ত্বেও বারনেল সাহেব যে তালিকা দিয়াছেন পুনরুক্তি ঘটিলেও এখানে তাহার উল্লেখ করিব।

দুর্গসিংহকৃত কাতন্ত্র বৃত্তি। ইহারও একাধিক বৃত্তি আছে। তাঁহার বৃত্তির উপর নিজেরই রচিত টীকা আছে, তাহা ছাড়া তাঁহার চন্দ্রিকাও আছে। দুর্গসিংহের উপর চঙ্গ দাসের ব্যাখ্যাবৃত্তি আছে।

ত্রিলোচন দাসের কাতন্ত্র বৃত্তি পঞ্জিকা।

সুষেণাচার্যকৃত তাহার টিপ্পনী। কবিরাজ নামে প্রসিদ্ধ।

জৈনাচার্য ভাবসেনকৃত লঘুবৃত্তি।

শ্রীপতিকৃত কাতন্ত্র বৃত্তি ও কাতন্ত্র পরিশিষ্ট।

গোপীনাথকৃত পরিশিষ্ট প্রবোধ।

শিবরাম চক্রবর্তীর পরিশিষ্ট সিদ্ধান্ত রত্নাকর।

বর্ধমানকৃত কাতন্ত্র বিস্তার।

রঘুনন্দনকৃত কলাপতত্ত্বার্ণব।

বররুচিকৃত চৈত্রকুটি।

হরিরাম চক্রবর্তীকৃত ব্যাখ্যাসার।

রামদাসকৃত ব্যাখ্যাসার।

নিম্নলিখিত নাম কয়টি তিনি কোলব্রুকের গ্রন্থ হইতে লইয়াছেন।

রামনাথকৃত কাতন্ত্র বৃত্তি প্রবোধ।

উমাপতি

কুলচন্দ্র

মুরারি

দুর্গগুপ্ত

কাতন্ত্র গণ ধাতু ও তাহার উপর রামনাথকৃত মনোরমা

কাতন্ত্র ধাতু কোষ।

রহসনন্দিকৃত কাতন্ত্র ষট্‌কারক।

শিবদাসকৃত উণাদিবৃত্তি।

কাতন্ত্র চতুষ্টয় প্রদীপ।

কাতন্ত্র শব্দমালা।

রামশর্মকৃত উণাদিকোষ।

কারক কৌমুদী।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে আমি কাশ্মীর ও তাহার নিকটবর্তী হিমালয় প্রদেশে কাতন্ত্রের বহু প্রচলন দেখি। কাশ্মীরে প্রচলিত কাতন্ত্র সূত্রপাঠে বিষয়সন্নিবেশপ্রণালী দুর্গসিংহের প্রণালী হইতে একেবারে ভিন্নরূপ। কাশ্মীরেরও বাংলাদেশের মত কাতন্ত্রের টীকার অন্ত নাই।

হিমালয় গাড়ুয়াল প্রভৃতি প্রদেশে কাতন্ত্রের বাংলা টীকারও কোথাও কোথাও আদর ছিল। চম্বার অন্তর্গত ব্রহ্মপুর গ্রামীয় বৃদ্ধ প্রভাকর বোড় (১৯০৭) মহাশয় কাতন্ত্রের বাংলা টীকার বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। কাশ্মীরের সন্নিহিত পশ্চিম তিব্বতের বৌদ্ধমঠে লামাদের মধ্যে কোথাও কোথাও কাতন্ত্র প্রকরণের সমাদর আছে।[১০]

কাতন্ত্র ব্যাকরণটি সাধারণের জন্য লিখিত বলিয়া দেখিতে দেখিতে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। সিংহলে ইহার বিলক্ষণ প্রসার ছিল, গুজরাতে ইহার টীকা কাতন্ত্রবিস্তার রচিত হইয়াছে, হেমচন্দ্র ইহা ব্যবহার করিয়াছেন, বাংলায় ইহা আজও একখানি মুখ্য ব্যাকরণ। কাশ্মীরে ইহার আদরের অবধি নাই।

কাশ্মীরে প্রথমে দুর্গসিংহ বৃত্তি ছাড়াই কাতন্ত্র প্রচলিত হইয়াছিল। সে দেশে দুর্গসিংহ বৃত্তি আসে বহু পরে। তাই সেখানে পণ্ডিতেরা দুর্গসিংহের বৃত্তির সঙ্গে পরিচিত হইবার পূর্বে নিজেরাই কাতন্ত্রের বহু টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহাদের ক্রম ও বিন্যাস ভিন্ন রকমের।

বূলারের মতে কাশ্মীরে দ্বাদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত চারিশত বৎসর কাতন্ত্রেরই রাজত্ব ছিল। সেখানকার বহু পুঁথিই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবু জগদ্ধরের বালবোধিনী, তাহার উপর উগ্রভূতির ন্যাস, ছিছু ভট্টের লঘুবৃত্তি প্রভৃতি প্রধান। ছোট বড় নানা বৃত্তি টীকা এবং কাশ্মীরের পরবর্তীকালের সব ব্যাকরণই কাতন্ত্রানুযায়ী।

বাংলাদেশে ইহা ছাড়াও পীতাম্বরী বিদ্যাসাগরী প্রভৃতি অসংখ্য টীকা রহিয়াছে। পূর্ববাংলায় কাতন্ত্রের একচ্ছত্র রাজত্ব। ইহার এত বৈদ্য টীকাকার দেখিয়া মনে হইতে পারে দক্ষিণের এই ব্যাকরণটি সেন রাজাদের সঙ্গে আসিয়াছিল। কিন্তু একমাত্র এই হেতু হইলে দক্ষিণের আরও বহু শাস্ত্র বাংলায় এইরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইত। জিনমতের দ্বারা অনুপ্রাণিত এই সরল ব্যাকরণটি বাংলায় সর্বজনচিত্ত জয় করিয়া লইয়াছিল ইহা কি অস্বীকার করা যায়?

প্রমাণ-পঞ্জী

১ অন অন্দ্র স্কুল অব স্যাংস্কৃট গ্রামারিয়ানস, পৃ ১০৩

২ অন অন্দ্র স্কুল অব স্যাংস্কৃট গ্রামারিয়ানস, পৃ ১০৩-১০৪

৩ সিংঘী জৈনগ্রন্থমালা; হেমচন্দ্র চরিত, পৃ ১৭

৪ সাতবাহন প্রবন্ধ— ৮৯, পৃ ৭২

৫ শ্লোক ১৩৯, পৃ ৬১

৬ সিংঘী জৈনগ্রন্থমালার হেমচন্দ্রাচার্য চরিত (নং ১১), পৃ ১৬

৭ সেন্ট্রাল এসিয়ান স্টাডিস, সিলভাঁ লেভী টি আর এস ১৯১৪, পৃ ৯৬০

মধ্য এসিয়ার খোটানে জর্মান পুঁথি সংগ্রহকারীরা কাতন্ত্র ব্যাকরণের কতকটা খণ্ডিত অংশ পাইয়া বার্লিনের মুজিয়ামে তাহা রক্ষা করিয়াছেন। পুঁথিখানির লিপি বাংলা অক্ষরের সঙ্গে মেলে।

—বিশ্বজ্ঞানী এপ্রিল ১৯৪২, পৃ ৪৬৪

৭ক তৈত্তিরীয় সংহিতা, সপ্তম খণ্ড, ৪, ৭

৮ বেলবেলকর, পৃ ৯০

৯ বেলবেলকর, পৃ ৮৯

১০ বেলবেলকর, পৃ ৮৯

বাংলায় বেদচর্চা

জৈনধর্মের পরই বাংলাদেশে বৌদ্ধমত প্রাদুর্ভূত হয়। বাংলাদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম ও সাধনা পূর্ব এসিয়ার নানা ভাগে ও চীন প্রভৃতি দেশে ছড়ায়। বৈদিক ধর্মও তখন বাংলাদেশে ক্রমে শক্তিলাভ করিতেছিল এবং বাংলাদেশে বড় বড় সব বৈদিক আচার্য ও পণ্ডিতের উদ্ভব হয়। বৈদিক ধর্মের কথা বলিবার পূর্বেই বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের নাম করা উচিত। তবু সুবিধার জন্য আমরা বাংলাদেশের বৈদিক ধর্মের বিষয় আলোচনা করিয়া পরে বাংলার বৌদ্ধ ও যোগী প্রভৃতি মতের কথা বলিব। যদিও পালবংশীয় বৌদ্ধরাজাদের পরে সেনরাজারা আসিয়া বৈদিক ধর্মকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন তবু বাংলায় প্রাকৃত জনগণের মধ্যে, ও পরবর্তী বহু সম্প্রদায়ে ভক্তিমূলক মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রভাবই বেশি রহিয়া গেল। কাজেই বাংলার সঙ্গে বাহিরের ধর্মগত যোগের কথা বলিতে গেলে নানাভাবে বৌদ্ধ মতামতের কথাই চলিতে থাকিবে বলিয়া আমরা বাংলায় বৈদিক ধর্ম ও বেদচর্চার কথা আগে সারিয়া লইতে চাই।

আমাদের দেশে এইরূপ কথা প্রচলিত আছে যে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রাজা আদিশূর বাংলাদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব দেখিয়া বাহির হইতে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। পাশ্চাত্ত্য বৈদিকেরা বলেন, তাঁহাদের পূর্বপুরুষ গৌড়াধিপ শ্যামল বর্মার আনীত। যশোধর মিত্র প্রভৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে শ্যামল বর্মার অনুরোধে কান্যকুব্জ হইতে বাংলাদেশে আসেন। বর্মবংশীয় রাজারা চিরদিনই বেদসম্মত ধর্মের অনুরাগী।

দ্বাদশ শতাব্দীতে পুরুষোত্তম পাণিনীয় ভাষাবৃত্তি রচনা করেন। তিনি বাঙ্গালী। তাঁহার এই গ্রন্থে বৈদিক অংশ গৃহীত হয় নাই। টীকাকার সৃষ্টিধরের মতে লক্ষ্মণ সেনই নাকি তাঁহাকে এইরূপ আদেশ দেন। ইহাতে বুঝা যায় না যে তখন বাংলায় বেদচর্চা ছিল না। পুরুষোত্তম ছিলেন বৌদ্ধ। কাজেই বৌদ্ধ পণ্ডিতকে বৈদিক অংশ আলোচনা করিতে নিষেধ করা স্বাভাবিকই হইয়াছে। পাণিনীয় মতের ব্যাখ্যাকার বাংলা দেশে বিরল নহে। কেহ কেহ বলেন ভোগবৃত্তিকার বাঙ্গালী। গৌড়রাজ নরসিংহের সময়ে ফণীশ্বর মহাভাষ্যকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এই কথা পরে স্থানান্তরে আলোচিত হইয়াছে।[১]

অন্যান্য শাস্ত্রের পুঁথি অপেক্ষা বেদের পুঁথি মেলে কম, তার কারণ বেদ লেখা নিষিদ্ধ ছিল। পুঁথিকে আশ্রয় করিয়া বেদ প্রচলিত ছিল না, তার আশ্রয় ছিল গুরুশিষ্য পরম্পরা। তবু যে বেদের পুঁথি পাওয়া যায় তাহাই আশ্চর্যের কথা।

এখনও দক্ষিণ ভারতে দুই রকম বেদপণ্ডিত দেখা যায়। একরকম যাঁহারা অর্থাদির দ্বারা বেদমন্ত্রগুলির মর্ম বুঝেন, আর একরকম যাঁহারা অর্থ না বুঝিয়াই যথাযথভাবে বেদগান করিতে পারেন তাঁহারা বৈদিক। যাঁহারা উভয়দিকে পটু তাঁহারাই আচার্য। পূর্বকালে বোধ হয় বাংলায় মাঝে মাঝে বেদগানের লোকের অভাব হইত। যেমন কাশী হইতে প্রকাশিত ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বের সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখা যায়,—"কলিতে আয়ু প্রজ্ঞা উৎসাহ ও শ্রদ্ধার অভাবে উৎকলাদি দেশবাসিগণ ও পাশ্চাত্ত্যাদিগণ বেদের অধ্যয়ন মাত্র করেন। রাঢ়ীয় বারেন্দ্রগণ অধ্যয়ন বিনা……যজ্ঞের ইতি কর্তব্যতা বিচার করেন।"

"কলৌ আয়ুঃ প্রজ্ঞোৎসাহশ্রদ্ধাদীনামল্পত্বাৎ উৎকলপাশ্চাত্ত্যাদিভির্বেদাধ্যয়নমাত্রং ক্রিয়তে। রাঢ়ীয় বারেন্দ্রৈস্ত্বধ্যয়নং বিনা……যজ্ঞেতি কর্তব্যতা বিচারঃ ক্রিয়তে।"

মহিদাসের চরণব্যূহপরিশিষ্ট ভাষ্যে উদ্ধৃত শ্লোকে দেখা যায়, "অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ, কানীন ও গুর্জরে বাজসনেয়ী মাধ্যন্দিন শাখা প্রতিষ্ঠিত ছিল।"

অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গশ্চ কানীনো গুর্জরস্তথা।
বাজসনেয়ী শাখা চ মাধ্যন্দিনী প্রতিষ্ঠিতা॥

চৌখাম্বা সংস্করণ, ৩২ পৃ

এশিয়াটিক সোসাইটি, নারায়ণ রচিত ছন্দোগপরিশিষ্ট প্রকাশ নামে এক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে দেখা যায় নারায়ণ ছিলেন বেদের প্রগাঢ় পণ্ডিত। ইঁহার পিতৃপিতামহগণও ছিলেন বেদবিৎ। তিনি রাঢ়দেশবাসী ছিলেন।

চরিতমহতি যেষামন্বয়ে সোম পীথী
সমজনি পরিতোষশ্ছন্দসাং দেহ বন্ধঃ।
অলভত স হি বিপ্রাচ্ছাসমং তাল বাটীং
তদিহ ভজতি পূজামুত্তয়া যেন রাঢ়া॥

ছন্দোগপরিশিষ্ট প্রকাশ, শ্লোক, ৩

বরেন্দ্রেও বেদবিদ্যার বিলক্ষণ প্রচার ছিল। নেপালে প্রাপ্ত চতুর্ভুজ রচিত

হরিচরিত কাব্যের পুষ্পিকায় দেখা যায় চতুর্ভুজের পূর্বপুরুষ স্বর্ণরেখ ধর্মপালের নিকট করঞ্জ নামে গ্রাম দানরূপে পাইয়াছিলেন। সেখানে শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে নিপুণ ব্রাহ্মণদের বসতি ছিল।

গ্রামোত্তমোদ্দ্যমল মঞ্জুগুণৈক পুঞ্জঃ
শ্রীমান্ করঞ্জ ইতি বঙ্গ্যতমো বরেন্দ্রাম্।
যত্র শ্রুতিস্মৃতি পুরাণপদ প্রবীণাঃ
সচ্ছাস্ত্রকাব্য নিপুণাঃ স্ম বসন্তি বিপ্রাঃ॥

অদ্ভুতসাগরে দেখি বল্লালসেন ছিলেন বেদায়নৈক পথিক। লক্ষ্মণসেন যে ছিলেন বেদায়নৈকাধ্বগ তাহা বহু তাম্রশাসনে দেখা যায়। বল্লালগুরু অনিরুদ্ধ ছিলেন বরেন্দ্র দেশে শ্রেষ্ঠ বেদার্থ ব্যাখ্যাকর।

বেদার্থ-স্মৃতি সংকথদিপুরুষঃ শ্লাঘ্যো বরেন্দ্রীতলে
নিস্তন্দ্রোজ্জলধী বিলাস নণ্ডনঃ সারস্বত ব্রহ্মণি।
ষটকর্মাভুভবদার্য্যশীল নিলয়ঃ প্রখ্যাত সত্যব্রতো
বৃত্রারেবির গীষ্পতির্নরপতে যস্যানিরুদ্ধো গুরুঃ॥

পানসাগর, ৬ শ্লোক

হলায়ুধ ভট্টের ব্রাহ্মণ সর্বস্ব গ্রন্থে যজুর্বেদীয় বহু ব্যাখ্যা পাই, তিনি ছিলেন লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধ্যক্ষ।

দিনাজপুরের বদালগরুড়স্তম্ভ লিপিতে যে গুরব মিশ্রের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার কথা এখন বহুজনবিদিত। "তিনি বেদান্তেরও দুরধিগম্য ব্রহ্মতত্ত্বের বেত্তা ছিলেন, তিনি সকল বেদ বেদাঙ্গের অধীতী ছিলেন; মহাদক্ষিণাযুক্ত বহু যজ্ঞের তিনি প্রণেতা ছিলেন···।"

বেদান্তৈরপ্য সুগমতমং বেদিতা ব্রহ্মতত্ত্বং
যঃ সর্বাসু শ্রুতিষু পরমঃ সার্দ্ধমঙ্গৈরধীতী।
যো যজ্ঞানাং সমুদিত মহা দক্ষিণানাং প্রণেতা
ভট্ট শ্রীমানিব স গুরবো দূতক পুণ্যকীর্ত্তিঃ॥

গৌড়লেখমালায় পৃ ৬২; নারায়ণ পালদেবের তাম্রশাসন, পঙক্তি ৫২, ৫৩

এই গুরবমিশ্র ছিলেন নারায়ণ পালদেবের মন্ত্রী। ইঁহার পিতা কেদার মিশ্র ও প্রপিতামহ দর্ভপাণিও পালরাজাদের মন্ত্রী ছিলেন।

বাংলার প্রখ্যাত বেদভাষ্যকার ভট্ট গুণবিষ্ণু ছিলেন মহারাজ বল্লাল ও লক্ষ্মণের সভাসদ। ইঁহার পিতার নাম দামুক ভট্ট। তাঁহার রচিত সামবেদের ছান্দোগ্য-মন্ত্রভাষ্য প্রাচীনকালে বহু সমাদর পাইয়াছে। তিনি পারস্কর গৃহ্যভাষ্যও রচনা করিয়াছিলেন। সায়নও অনেকস্থলে হুবহু গুণবিষ্ণুর ভাষ্য গ্রহণ করিয়াছেন, যদিও এই কথা শ্রীযুত বেঙ্কট সুবায্যা স্বীকার করিতে চাহেন না।[২]

লক্ষ্মণ সেনের ধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ তাঁহার ব্রাহ্মণ সর্বস্ব তিনশতের অধিক যজুর্বেদীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কাম্বশাথি-বাজসনেয়গণের গৃহ্য কর্মের জন্য তাহা রচিত।

বরোদায় প্রাচ্য বিদ্যামন্দির গ্রন্থালয়ে নোয়াখালি জেলায় প্রাপ্ত চতুর্দশশক-শতাব্দীতে লিখিত জেজ্জটপুত্র উবটের রচিত মন্ত্রভাষ্য নামে একখানা পুঁথি আছে। ভো জে পৃথ্বিং প্রশাসতি তাহা রচিত হইয়াছিল।[৩]

রামনাথ সিদ্ধান্ত বাচস্পতি একজন পরবর্তী প্রখ্যাত বাঙ্গালী বেদব্যাখ্যাতা, তাঁহার গ্রন্থেই দেখা যায় তিনি ১৫৪৪ শাকবৎসরে ভবদেবী টীকা রচনা করেন।

জৈমিনির পূর্ব মীমাংসা হইল বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডপরায়ণ। তাহার দুই ধারা। কুমারিল—৯ম শতাব্দী—ছিলেন রক্ষণশীল, প্রভাকর বা গুরু হইলেন উদার মতের। শালিকনাথ প্রভাকরের বৃহতী এবং লক্ষ্মী টীকার উপর পঞ্চিকা লেখেন। এই পঞ্চিকাকার শালিকনাথ ছিলেন বাঙ্গালী, তাঁহাকে গৌড়মীমাংসক বলে।

> বৃহতীং তথৈব লক্ষ্মীং টীকা মধি কৃত্য শালিকনাথঃ।
> ঋজু বিমলাং দীপশিখাং বিশদার্যামকৃত পঞ্চিকাং ক্রমশঃ॥
>
> রামানুজ রচিত তন্ত্ররহস্য

রাজা মহীপাল দেবের বাণগড় লিপিতে বুঝা যায় তখন বাংলাদেশে বৈদিক মীমাংসা শাস্ত্রের বিলক্ষণ পসার ছিল। ন্যায়কুসুমাঞ্জলিকার উদয়ন ও তাঁহার টীকাকার বরদরাজের মতে মীমাংসক শালিকনাথ ছিলেন বাঙ্গালী। গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় ন্যায়কুসুমাঞ্জলিবোধিনী উপক্রমণিকায় তাহা দিয়াছেন। শালিকনাথ সপ্তম শতাব্দীর লোক। কাজেই বুঝা যায় তখন বাংলাদেশে মীমাংসা দর্শনের যথেষ্ট প্রচার ছিল।

ন্যায়কুসুমাঞ্জলিকার উদয়ন গৌড়মীমাংসকদের মত খণ্ডন করিতে গিয়া বলেন যে গৌড়দেশে অপৌরুষেয় বেদ এবং এবং পৌরুষেয় মন্বাদি শাস্ত্রের মধ্যে ভেদবোধ

নাই। তাই গৌড়মীমাংসকদের মত শ্রদ্ধার যোগ্য নয়। বরদরাজ ইহার টীকায় কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন "গৌড়মীমাংসকঃ পঞ্চিকাকারঃ। গৌড়ো হি বেদাধ্যয়না ভাবাদ্ অবেদত্বং ন জানাতীতি গৌড়মীমাংসকত্বেত্যুক্ত মিতি।"[৪]—অর্থাৎ গৌড়মীমাংসদ বলিতে বুঝা যায় প্রকরণ পঞ্চিকাকার শালিকনাথ। তিনি ছিলেন প্রভাকর মতের অনুবর্তী। পরমতখণ্ডনার্থ গৌড়কে বেদানভিজ্ঞ বলিলে তাহাতে কি আসে যায়। আগাগোড়া ইতিহাস দেখিতে হইবে। অন্ততপক্ষে ইহা দেখা যায় যে গোদাবরী তীরস্থ ধর্মপুরীর রামানুজাচার্য তাঁহার তন্ত্ররহস্য গ্রন্থের[৫] প্রারম্ভেই প্রভাকরের পরই শালিকনাথকে পূর্বাচার্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

দ্বাদশ শতাব্দীতে ভট্ট ভবদেব মীমাংসা দর্শনে কুমারিল ভট্টের একটি টীকা লেখেন, তাহার নাম তৌতাতিত মততিলক।

বাংলাদেশের বদনাম যে সেখানে রক্ষণশীল কুমারিলের মীমাংসাদর্শনের অপেক্ষা উদারমতের প্রভাকর বা গুরুর লিখিত মীমাংসাদর্শনেরই বেশি সমাদর। উইলসন কিন্তু বলেন কুমারিল নিজেই হয় মৈথিল নয়তো বাঙ্গালী ছিলেন।[৬] তবে বাংলাদেশ স্বভাবতই উদার প্রভাকর মতেরই সমাদর করিয়াছে।

কান্যকুব্জবাসী শঙ্খধর দ্বাদশ শতাব্দীতে নাটক মেলদ নামে একটি প্রহসন লেখেন। তাহাতে রাঢ়দেশীয় "বচন-রচনা"র কথা পাই।[৭] তাহাতেই দেখা যায় "রাঢ়ীয়ৈর্ অতিহর্ষ গদগদগলৈঃ প্রভাকরঃ শ্রূয়তে।" অর্থাৎ রাঢ়ীয়রা অতি আনন্দ-গদ্গদস্বরে প্রভাকরমত শুনিতেছেন। তবে কুমারিল মতেরও আলোচনা বাংলাতে যে ছিল তাহার প্রমাণ ভবদেবভট্টকৃত বিখ্যাতগ্রন্থ তৌতাতিত মততিলক।

মীমাংসাসর্বস্ব রচয়িতা হলায়ুধ ছিলেন লক্ষ্মণসেনের সভাসদ। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য যে অধিকরণ কৌমুদী লেখেন তাহাতে তিনি বেদব্যাখ্যায় আপন গভীর নিপুণতা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহার পর প্রত্যেক ধর্মশাস্ত্রকার ও নিবন্ধকার বেদ মীমাংসা সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। রঘুনন্দন হইতে আরম্ভ করিয়া পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ বা কালী শিরোমণি পর্যন্ত সকলেই এই পাণ্ডিত্য দেখাইয়া গিয়াছেন। তাই গোভিল গৃহ্যসূত্র প্রকাশ করিতে গিয়া মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার যে অপূর্ব বৈদিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন তাহা এই দেশের পরম্পরাগত। প্রসিদ্ধ সামবেদ ব্যাখ্যাতা

সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া পণ্ডিত স্বর্গীয় বহুবল্লভ শাস্ত্রী পর্যন্ত সবাই সেই পরম্পরার অধিকারী।

গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের সম্পাদিত সরস্বতী ভবন স্টাডিস ষষ্ঠ খণ্ডে যে মীমাংসাদর্শনের আচার্যদের নাম পাওয়া যায় তাহাতে প্রভাকর বা গুরুর কথা পাই তিনি বোধ হয় কাশ্মীরের লোক।[৮] তাঁহার অনুবর্তী শালিকনাথের নাম পাওয়া যায় উদয়নের ন্যায়কুসুমাঞ্জলি তৃতীয় স্তবক গ্রন্থে। কাজেই তিনি দশম শতাব্দীর পূর্ববর্তী। শালিকনাথের পঞ্চিকা ছাড়াও প্রভাকরের বৃহতী এবং লঘ্বী টীকার তিনি টীকা রচনা করেন। সেই টীকার নাম ঋজু বিমলা এবং দীপশিখা। মাধবের সর্বদর্শন কৌমুদী এবং রামানুজের তন্ত্ররহস্যে এই খবর পাওয়া যায়।[৯]

আর একজন বাঙ্গালী মীমাংসকের পরিচয়ও গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় দিয়াছেন। তাঁহার নাম রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য। তাঁহার রচিত গ্রন্থ মীমাংসারত্নে, প্রমাণ প্রমেয় এবং বিধির আলোচনা আছে। তিনি বোধ হয় ষোড়শ শতাব্দীর লোক।[১০]

ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী মধুসূদনের অদ্বৈত সিদ্ধির উপরে অদ্বৈতচন্দ্রিকা নামে এক টীকা লেখেন। ইনি নারায়ণ তীর্থ এবং পরমানন্দ সরস্বতীর শিষ্য, ইনি গৌড় ব্রহ্মানন্দ বলিয়াই খ্যাত। পরিমাণ অনুসারে তাঁহার চন্দ্রিকার দুইটি সংগ্রহ আছে—একটি গুরুচন্দ্রিকা অন্যটি লঘুচন্দ্রিকা। তাঁহার রচিত অদ্বৈতসিদ্ধান্ত বিদ্যোতন, বেদান্ত সূত্র মুক্তাবলী, সিদ্ধান্তবিন্দু টীকাও প্রসিদ্ধ। জৈমিনি সূত্রের উপর তাঁহার মীমাংসা চন্দ্রিকা লিখিত (পৃ ১৯৫)। অদ্বৈতসিদ্ধান্ত বিদ্যোতন গ্রন্থখানি কাশী গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ হইতে সম্পাদিত হইয়াছে।[১১]

কেহ কেহ মনে করেন রাজা রামমোহনই গৌড়দেশে উপনিষদের প্রথম পরিচয় করান। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। যদিও রামমোহনের আশেপাশের অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপনিষৎকে প্রামাণ্য বলিয়া মানিতে চাহেন নাই, তাহাতে কেবল তাঁহাদেরই ব্যক্তিগত মত বুঝা যায়। বাংলাতে প্রাচীন স্মার্তগণ, রঘুনন্দন প্রভৃতি অসাধারণ সব শাস্ত্র বিচারকগণ বারবার শ্রুতিপ্রমাণ ব্যবহার করিয়াছেন। বঙ্গীয় স্মার্ত ও বৈষ্ণব আচার্যগণ এবং তন্ত্রব্যাখ্যাতা আচার্যগণ পুনঃ পুনঃ উপনিষৎ হইতে সব প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।[১২] গৌড়ীয় বৈষ্ণব পণ্ডিত বলদেব বিদ্যাভূষণ রচিত দশোপনিষৎ ভাষ্যের কথা অন্যত্র বলা হইয়াছে। তাহার মধ্যে ঈশোপনিষৎ-খানি কিছুদিন পূর্বে সুন্দররূপে সম্পাদিত ও মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি রাজা

রামমোহনের পূর্ব শতাব্দীর মানুষ। তিনি এগারখানি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেন।

নানা গ্রন্থালয়ে বাংলা অক্ষরে লিখিত উপনিষদের পুঁথিও অনেক পাওয়া গিয়াছে।

প্রাচীনকালেও আমরা বহু তাম্র ও শিলা লেখে বঙ্গীয়গণের বেদবিদ্যার পরিচয় পাই। বহু বহু লেখ এখনও অনাবিষ্কৃত। যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার সবগুলিও আমার হাতের কাছে নাই। তবু দেখা যায় এই লেখগুলিতে দানপাত্রদের পরিচয় অতি সাবধানতার সহিত প্রদত্ত। কোথাও কোথাও দানপাত্রদের গোত্র প্রবর মাত্র উল্লিখিত, বেদাধ্যয়ন কথাই নাই (কেশব সেনের ও বিশ্বরূপ সেনের ইদিলপুর ও মদনপাড় তাম্রশাসন)। কোথাও বা দানপাত্রকে বেদের "একদেশাধ্যায়ী" মাত্র বলা হইয়াছে। কোথাও বেদ মাত্র উল্লিখিত, বেদাধ্যয়নের কথা নাই। বদাল স্তম্ভলিপিতে গুরব মিশ্রের পূর্বপুরুষদের কাহারও কাহারও বেদ বিদ্যার কথা উল্লিখিত, কাহারও কাহারও বেদ বিদ্যার কিছু উল্লেখই নাই।

বাংলাদেশে বেদচর্চার বিষয়টি শ্রীযুত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য মহাশয় হরপ্রসাদ সংবর্ধন লেখমালায় দ্বিতীয় খণ্ডে প্রাচীন বঙ্গে বেদচর্চা প্রবন্ধে ভাল করিয়া দেখাইয়াছেন। এই প্রবন্ধটির জন্য সকলেই তাঁহার কাছে চিরকৃতজ্ঞ রহিবে।

মোটের উপর দেখা যায় বাংলাদেশে কেবল তন্ত্র শাস্ত্র ও চৈতন্য মতেরই আলোচনা চলে নাই। বেদ উপনিষৎ ও বৈদিক ধর্মশাস্ত্রের আলোচনায় বাংলাদেশ যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মে যখন বাংলাদেশ প্লাবিত তখনও বেদের আলোচনা বাংলাদেশে থামে নাই। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে পুণ্ড্রভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষ গ্রামে রীতিমত যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইত। ফরিদপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন দেখিয়া বুঝা যায় বারকমণ্ডলে শুক্ল-যজুর্বেদের অর্থাৎ বাজসনেয়ি শাখার ব্রাহ্মণদের বেদচর্চা ও যাগযজ্ঞাদি চলিত। ত্রিপুরায় প্রাপ্ত তাম্রশাসন অনুসারে বুঝা যায় সেদেশে প্রদোষশর্মা প্রমুখ শতাধিক চতুর্বেদনিষ্ণাত ব্রাহ্মণের বাস ছিল। ভট্ট গুরব মিশ্রের পূর্বপুরুষগণ যে সর্ববেদে ব্যুৎপন্ন ছিলেন তাহার প্রমাণ পাই আমরা শিলালেখ দেখিয়া।

বাংলায় বেদব্যাখ্যাতা গুণবিষ্ণু আচার্য হলায়ুধ, বেদনিষ্ণাত দর্ভপাণির খ্যাতি বাংলাদেশ ছাড়াইয়া ভারতবর্ষের যে সকল দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা এইমাত্র

বলা হইল। নেপালের হরিচরিত কাব্যের পুষ্পিকাতে বরেন্দ্রভূমির বেদবিদ্যাখ্যাতির কথাও অনতিপূর্বেই বলা হইয়াছে।

বাংলার প্রাচীন বেদবিদ্যা সম্বন্ধে শিলালেখ ও তাম্রশাসন লেখের দ্বারা অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। সকল উপকরণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই এবং যাহা হইয়াছে তাহারও সব মাল-মশলা আমার হাতের কাছে নাই। তবু সামান্য মালমশলা যাহা নিকটে পাইয়াছি তাহা দিয়া যতটুকু বলা যায় এখানে তাহাই বলিব।

ঢাকা জেলায় রামপালের নিকটস্থ পঞ্চসার গ্রামে শ্রীচন্দ্রদেবের একটি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাজারাও তখন বৈদিক যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিতেন এবং বেদপন্থী রাজারাও বৌদ্ধমন্দির ও মূর্তি প্রভৃতির কাজে বহু দান করিতেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইলেও পূর্ববঙ্গাধিপতি শ্রীচন্দ্রদেব বেদানুসারে কোটিহোম অনুষ্ঠান করাতে, মকড়গুপ্তের প্রপৌত্র, বরাহগুপ্তের পৌত্র, সুমঙ্গলগুপ্তের পুত্র, পীতবাস গুপ্তশর্মাকে ভগবান বুদ্ধের নামে ভূমিদান করিতেছেন।[১৩]

মহারাজ বিজয়সেনের বারাকপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে দেখি মধ্যদেশ বিনির্গত কান্তিজোড় গ্রামবাসী, রত্নাকরের প্রপৌত্র, রহস্করের পৌত্র, ভাস্করের পুত্র, ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন-শাখাধ্যায়ী ষড়ঙ্গবেত্তা উদয়কর দেবশর্মাকে বিক্রমপুর প্রাসাদে হোম সম্পন্ন করার দক্ষিণারূপে ভূমিদান করা হইতেছে।[১৪]

বর্ধমান জেলায় কাটোয়া পরগণার নৈহাটী গ্রামে প্রাপ্ত মহারাজ বল্লালসেনের তাম্রশাসনে দেখা যায়, বরাহের প্রপৌত্র, ভদ্রেশ্বরের পৌত্র, লক্ষ্মীধরের পুত্র, সামবেদীয় কৌথুম শাখাধ্যায়ী, লাট্যায়ন এবং গোভিল সূত্রাধ্যেতা আচার্য শ্রীবাসুদেব শর্মাকে হেমাশ্ব মহাদান দক্ষিণারূপে ভূমিদান করা হইতেছে।[১৫]

নদীয়া জেলায় রাণাঘাটের নিকট আনুলিয়া গ্রামে ১৮৯৮ সালে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের এক তাম্রশাসন পাওয়া যায়, তাহাতে বিপ্রদাসের প্রপৌত্র, শংকরের পৌত্র, দেবদাসের পুত্র, যজুর্বেদের কাণ্বশাখাধ্যায়ী রঘুদেব দেবশর্মাকে ভূমিদানের কথা পাওয়া যায়।[১৬]

২৪ পরগণায় বারুইপুরের নিকটবর্তী গোবিন্দপুর গ্রামে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। তাহাতে গোস্বামী দেবশর্মার প্রপৌত্র, চহলের পৌত্র, শ্রীনিবাসের পুত্র, সামবেদীয় কৌথুমশাখাধ্যায়ী, লাট্যায়ন গোভিল সূত্রাধ্যেতা ব্যাসদেব শর্মাকে ভূমিদানের কথা উল্লিখিত।[১৭]

দিনাজপুরের মধ্যে বালুরঘাট মহকুমা। সেখানে গঙ্গারামপুর থানার

তর্পণদীঘির নিকটে পুষ্করিণী-সংস্কার কালে লক্ষ্মণসেনের এক তাম্রশাসন পাওয়া যায়। তাহার ৪১-৪৬ পঙক্তিতে দেখা যায় হুতাশনের প্রপৌত্র, মার্কণ্ডেয়ের পৌত্র, লক্ষ্মীধরের পুত্র, সামবেদীয় কৌথুমশাখাধ্যায়ী, গোভিল-আশ্বলায়ন সূত্র-অধ্যেতা ঈশ্বরদেব শর্মাকে হেমাশ্বরথমহাদানের দক্ষিণারূপে ভূমিদান করা হইতেছে।

পাবনা জেলায় সিরাজগঞ্জ মহকুমার মধ্যে রাইগঞ্জ থানার অন্তঃপাতী মাধাইনগর গ্রামে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। তাহাতে দেখা যায় দামোদরের প্রপৌত্র, রামের পৌত্র, কুমারের পুত্র, অথর্ববেদের পৈপ্পলাদ শাখাধ্যায়ী গোবিন্দদেব শর্মাকে ভূমিদান করা হইতেছে।[১৮]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে মহারাজ বিশ্বরূপসেনের একখানি তাম্রশাসন আছে। ১৯২৫ সালে ঢাকার নিকটে তাহা পাওয়া যায়। তাহাতে দেখা যায় লক্ষ্মীধরের প্রপৌত্র, দেবধরের পৌত্র, অধ্যয়ের পুত্র, যজুর্বেদান্তর্গত কাণ্বশাখাধ্যায়ী হলায়ুধ শর্মাকে দেওয়া হইতেছে।[১৯]

দিনাজপুর জেলার রামগঞ্জের কাছে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বর ঘোষের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। ইহার অক্ষর দেখা যায় সেন রাজাদের সময়ের অক্ষর অপেক্ষা প্রাচীনতর। প্রথম মহীপাল দেব ও তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের শাসন-লিপির সঙ্গেই ইহার অক্ষরগুলি মেলে। ভট্ট বাসুদেবের পুত্র যজুর্বেদাধ্যায়ী বিবোক শর্মাকে ভূমিদানের কথা ইহাতে উল্লিখিত।[২০]

চট্টগ্রাম নগরের অদূরে নসীরাবাদি গ্রামে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার কালে একখানিতাম্রশাসন পাওয়া যায়। ১২৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দামোদর নামে একজন বিষ্ণুদামোদর ভক্ত দাতা সুকৃতি যজুর্বেদী পৃথ্বীশ্বর শর্মা নামে একজন ব্রাহ্মণকে পাঁচ দ্রোণ ভূমিদান করেন।[২১]

ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল কোয়ার্টার্লি পত্রিকায় (জুন, ১৯৩৪ পৃ ৩২১) দেবপ্রসাদ ঘোষ ও বিনয়চন্দ্র সেন একটি তাম্রশাসনের খবর দিয়াছেন। তাহা পাওয়া যায় সুন্দরবনের মধ্যে রাক্ষসখালি দ্বীপে জঙ্গল পরিষ্কার করিবার সময়ে। ঐখানে একটি বৌদ্ধস্তূপও ছিল। তাহাতে সময় দেওয়া আছে ১১১৮ শক অর্থাৎ ১১৯৬ খ্রীষ্টাব্দ। রাজা শ্রীমদ্ ডোমন পাল বামহিধা গ্রাম যজুর্বেদ কাণ্বশাখাধ্যায়ী মহারাজক বাসুদেব শর্মাকে দান করিতেছেন। এই গ্রামখানি ত্রিরত্নের বাহিরে স্থিত। তবেই দেখা যায় ত্রিরত্নস্থানও সেখানে ছিল। এখানেও লেখা, এই দান তোমাদের সকলের অনুমোদিত হউক।[২২]

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সুন্দরবন প্রদেশে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের একটি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। তাহাতে জগদ্ধরের প্রপৌত্র, নারায়ণধরের পৌত্র, নরসিংহধরের পুত্র, গর্গগোত্রীয় ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন শাখ্যাধ্যায়ী শ্রীকৃষ্ণধর দেবশর্মাকে ভূমিদানের কথা উৎকীর্ণ।[২৩]

বিক্রমপুর আদাবাড়ী গ্রামে মহারাজাধিরাজ দশরথদেবের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে সেই তাম্রশাসনখানি নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ঢাকা মুজিয়ামে সংগ্রহ করেন। তাহাতে বুঝা যায় এই দশরথদেবই দনুজমাধব বা দনুজরায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। ইহাতে কয়েকটি গ্রামের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের উল্লেখ আছে।

ফরিদপুরের অন্তর্গত ইদিলপুর পরগণায় ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজাধিরাজ কেশবসেনের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। ইহাতে যে দান তাহা বেদাধ্যয়নের জন্য নহে। পরাশরের প্রপৌত্র, গর্ভেশ্বরের পৌত্র, বনমালীর পুত্র, নীতিপাঠক ঈশ্বর শর্মাকে ভূমিদানের কথা ইহাতে উল্লিখিত।[২৪]

ফরিদপুর কোটালিপাড়ায় মদনপাড়া গ্রামে বিশ্বরূপসেনের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। গ্রামটি পিঞ্জরী ডাকঘরের অন্তর্গত। ইহাতে দেখা যায় পরাশরের প্রপৌত্র, গর্ভেশ্বরের পৌত্র, বনমালীর পুত্র, নীতিপাঠক বিশ্বরূপ শর্মাকে ভূমিদান করা হইতেছে।[২৫] মনে হয় এই বিশ্বরূপ শর্মা ইহার পূর্বে তাম্রশাসনের উল্লিখিত ঈশ্বর শর্মার ভাই কারণ ইহাদের গোত্র, প্রবর, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ সব এক। উভয়েই নীতিপাঠক।

এই উপলক্ষ্যে একটি কথা বলা অসঙ্গত হইবে না। অনেকে মনে করেন বর্তমান বিক্রমপুর ও প্রাচীন শাসনলিপিতে উল্লিখিত বিক্রমপুর এক নহে। কিন্তু এখানে দেখা যায় বিক্রমপুর ভাগের মধ্যে[২৬] পিঞ্জকোষ্ঠী গ্রাম[২৬] তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে বর্তমান পিঞ্জরীর কাছেই। কাজেই সেই মত আর টিকিতে চাহে না।

দানসাগর গ্রন্থে বল্লাল সেন তাঁহার নিজগুরু অনিরুদ্ধের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে দেখি তিনি সর্ব-বিদ্যায় ও সর্ব কর্মে পারদর্শী। তিনি "বেদার্থ স্মৃতিসংকথাদি পুরুষঃ"। তাঁহার কথা যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

ভুবনেশ্বর প্রশস্তি অনুসারে ভট্টভবদেব ছিলেন মীমাংসা শাস্ত্রের পথ-নির্দেশক (মীমাংসারামুপারঃ) এবং বেদের সকল সীমায় তিনি অদ্বিতীয় কৃতধী।

সৌম্যি সামাং……কৃতধীরদ্বিতীয়োৎয়মেব।

শ্লোক ২৩

ঢাকা জেলার মধ্যে মহেশ্বরদী পরগণায় বেলার গ্রামে ভোজবর্মদেবের এক তাম্রশাসন পাওয়া যায় রাজার শান্ত্যাগারের অধিকারী উত্তর রাঢ় সিদ্ধল গ্রামীয় যজুর্বেদ কান্বশাখাধ্যায়ী রামদেব শর্মাকে উপ্যালিক নামে গ্রাম দান করিতেছেন।[২৮]

তখন ভিন্ন প্রদেশ হইতে কোনো বিদ্বান বেদবিদ্যাপটু ব্রাহ্মণ বাংলাতে আসিলে সমাদৃত যে হইতেন তাহার প্রমাণ দামোদরপুর, এবং বেলার তাম্রশাসন (ভোজবর্ম দেবের)। কিন্তু বাংলাতেও যে বহু বেদবিৎ মহাপণ্ডিতের বাস ছিল তাহাও দেখা যাইতেছে।

পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল কোয়ার্টালি পত্রিকায় (ডিসেম্বর ১৯৩৭ পৃ ৫৮১) দেখাইয়াছেন যে গৌড়েশ্বর বিজয় সেনের বা বল্লালের বা উভয়ের গুরু ছিলেন জ্ঞানোত্তম। তিনি জ্যোষ্কর্মসিদ্ধির চন্দ্রিকা নামে টীকা রচনা করেন। জ্ঞানোত্তমের শিষ্য চিৎসুখ মুনি হইলেন তত্ত্বপ্রদীপিকার রচয়িতা। ভট্ট সিংহগিরিও বিজয় সেন ও বল্লাল সেনের গুরু ছিলেন। বল্লাল চরিতেও এই কথা আছে। বল্লাল চরিত মতে দেখা যায় রাজা বীর সেন গৌড় ব্রাহ্মণ কন্যা সোমটাকে বিবাহ করেন:

পৃথু সেনান্বয়ে বীরো বীরসেনো ভবিষ্যতি।
গৌড় ব্রাহ্মণ কন্যাং যঃ সোমটা মুদ্বহিষ্যতি॥[২৯]

১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখে বজ্রদেবের পুত্র মুম্মুনিরাজ তাম্রশাসনের দ্বারা ১২ জন ব্রাহ্মণকে বৈদিক যাগযজ্ঞাদি পরিচালনের জন্য ভূমিদান করেন। তাঁহাদের মধ্যে কোনো পণ্ডিত গৌড়দেশ হইতে সেখানে গিয়াছিলেন।[৩০]

উড়িষ্যা প্রদেশের গঞ্জামের একটি গ্রামে লঙ্কাবংশীয় রাজা দেবেন্দ্র বর্মার তাম্রশাসনে দেখা যায় যে তিনি উত্তর রাঢ়বাসী যজুর্বেদের কণ্ঠ চরণাধ্যায়ী ভট্টনারায়ণপুত্র গোবিন্দশর্মাকে একটি গ্রাম দান করিতেছেন। এই শাসনখানি ৮০২-৮০৪ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে সম্পাদিত।

বর্ধমান জেলায় গলসি থানার মধ্যে মল্লসারুল গ্রামে ১৯২৯ সালে একখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। তাহাতে দেখা যায় রাজা গোপচন্দ্রের সময় মহারাজা বিজয় সেন ব্রাহ্মণ বটস্বামীকে পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রবর্তনের জন্য ভূমিদান করিতেছেন।

বটস্বামী ছিলেন ঋগ্বেদীয় বহবৃচ শাখার ব্রাহ্মণ। এই দানের জন্য বিজয় সেন নিকটবর্তী গ্রামের মহত্তরদের সহায়তা প্রার্থনা করেন এবং বীথী অধিকরণদের নিকট যথোপযুক্ত অর্থ দেন। তাঁহারাও তখন রাজাকে সেইজন্য অষ্টকুল্যাবাপ ভূমি দেন। তাহাই বটস্বামীকে শাসনপূর্বক দেওয়া হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায় বাংলাদেশে তখন ভূমি ছিল প্রজার। রাজাকেও ভূমি দান করিতে হইলে প্রজার শরণাগত হইতে হইত।[৩১]

এই বীথী-অধিকরণ এবং কোটিবর্ষের অন্তর্গত দামোদরপুরের শাসনোক্ত অধিষ্ঠান অধিকরণ অর্থাৎ নগরসভা প্রভৃতি বাক্যে তখনকার দিনে প্রজাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।[৩২]

বেদাধ্যয়নের জন্য পাণিনি ব্যাকরণের জ্ঞান প্রয়োজনীয়। বাংলাদেশে প্রাচীনকালে যে পাণিনিরও যথেষ্ট প্রচলন ছিল তাহা পরলোকগত বন্ধুবর নীলকমল ভট্টাচার্য মহাশয় সরস্বতীভবন স্টাডিস, তৃতীয় খণ্ডে দেখাইয়াছেন। পাণিনির ভাষাবৃত্তি শুধু বাংলাদেশেই প্রচলিত। ভাষাবৃত্তিকার পুরুষোত্তম ছিলেন বাঙ্গালী। রাজা লক্ষ্মণ সেনের উৎসাহে এই গ্রন্থ লিখিত হয়।

তাহা ছাড়া ধাতুবৃত্তি, ধাতুপ্রদীপ, তন্ত্রপ্রদীপ, কাশিকা-বিবরণ পঞ্জিকা প্রভৃতি গ্রন্থের পুঁথি বাংলাদেশেই বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থালয়ে রাখিয়াছেন। কাশিকা-বিবরণ পঞ্জিকা গ্রন্থখানি ন্যাস নামেই পরিচিত। ইহার সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায় নাই। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য তাঁহার টীকাতে বহুস্থলে পাণিনির সূত্র ব্যবহার করিয়াছেন। গদাধর বাঙ্গালী ছিলেন।

ভাগবৃত্তিই বাংলাদেশে মহাভাষ্যের মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। ভাগবৃত্তিকার বিমলমতির কথা অন্যত্র আলোচিত হইবে; তাই এখানে আর বেশি কিছু বলা হইল না।

রামমোহন যখন বাংলাদেশে উপনিষদ প্রবর্তন করিলেন তখন বাংলার পুরাতন হারানিধিকেই ঘরে ফিরাইয়া আনিলেন। বাংলাদেশ যাহাকে হারাইয়াছিল তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনা সহজ কথা নয়। ইহাতে বাইবেল বর্ণিত প্রডিগ্যাল সান গল্পটি মনে পড়ে।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী বেদাচার্য

প্রাচীনকালের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তখনকার দিনেও বাংলাদেশের মধ্যে প্রভূত পরিমাণে বেদপ্রচার ছিল। তাই সেই যুগে বাংলার

বাহিরেও বাঙালী আচার্যদের বেদচর্চার জন্য সমাদর ও সম্মান কম ছিল না। এইসব কারণে মনে হয় আদিশূর রাজার পঞ্চ বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়নের কি কোন প্রয়োজন ছিল? বাংলার বৈদিকেরা তো বলেন তাঁহারা রাজা শ্যামল বর্মার আনীত। কেহ কেহ বলেন পালরাজাদের সময় বাংলায় বেদচর্চা নানাভাবে উৎপীড়িত হইয়াছিল তাই দলে দলে বাঙালী বেদজ্ঞ পণ্ডিত দেশত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাম্রশাসন শিলালেখ প্রভৃতি প্রমাণ দৃষ্টে মনে হয় বৌদ্ধ পালরাজারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের প্রভূতভাবে সমাদর করিতেন। বৈদিক আচার্যদের তাঁহারা যথেষ্ট ভূমি প্রভৃতি দান করিয়াছেন। বৈদিক বিদ্যার উন্নতির জন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের বসতিস্থান "আনন্দযুক্ত" নামক অগ্রহারেরও উল্লেখ পালরাজা দ্বিতীয় গোপালদেবের জাজিলপাড়া-তাম্রশাসনে পাই।[৩৩]

রাষ্ট্রকূট রাজা পঞ্চম গোবিন্দ অর্থাৎ সুবর্ণবর্ষ ৯৩৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রাবণ পূর্ণিমা গুরুবারে একটি তাম্রশাসনের দ্বারা মহারাষ্ট্রদেশে কেশব দীক্ষিত নামক একজন বাজিকাথ শাখাধ্যায়ী পণ্ডিতকে লোহগ্রাম নামে একটি গ্রাম দান করেন। পুণার দক্ষিণে সাতারা জেলায় সাংলীতে এক ব্রাহ্মণের কাছে এই শাসনখানি পাওয়া যাওয়াতে ইহার নাম হইয়াছে সাংলীশাসন। ইহাতে গ্রহীতার পরিচয়ে দেখি, পুণ্ড্রবর্ধন নগর বিনির্গত কৌশিক গোত্র বাজিকাথ সব্রহ্মচারি-দামোদরভট্ট-সুতায় কেশবদীক্ষিতায়।[৩৪]

কাজেই বুঝা যায় পুণ্ড্রবর্ধনের বেদাচার্যরা বেদবিদ্যায় বিখ্যাত মহারাষ্ট্র কর্ণাট প্রভৃতি দেশেও কিরূপ সমাদর লাভ করিয়াছেন।

মাদ্রাজ প্রদেশে কোলাগাল্লুরে একটি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। তাহাতে দেখা যায় রাষ্ট্রকূটরাজ খোত্তিগে গৌড়চূড়ামণিগুণী তড়াগ্রামোদ্ভব বরেন্দ্র-দেশোজ্জলকারী বরেন্দ্র্যদ্যোতকারিণা বিদ্বান্ গৌড়চূড়ামণি গুণী গদাধর নামক গৌড়দেশীয় ব্রাহ্মণকে ৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শাসনের দ্বারা ভূসম্পত্তি দান করিতেছেন।[৩৫]

দক্ষিণ রাঢ়স্থিত নবগ্রাম হইতে একাদশ শতাব্দীতে হলায়ুধ মালবদেশে গিয়া বাস করেন এবং কবিত্বের জন্য সর্বজনমান্য হন।

উড়িষ্যায় বৈদিক ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষরা দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ হইতে গিয়া সেই দেশে বসবাস করেন।[৩৬] তাঁহাদেরই কেহ কেহ পরে উৎকল ত্যাগ করিয়া পুনরায় বাংলাদেশে বসবাস করেন। এই ভাবেই শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্বপুরুষ শ্রীহট্ট জেলায় গিয়া বাস করেন। ইঁহাদের মধ্যে উপেন্দ্রমিশ্রের

সাত পুত্র, কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্বেশ্বর, জগন্নাথ, জনার্দন, ত্রৈলোক্যনাথ। গঙ্গার তীরে বাস করিবার জন্য জগন্নাথ নদীয়ায় আসেন। তাঁহার পুত্রই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। মহাপ্রভুর বড় ভাই বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়া শঙ্করাচার্য নাম গ্রহণ করেন; মহাপ্রভু যে আবার জগন্নাথধামে বাস করেন তাহাতে তাঁহার পুরাতন উৎকল ভূমির প্রতি আকর্ষণই সূচিত হয়।

উৎকলপ্রবাসী বাঙালী পণ্ডিতদের কথায় রাঢ়দেশের সিদ্ধল গ্রামবাসী ভট্ট ভবদেবের নাম পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেব মন্দিরলগ্ন একখানি শিলালেখে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। জেনারল স্টুয়ার্ট শিলাখানি কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটিতে আনিয়াছিলেন। পরে তাহা সেই মন্দিরে ফিরাইয়া দিতে হয়। এখন তাহা মন্দিরে গাঁথা হইয়া আছে। ভবদেব ছিলেন ব্রহ্মাদ্বৈত দর্শনে মহাপণ্ডিত। সিদ্ধান্ততন্ত্র গণিতশাস্ত্রে ফলসংহিতায় ও হোরাশাস্ত্র রচনায় তিনি ছিলেন বরাহতুল্য। অর্থশাস্ত্র আয়ুর্বেদ অস্ত্রবেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে নিপুণ ভবদেব মীমাংসা শাস্ত্রের ও স্মৃতির যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন আজও বাংলাদেশে ও উৎকলের বহুস্থানে তাহা প্রামাণ্য। ভট্টকুমারিলের একটি গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

এই ভবদেব রচিত পূর্ব মীমাংসার একখানি গ্রন্থ কাশীর গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিতবর মঙ্গলদেব শাস্ত্রী সম্পাদন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ সরস্বতীভবন গ্রন্থমালার অন্তর্গত। গ্রন্থের নাম তৌতাতিতমত-তিলকম্। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় পর্যন্ত মুদ্রিত আমাদের হস্তগত হইয়াছে। অধ্যায় শেষে গ্রন্থপরিচয়ে দেখা যায়—"বালবলভীভুজঙ্গাপরনাম্নো মহামহোপাধ্যায় শ্রীভবদেবস্য কৃতৌ তৌতাতিতমততিলকে নামধেয় পাদঃ সমাপ্তঃ"।

এই গ্রন্থখানির টীকা করিয়াছেন দক্ষিণ ভারতের চিন্নস্বামী শাস্ত্রী ও পট্টাভিরাম শাস্ত্রী।

তুতাতিত হইল ভট্টকুমারিলেরই এক নাম। কাজেই "তৌতাতিক" নামের দ্বারা কুমারিল মতেরই পোষকতা এই গ্রন্থে করা হইয়াছে তাহা বুঝা যায়। গ্রন্থখানির ভাষা, বিচার ও সিদ্ধান্ত স্থাপনের প্রণালী অতিশয় চমৎকার।

ভবদেবভট্ট রচিত প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ ও কর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি পণ্ডিতগণের মধ্যে সমাদৃত। ভবদেব ছিলেন হরিবর্মদেবের মন্ত্রী।

তখনকার দিনে বহু বাঙালী পণ্ডিত কাশীতে বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য মহনীয়-কীর্তি মধুসূদন সরস্বতীর নাম। তিনি

ছিলেন ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনসিয়া গ্রামবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণ। তাঁহার গ্রন্থগুলিতে যেমন গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তেমনই তাঁহার ভাষা ও বিচার প্রণালী অপূর্ব। তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যাও বিস্তর। তাঁহার রচিত অদ্বৈতসিদ্ধি, অদ্বৈত রত্ন রক্ষণ, সিদ্ধান্তবিন্দু, গূঢ়ার্থদীপিকা, সংক্ষেপ শারীরক ব্যাখ্যা, বেদান্তকল্পলতিকা প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার গভীর বেদ-উপনিষদের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

মহাভারতের বিখ্যাত টীকাকার অর্জুন মিশ্র বাংলার বাহিরে সুপরিচিত। তিনি বারেন্দ্র চম্পাহেটী গ্রামবাসী। সংহিতা উপনিষদের শাস্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল।

বাসুদেব সার্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদ বাংলাদেশ ছাড়িয়া কাশীতে গিয়া বাস করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইনি অদ্বৈত-মকরন্দের টীকা রচনা করেন। তাহাতে উপনিষদাদি শ্রুতিশাস্ত্রে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাসুদেব সার্বভৌমও অদ্বৈত-মকরন্দের টীকা রচনা করেন। রঘুনাথ শিরোমণি লেখেন শ্রীহর্ষের খণ্ডনখণ্ড-খাদ্যের টীকা। ইঁহাদের লেখাতে প্রগাঢ় শ্রৌতজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

গৌড় পূর্ণানন্দ কবিচক্রবর্তীর তত্ত্বমুক্তাবলী ও মায়াবাদ শতদূষণীতেও গভীর শ্রৌতজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থাংশ ১৪ শতাব্দীর সর্বদর্শনসংগ্রহে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহারই সমসাময়িক গৌড় ব্রহ্মানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তিনি অদ্বৈতসিদ্ধি ও সিদ্ধান্তবিন্দুর উপর চমৎকার টীকা লেখেন। তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থ অদ্বৈতসিদ্ধান্ত বিদ্যোতন। তিনিও বেদবিদ্যায় গভীর পণ্ডিত ছিলেন। অদ্বৈতসিদ্ধি রচয়িতা শ্রীধরের বাসস্থান ছিল বর্ধমান জেলার ভূরসুট গ্রামে।

আসীদ্ দক্ষিণরাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্মণাম্।
ভূরিসৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠিজনাশ্রয়ঃ ॥

(প্রশান্ত পাদভাষ্যে শ্রীধরকৃত ন্যায় কন্দলী টীকার সমাপ্তি বচনে)

এই ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রামের কৃষ্ণ মিশ্র একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রবোধ চন্দ্রোদয় রচনা করেন।

গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়া পুরী।
ভূরিশ্রেষ্ঠকনামধাম পরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা ॥

প্রবোধচন্দ্রোদয়, ২ অঙ্ক, ৭

বাংলাদেশে ও মাদ্রাজে নানা গ্রন্থালয়ে বঙ্গাক্ষরে লেখা বহু উপনিষৎ ও টীকাপুঁথি সংগৃহীত আছে। বেদান্ততত্ত্বমঞ্জরী নামে বঙ্গাক্ষরে লেখা পুঁথি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মেদিনীপুর জেলায় পাইয়াছেন।

রাজা মহীপাল দেবের বাণগড় লিপিতে দেখা যায় যে তখন মীমাংসা শাস্ত্রের আলোচনা বাংলাদেশে রীতিমত ছিল :

"মীমাংসা ব্যাকরণ তর্কবিদ্যাবিদে" ইত্যাদি

বৈদিক পূর্ব মীমাংসায় আচার্য শালিকনাথ যে বাঙালী, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে, তবেই দেখা যায় অতি প্রাচীন কালেই মীমাংসা দর্শনের প্রচার বাংলায় ল। আরও কয়েকজন মীমাংসা দর্শনের বাঙ্গালী আচার্যের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে।

লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ হলায়ুধ মীমাংসাসর্বস্ব লেখেন—এই সব বাঙালী পণ্ডিতেরা বাংলাদেশের বাহিরেও পূজিত ও সম্মানিত হইতেন। বাংলাদেশের বাহিরেও ইঁহাদের সব সিদ্ধান্ত সমাদৃত হইত।

১৩৪৪ সালের আশ্বিন মাসের ভারতবর্ষ পত্রিকায় শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ দেখাইয়াছেন যে মুক্তাবস্তু নামে বেদবিদ্যার জন্য প্রখ্যাত গ্রাম ছিল বরেন্দ্র দেশে।

মধ্যভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত পিপলিয়ানগর নামক স্থানে প্রাপ্ত পরমাররাজ অর্জুন বর্মদেবের ১২২১ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত তাম্রশাসনে মুক্তাবস্তুর ব্রাহ্মণদের উল্লেখ আছে।[৩৭] ভূপালে প্রাপ্ত অর্জুন বর্মদেবের তাম্রশাসনে দেখা যায় মুক্তাবস্তু বিনির্গত ব্রাহ্মণকে দান করিবার জন্যই ১২১৩ খ্রীষ্টাব্দে শাসনখানি রাজা সম্পাদন করাইয়াছেন।[৩৮]

এই মুক্তাবস্তুই বুন্দেলখণ্ডের চরখরি রাজ্যে প্রাপ্ত চন্দেলরাজ পরমর্দিদেবের ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত তাম্রশাসনে মুতাউথ বা সুতাউথ নামে অভিহিত হইয়াছে।

সুতাউথভট্টাগ্রহারবিনির্গতেভ্যঃ···ছান্দোগ্যশাখাধ্যায়িভ্যঃ·· ইত্যাদি।[৩৯]

উড়িষ্যার মহারাজ বিনীত তুঙ্গদেব প্রদত্ত তালচের তাম্রশাসনে লিখিত আছে :

পুণ্ডবরমবিনির্গত ··অথাবস্তুবিনির্গত···ইত্যাদি।[৪০]

এই পুণ্ডবরমই পুণ্ড্রবর্দ্ধন ও অথাবস্তুই মুক্তাবস্তুর বিকৃত রূপ।

উড়িষ্যা তালচেরে প্রাপ্ত গয়াড় তুঙ্গদেবের তাম্রশাসনে লিখিত আছে :

বরেন্দ্রমণ্ডলে মুথাউথভট্টগ্রামবিনির্গত-

যজুর্বেদাচরণকণ্বশাখাধ্যায়িনে ইত্যাদি।[৪১]

এখানে মুখাউধ ঐ মুক্তাবস্তু।

মধ্যপ্রদেশে নিমার জেলায় নর্মদাগর্ভে মান্ধাতাদ্বীপেস্থিত সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের নিকটে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে দেবপাল দেবের সম্পাদিত একটি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। শাসনটি ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত। এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকার নবমখণ্ডে কীলহর্ণ সাহেব ইহার পরিচয় দেন।

এই শাসনখানিতে দেখা যায় রাজা যে ভূমি দান করিতেছেন তাহার আয়ের ৩২½টি বণ্টক বা ভাগ হইবে। তাহার মধ্যে একজন ২ ভাগ, দুইজন প্রত্যেকে ১½ ভাগ, তিনজন প্রত্যেকে অর্ধভাগ, ছাব্বিশজন প্রত্যেকে ১ ভাগ পাইবেন। তাহার মধ্যে মুক্তাবথুস্থান বিনির্গত আশ্বলায়ন শাখাধ্যায়ী নারায়ণ শর্মা এক ভাগ মুক্তাবথুস্থান বিনির্গত মাধ্যন্দিন শাখাধ্যায়ী গঙ্গাধর শর্মা অর্ধভাগ, ও উদঙ্গ শর্মা অর্ধভাগ পাইবেন।

এই মুক্তাবথুকে কীলহর্ণ সাহেব অর্জুন বর্মার তিনটি শাসনে উল্লিখিত মুক্তাবস্তুস্থান বলিয়াই মনে করেন।

এই তাম্রশাসনটির রচয়িতা রাজগুরু মদন। পিপলিয়ায় প্রাপ্ত অর্জুন বর্মদেবের পূর্বোক্ত তাম্রশাসন ও ভূপালে প্রাপ্ত অর্জুন বর্মদেবের তাম্রশাসনও তাঁহারই রচনা। তিনিই অর্জুন দেবের গুরু। এই রাজগুরু মদন ছিলেন গৌড় দেশবাসী।

"গৌড়ান্বয় গঙ্গাপুলিন রাজহংস" মদনের একটু পরিচয় লওয়া যাউক।

মালবের পরমার বংশীয় রাজাদের পুরাতন রাজধানী ছিল ধারানগরে। এই ধারানগরে কমালমৌলা মসজিদের মেহরাবের উত্তর দিকে একখানি কৃষ্ণবর্ণ শিলা প্রাচীরে লগ্ন ছিল। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে সেই শিলাখানি দেওয়াল হইতে খসিয়া পড়িলে দেখা যায় তাহার ভিতরের দিকে রাজা অর্জুন বর্মার ৮২ পঙক্তি দীর্ঘ প্রশস্তি লেখা। লেখা দেখা যায় এমন ভাবে শিলাখানি এখন মসজিদে লাগান হইয়াছে।

এই শিলা প্রশস্তিতে সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষা প্রযুক্ত হইয়াছে। ৭৬টি শ্লোক ইহাতে আছে, তাহা ছাড়াও গদ্য লেখা আছে। বিজয়শ্রী ও পারিজাতমঞ্জরী নামে একখানা অপরিচিত পূর্ব চতুরঙ্ক নাটকের প্রথম দুইটি অঙ্ক ইহাতে লিখিত। এই নাটকের লেখক রাজগুরু মদন। মদনের পূর্বনিবাস গৌড় বঙ্গদেশে। তাঁহার পূর্বপুরুষ ছিলেন গঙ্গাধর। ধারানগরের বসন্তোৎসবে এই নাটকখানি প্রথম অভিনীত হয়। দুইখানি শিলাতে নাটকটি পূর্ণভাবে

লিখিত হইয়াছিল। একখানি ঘটনাক্রমে অধিগত হওয়ায় নাটকের দুই অঙ্ক পাওয়া গেল।

অপর একখানি শিলাতে যে বাকী দুই অঙ্ক লিখিত আছে সেই শিলাখানির কি গতি হইল কে জানে?

এই প্রশস্তিটির প্রথমেই পাই মহারাজ অর্জুন বর্মদেবের নাম। প্রবন্ধ চিন্তামণি গ্রন্থেও এক অর্জুন দেবের নাম পাওয়া যায়।[৪২]

অর্জুন বর্মদেবের প্রদত্ত ১২১১, ১২১৩, ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দের যে সব তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তাঁহারও রচয়িতা এই রাজগুরু মদন।

মহারাজ অর্জুন বর্মদেব পরাক্রান্ত বীর ছিলেন, তাঁহার পরিচয় নানাভাবেই পাওয়া গিয়াছে। তিনি সাহিত্যেও সুপণ্ডিত ছিলেন। বিখ্যাত অমরু-শতকের একটি টীকা অর্জুন বর্মদেবের লেখা। তাহাতেও তিনি নিজ গুরু মদনের কথা বলিয়াছেন। মদনের উপাধি তাহাতে দেখা যায় বালসরস্বতী। মদনের বহু রচনার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রসিক সঞ্জীবনী মতে তাঁহার কাব্যরচনাও বিস্তর। গুরুপ্রসাদে ও সহায়তাতেই এতটা সম্ভবপর হইয়াছিল। প্রশস্তির তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে দেখা যায় সারদা দেবীর মন্দিরে সকল দিগন্তর হইতে উপাগত অনেক "ত্রৈবিদ্য সহৃদয়কলাকোবিদ রসিকসুকবিসঙ্কুল" সমাগম হইয়াছিল। সেখানে গৌড়বংশীয় গঙ্গাপুলিন রাজহংস গঙ্গাধর বংশীয় রাজগুরু মদনের অভিনবকৃতি এই নাটিকা অভিনীত হয়।

"গৌড়ান্বয়গংগাপুলিনরাজহংসস্য গংগাধরায়ণে মদনস্য রাজগুরোঃ কৃতিরভিনবা" —ইত্যাদি।

ডক্টর ভাণ্ডারকরের ১৮৮৩-১৮৮৪ সালের রিপোর্টে দেখা যায় এই বালসরস্বতী মদনের গুরু ছিলেন জৈনাচার্য আশাধর। আচার্য আশাধর অর্জুনদেব, দেবপাল ও জয়সিংহের সমকালীন।

আচার্য ফুলটন এই প্রশস্তিটি পাঠোদ্ধার করিয়া এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকায় অষ্টম খণ্ডে প্রকাশ করেন।

পুরাতন প্রবন্ধসংগ্রহ গ্রন্থে বস্তুপালসভায় দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী কবির নাম পাই। একজন মদন, অন্যজন হরিহর। উভয়ের রচিত কয়েকটি শ্লোকের নমুনাও সেখানে দেওয়া আছে।[৪৩]

রাজশেখর সূরিকৃত প্রবন্ধকোষে (১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে) হরিহরের বেশ বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে আছে গৌড়দেশবাসী হরিহর শ্রীহর্ষবংশে জন্মগ্রহণ

করেন। কাজেই দেখা যায় শ্রীহর্ষও গৌড়দেশীয়। গুজরাট যাত্রা প্রসঙ্গে রাণা বীরধবল, মন্ত্রী শ্রীবস্তুপাল ও পণ্ডিত কবি সোমেশ্বরের সঙ্গে তাঁহার আলাপ-পরিচয়ের কথা সবিস্তারে বর্ণিত আছে। হরিহর সেখানে আপন পূর্বপুরুষ শ্রীহর্ষরচিত কাব্য শুনাইয়া বস্তুপাল প্রভৃতিকে চমৎকৃত করিয়া দেন।**

বারাণসীতে গোবিন্দচন্দ্র রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র ছিলেন জয়ন্তচন্দ্র, তাঁহার পুত্র মেঘচন্দ্র, সেখানে হীর নামে এক বিপ্র ছিলেন। শ্রীহর্ষ তাঁহার পুত্র। তর্ক-অলঙ্কার-গীত-গণিত-জ্যোতিষ-মন্ত্র-ব্যাকরণাদি সকল বিদ্যা শ্রীহর্ষ আয়ত্ত করেন। তাঁহার বিস্তৃত পরিচয় সিংঘী জৈনগ্রন্থমালার ষষ্ঠগ্রন্থ প্রবন্ধকোষে হর্ষ-কবি প্রবন্ধে দেওয়া আছে।

বারাণসীর রাজসভায় পণ্ডিতগণের কাছে শ্রীহর্ষের পিতা হীর অপমানিত হন। পুত্র শ্রীহর্ষ তাঁহার কবিত্বে ও পাণ্ডিত্যে পরে তাহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। তাঁহার নৈষধ রচনা সমাপ্ত হইলে বারাণসীর রাজকবিগণ তাহা অসামান্য বলিয়া স্বীকার করেন। রাজা কহিলেন "আপনি কাশ্মীরদেশে গিয়া সেখানকার রাজা ও কবিগণের সম্মতি সংগ্রহ করুন।"

শ্রীহর্ষ কাশ্মীরে গেলেন। সেখানে ভারতী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। কিন্তু স্থানীয় পণ্ডিতেরা বিরুদ্ধ থাকায় রাজসভায় তিনি প্রবেশ লাভ করিলেন না। ক্রমে তাঁর সম্বল ফুরাইয়া আসিল। কিছুতেই আর যখন তাঁহার ব্যয় নির্বাহ হইতেছে না তখন একদিন এক দেবালয়ে বসিয়া তিনি জপ করিতেছেন এমন সময় দুই দাসী নিকটস্থ কূপে জল ভরিতে আসিল। কে আগে জল ভরিবে এই লইয়া দারুণ কলহ উপস্থিত হইল। ক্রমে মারামারি; ঘট ও মাথা দুই-ই ভাঙ্গিল। রাজার কাছে বিচার, সাক্ষী কে? তাহারা বলিল, "নিকটে দেবালয়ে এক ব্রাহ্মণ জপে রত ছিলেন, তিনি হয়তো কিছু বলিতে পারেন।"

শ্রীহর্ষকে রাজসভায় আসিতে হইল। তিনি সংস্কৃতে বলিলেন "মহারাজ, আমি তো এখানকার ভাষা জানি না। তবে দাসীরা নিজ নিজ ভাষায় যে যে কথা বলিয়াছে তাহা আমি শুদ্ধ স্মৃতির বলে পুনরায় বলিয়া যাইতে পারি।" এই কথা বলিয়া আদ্যোপান্ত তাহাদের সকল কথা তিনি সেই দেশীয় ভাষায় শুদ্ধ ভাবে বলিয়া গেলেন। দাসীদের বিচার শেষ করিয়া রাজা শ্রীহর্ষকে বলিলেন "মহাশয়, অদ্ভুত আপনার শক্তি! কে আপনি?" শ্রীহর্ষ আপন পরিচয় দিয়া তাঁহার দুঃখের কথা জানাইলেন। তখন রাজা পণ্ডিতগণকে তাঁহাদের ক্ষুদ্রতার জন্য তিরস্কার করিলেন।**

এই গল্পের অনুরূপ একটি কথা পরবর্তীকালে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সম্বন্ধেও প্রচলিত আছে।

সরস্বতীভবন স্টাডিস তৃতীয় খণ্ডে পণ্ডিত নীলকমল ভট্টাচার্য মহাশয় শ্রীহর্ষ-বিষয়ে একটি বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছেন যে শ্রীহর্ষ ছিলেন বাঙ্গালী। নৈষধচরিত এবং খণ্ডনখণ্ডখাদ্য এই দুইই শ্রীহর্ষের রচনা। শ্রীহর্ষ তাঁহার গ্রন্থে জন্মভূমির নাম না করিলেও নানা ভাবেই তাহা যে বাংলা দেশ এই কথাটি তাঁহার লেখাতে বুঝা যায়। দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে উলুধ্বনি হইয়াছিল "উচ্চৈরুলুলুধ্বনিরুচ্চচার"[৪৬]। উলু বাংলারই জিনিষ। টীকাকার নারায়ণও বলেন—বিবাহাদ্যুৎসবে স্ত্রীণাং ধবলাদি মঙ্গল গীতি বিশেষেণ গৌড়দেশে "উলুলুঃ" ইত্যুচ্যতে। মল্লিনাথ দক্ষিণদেশবাসী। তিনিও বলেন "উলুলু······উদীচ্যানামাচারঃ" উত্তর ভারতেই উলুধ্বনির প্রথা[৪৭]।

মঙ্গল চিহ্নরূপে শাঁখা ধারণও বাংলার রীতি। নৈষধের পঞ্চদশ খণ্ডের ৪৫ শ্লোকে পাই "ভুজৌ সুদত্যা বলয়েন কম্বুনঃ" দ্বাদশ খণ্ডের ৩৫ শ্লোকেও শাঁখা ধারণের কথা আছে। টীকাকার নারায়ণও বলেন গৌড়দেশে বিবাহকালে শঙ্খবলয়-ধারণমাচারঃ। বিবাহকালে বর ও বধূর হস্ত কুশের দ্বারা বন্ধনও দেশাচার। নৈষধে তাহা পাই[৪৮]। উলুলু প্রভৃতির বিষয়ে নারায়ণ তাই বলেন স্বদেশরীতিঃ কবিনোক্তা[৪৯]।

চালের পিঠালী দিয়া আলপনার প্রথা বাংলাদেশের। নৈষধেও তাহা দেখা যায়[৫০]। নীলকমল ভট্টাচার্য এই শ্লোকে আর একটি বাঙ্গালী প্রথা যে আছে তাহা দেখাইয়া দেন নাই। বাংলায় বিবাহে আনন্দলাড়ু করিতেই হয়। এখানেও দেখা যায় অপূপ নির্মাণ বিদগ্ধয়াদয়ঃ[৫১]।

বর নল রাজা মুকুট মাথায় দিয়া দর্পণ হাতে লইয়া বিরাজিত[৫২]। বিবাহান্তে বাসর ঘরের ব্যবস্থা আছে[৫৩]। নারীরা সেই ঘরে বরবধূর প্রথম মিলনলীলা দেখিবার জন্য সহস্র ছিদ্র যে করিয়া রাখিয়াছিলেন সহস্র-রন্ধ্রীকৃতমৌক্তিকং ততঃ এই কথাটিও বন্ধুবর নীলকমল দেখাইয়া দিলে ভাল হইত। এখন পর্যন্ত এই সব প্রথা নারীদের মধ্যে আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে।

বাংলাদেশে সধবার লক্ষণই হইল শাঁখা-সিঁদুর-মাছভাত। মাছভাত ছাড়া বাংলাদেশে মঙ্গল কর্ম হয় না। ভারতের অন্যত্র তাহা চলে না। নৈষধে এই অন্নমীনের অর্থাৎ মাছভাতের কথা পাই—

অক্তন্বয়া সাধিতমন্নমীনম্[৫৪]

নৈষধেও দেখি মাথায় সিঁদুর[৫৫] এবং পায়ে আলতা (অঙ্ঘ্রিলাক্ষাম্)। ভারতের অন্যান্য ভাগে মাথায় কুঙ্কুম দেয়, সিন্দুর বিশেষ করিয়া বাংলার জিনিষ। এইসব লোকাচার অনেক সময় শাস্ত্রে অনুক্ত, কোনো কোনো স্থলে তাহা শাস্ত্রের বিরুদ্ধ। তবু দেশাচার কুলাচার অনতিক্রম্য। এই কথা টীকাকার নারায়ণও উল্লেখ করিয়াছেন উলূলুধ্বনি বেদে আছে[৫৬]। মহাভারতেও আছে[৫৭]। প্রাচীন গুজরাতেও ছিল[৫৮] কাদম্বরীতেও ইহা আছে। তবে বাংলাদেশে ইহা এখনও একটি প্রবল স্ত্রী-আচার। এবং এইসব আচার একমাত্র বাংলা ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। মহাভারতের বিরাট দেশে পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাসের জন্যই এইসব প্রাচ্যদেশসুলভ আচার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীহর্ষ শুধু শঙ্খবলয়ের কথাই বলেন নাই। শাঁখারীর করাত ঠিক অর্ধচন্দ্রের মত দেখিতে। শ্রীহর্ষ সেই উপমাটিও প্রয়োগ করিয়াছেন:

শঙ্খচ্ছেৎকরপত্রতামিহ বহন্নস্তংগতার্ধো বিধুঃ ॥[৫৯]

শাঁখারীর করাত বাংলার বাহিরে কোথাও দেখি নাই।

নৈষধে তান্ত্রিক সারস্বত মন্ত্রের সাধনা দেখা যায়। চিন্তামণি মন্ত্রের সিদ্ধির কথাও দেখিতে পাই,—ইহাতেও বাংলা দেশের কথাই মনে আসে।

শ্রীহর্ষের মায়ের নাম মামল্লা দেবী। বাঙ্গালী শ্রীধরাচার্যের মায়ের নাম ছিল আচ্ছোকা। এখনকার দিনে ইহা চলিত না হইলেও তখন অপ্রচলিত ছিল না। খণ্ডন খণ্ড খাদ্যে তাঁহার উপাধি কোথাও কোথাও "মিশ্র" বলা হইয়াছে। বাংলা দেশে বিস্তর মিশ্র উপাধি আছে। তাহা এই গ্রন্থেই নানা স্থানে পাওয়া যাইবে। মহাপ্রভু চৈতন্যের যুগে জগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতি নাম তো সর্বদাই দেখা যাইত। এখনও বহু মিশ্র পরিবার বাংলায় দেখা যায়। শ্রীহর্ষ পাণিনি জানিতেন। বাংলা দেশে পাণিনির প্রচলনের কথা পূর্বেই দেখান হইয়াছে।

হরিহর আপন পূর্বপুরুষ শ্রীহর্ষকে যে গৌড়বাণী বলিয়াছেন সেই যুগেরই বিদ্যাপতি ঠাকুর পুরুষপরীক্ষায় বলিয়াছেন,

বভূব গৌড়বিষয়ে শ্রীহর্ষো নাম কবিঃ পণ্ডিতঃ।

শ্রীহর্ষ কান্যকুব্জে বা কাশ্মীরে সম্মান পাইয়া থাকিলেও তিনি সেই দেশীয় নহেন। বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে। শ্রীহর্ষ শব্দানুপ্রাস প্রয়োগে বারবার যে বাঙালীর উচ্চারণের পরিচয় দিয়াছেন তাহা নীলকমল ভট্টাচার্য উত্তমরূপে বহুস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন[৬০]। "শ-ষ-স" এবং "ব-র" "ণ-ন" "য-জ" "ক্ষ-খ" প্রভৃতি তিনি সমানভাবে চালাইয়া গিয়াছেন। ইহা বাঙালীত্বের মস্ত প্রমাণ।

নৈষধচরিত এবং খণ্ডনখণ্ড খাদ্য ছাড়া, তাঁহার রচিত আরও গ্রন্থ আছে যথা—স্থৈর্য বিচার, বিজয় প্রশস্তি, গৌড়োবীর্যকুল প্রশস্তি, অর্ণব বর্ণন, ছিন্দ প্রশস্তি, শিবশক্তি সিদ্ধি, নবসাহশবদ চরিত, ঈশ্বরাভিসন্ধি। বিজয় প্রশস্তি দেখিয়া মনে হয় বল্লালের পিতা বিজয় সেনের প্রশস্তি। গৌড়াধীপ গৌড়াধিপতির কথা।[৬১] বিজয় সেন দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। শ্রীহর্ষও সেই সময়েরই।

মদনের কথাপ্রসঙ্গে অনেক কথাই আলোচিত হইল। বিশেষ করিয়া মহাকবি শ্রীহর্ষের কথা এখানে সবিস্তারে বর্ণিত হইল। মদনের বেদবিদ্যার কথাই আলোচনা চলিতেছিল। বেদ চর্চা ছাড়াও সর্বশাস্ত্রে ও নানাবিদ্যা প্রসঙ্গে সংস্কৃত চর্চার জন্যও মদনের খ্যাতি ছিল। সংস্কৃত সাহিত্য চর্চায় বাঙালী কায়স্থদেরও বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। যোধপুর রাজ্যের মধ্যে কিংসরিয়া গ্রামের কাছে এক গিরিশিখরে কেরায় মাতার একটি মন্দিরে (দহিয়া) দধিচিক রাজা চচ্চের নামে একটি উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে। লিপিটি ৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দের। সেই লিপিটির রচয়িতা গৌড়কায়স্থ সংকবি শ্রীকল্যের পুত্র মহাদেব।

গৌড়কায়স্থবংশে ভূচ্ছ্রীকল্যো নাম সৎকবিঃ।
সুনুস্তস্য মহাদেবঃ প্রশস্তিং [ব্যদধাদিমাম্] ॥[৬২]

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ডক্টর ডি. আর. ভাণ্ডারকর এবং রমাপ্রসাদ চন্দ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে বাংলা দেশের কায়স্থ ও গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণদের মধ্যে মূলতঃ যোগ আছে। সেন্সস্ রিপোর্টে এই কথা স্বীকৃত[৬৩]। বাংলায় নাগরদের নানা অবশেষ এখনও আছে। নাগরদের মধ্যে বাঙালী কায়স্থদের সব উপাধি এখনও চলিতেছে। শ্রীহট্টে এখনও নাগর উপাধিধারী জাতি আছে। শ্রীহট্টবাসী ঈশান নাগরের নামও এইস্থলে চিন্তনীয়।

ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণাদি সমাজের প্রধানতঃ দুই ভাগ। উত্তর ও দক্ষিণ দেশের সমাজভেদে এই দুই ভাগ। দক্ষিণে যে পাঁচটি শাখা তাহাকে বলে পঞ্চদ্রবিড়। উত্তরের পাঁচশাখাকে বলে পঞ্চ গৌড়। পাঞ্জাব, উজ্জয়িনী, কাশী, কোশল

প্রভৃতি প্রখ্যাত স্থান থাকিতে গৌড়ের নামেই কেন উত্তর ভারতের তাবৎ সমাজ চিহ্নিত হইল ইহাই ভাবিবার বিষয়।

এই সময় গৌড়দেশ বলিতে বাংলার পশ্চিমভাগ ও অযোধ্যার একভাগকে বুঝাইত। মৎস্যপুরাণ-মতে দেখা যায় শ্রাবস্তী নগরও গৌড়দেশেই নির্মিত।

শ্রাবস্তশ্চ মহাতেজা বৎসকস্তৎসুতোঽভবৎ।
নির্মিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়দেশে দ্বিজোত্তম।

গৌড় নাম হইতেই নাকি গোণ্ডা জেলার নামকরণ হইয়াছে। রাজপুতানায় ব্রাহ্মণ রাজপুত কায়স্থ এমন কি চামারও গৌড়শাখাশ্রয়ী আছেন। মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর ওঝা বলেন, তাঁহারা বোধ হয় অযোধ্যা হইতে আগত, বাংলা দেশ হইতে নহে।[৩৪] কিন্তু বাংলা দেশ হইতে কেন নহে সে কারণ তিনি দেখান নাই। আজমেরে বহু গৌড়ের বাস ছিল। যোধপুরের এক অংশে গৌড়াটি বা গৌড়বাটি বহু গৌড়ের স্থান ছিল। সেই জনপদ নাম এখনও আছে।[৩৫]

অলবিরুণী তো থানেশ্বরকেও গৌড়ের অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়াছেন। তাই মনে হয় এক সময় বাংলা হইতে শ্রাবস্তী পর্যন্ত গৌড় ছিল। পরে তাঁহাদের প্রভাব আরও বহুদূর পশ্চিমে বিস্তৃত হয়।

ওঝাজীর মতে চৌহান পৃথ্বীরাজের সময় গৌড়েরা রাজপুতানায় যান। যোধপুর রাজ্যের এক অংশের সেইজন্য নাম গৌড়রাড় যেমন কাঠীদের স্থান কাঠিয়ারাড়। এখন সেখানে রাজগড় ছাড়া আর কোন স্থান গৌড়দের অধিকারে নাই। জুনিয়া, সারর, দেবলিয়া, শ্রীনগর প্রভৃতি স্থান আজমের প্রদেশে গৌড়দেরই ছিল। এখন মাত্র শ্রীনগর গৌড়দের অধিকারে আছে।

বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময় আসেরের দুর্গপতি গোপালদাস গৌড় একজন বিশিষ্ট যোদ্ধা ছিলেন। ইঁহার পুত্র বিঠ্‌ঠলদাস গৌড়সম্রাট সাজাহানের সময় মনসবদার ছিলেন। তাঁহার পুত্র ছিলেন যোদ্ধা অনিরুদ্ধ গৌড়। ইঁহার ভাই অর্জুন গৌড়ের হাতে রাঠোরের অমরসিংহ নিহত হন।

আসেরের গৌড়বীর বৎসরাজ যেমন মহাবীর তেমনই মহাদাতা ছিলেন। এইজন্য কথা আছে,

দৈঁতো অড়ব-পসার নিত ধিনো গৌড় বৎসরাজ।
গঢ় আজমের সুমেরুসূঁ উচো দীসে আজ॥

"যিনি নিত্য অর্বুদ মুদ্রা মূল্যের দান (পসার) বিতরণ করিতে পারিতেন ধন্য সেই গৌড়বৎসরাজকে। তাঁহার ঔদার্যে আজ তাঁহার আজমের গড় সুমেরু হইতেও উন্নত মনে হয়।" গৌড়ীয়দের কথা যখন উঠিয়াছে তখন বেদের আলোচনার কথা ছাড়িয়া ন্যায়ের ক্ষেত্রের একটি গৌড়বংশীয় পণ্ডিতের একটু কথা বলা যাউক। ন্যায়মঞ্জরী রচয়িতা জয়ন্ত ভট্ট জন্মিয়াছিলেন গৌড়বংশীয় ভরদ্বাজ দ্বিজকুলে শক্তিবংশীয় চন্দ্রের পুত্র। ইনি বাচস্পতি মিশ্রের পরবর্তী এবং গঙ্গেশের পূর্ববর্তী[৭৬]। বাক্‌পতি মুঞ্জের নরওয়াল তাম্রশাসন নামক প্রবন্ধে শ্রীযুত কে এন দীক্ষিত মহাশয় বলেন, পরমার রাজত্বকালে বহু বাঙালী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ মালব দেশে বাস করিতেছিলেন। দক্ষিণরাঢ়ের বিল্বগবাস গ্রামের দোনকশর্মা তাঁহাদের মধ্যে একজন। তখন বরেন্দ্রের অন্তর্ভূক্ত বগুড়ায়ও বেদবিদ্যার বিলক্ষণ প্রচার ছিল। তাঁহারা অনেকেই সামবেদীয় ছান্দোগ্য শাখাশ্রয়ী।

অন্ধ্রপ্রদেশে গন্তুর জেলার পুরাকীর্তি অনুসন্ধানে একজন মহাপণ্ডিত বাঙালী গুরুর নাম পাওয়া যায়। তিনি আচার্যপ্রবর শ্রীবিশ্বেশ্বর শিবাচার্য। কাকতীয়, মালব, কলচুরী ও চোল প্রভৃতি বংশীয় রাজারা তাঁহার মন্ত্রশিষ্য।

১১৮৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১২৬২ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত মালকাপুর স্তম্ভলিপি অনুসারে দেখা যায় কাকতীয় রাজা গণপতি ও তাঁহার কন্যা রুদ্রাম্বা তাঁহার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শিবাচার্য তাঁহার স্বদেশ দক্ষিণ রাঢ় হইতে ত্রিশজন সামবেদী ব্রাহ্মণকে সেই দেশে লইয়া গিয়া বসতি করান। তাহা ছাড়াও তিনি অনেক বঙ্গদেশীয় আচার্য ও অধ্যাপককে সেই দেশে লইয়া যান।[৭৭]

কাকতীয় রাজা গণপতি শৈব আচার্য বিশ্বেশ্বর শিবকে দান করেন মন্দর গ্রাম। তাঁহার কন্যা রুদ্রাম্বা দান করেন বেলংপস্থংণ্ডিগ্রাম। উভয় গ্রামই কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণতীরস্থিত। বিশ্বেশ্বর শিব এইসব গ্রামের দ্বারা "বিশ্বেশ্বর গোলকি" (গোমলকী) নামে অগ্রহার স্থাপন করেন। বিশ্বেশ্বর শিবের আদি নিবাস ছিল গৌড়রাঢ়ের অন্তর্গত পূর্বগ্রামে।

শ্রীবিশ্বেশ্বরশিবমযুজচ্ছ্রীগৌড়চূড়ামণিঃ ॥[৭৮]

আচার্য বিশ্বেশ্বর ছিলেন,

গৌড়দক্ষিণরাঢ়ীয়পূর্বগ্রামসমুদ্‌ভবাঃ ॥[৭৯]

এইখানে বেদবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকিলেও একটি কথা উল্লেখ করা

আবশ্যক মনে করি। বিশ্বেশ্বর শিবাচার্য ঐ গ্রামগুলির আয়কে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া এক-একটি ভাগ এক-এক প্রকার সৎকার্যের জন্য দান করিতেন। এক ভাগের আয়ে দীন দুঃখীর জন্য অন্নসত্রের, এক ভাগের আয়ে আরোগ্যশালার ও আর এক ভাগের আয়ে প্রসূতিশালার ব্যয় নির্বাহ করা হইত। সেই যুগে আর কোথাও কেহ প্রসূতিশালার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না। ধর্মের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত মঠের আয় হইতে হাসপাতাল ও প্রসূতিশালা স্থাপন করিয়া তখনকার যুগে এই বাঙ্গালী পণ্ডিত একটি অপূর্ব কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন।[৭০]

তেলেগু কাব্য, সোমদেব বাজিয়ম্ গ্রন্থে এবং প্রতাপ চরিতম্ আখ্যানে[৭১] একজন শিবদেবয়্য পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন রাজা গণপতিদেবের পরামর্শ গুরু। বিশ্বেশ্বর শিব ও এই শিবদেবয়্য অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়।[৭২]

প্রায় সাড়ে নয়শত বৎসর পূর্বে তাঞ্জোরের বিখ্যাত রাজরাজেশ্বর মন্দির নির্মিত হয়। মন্দির নির্মাতা রাজরাজের পুত্র রাজেন্দ্রদেবের রাজত্ব কালে যে দানের কথা পাওয়া যায় তাহাতে গৌড়দেশের শৈবাচার্যগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। শর্বশিবের পরিবারের গৌড়ীয় গুরুগণ রাজার দানের যোগ্য গুরু বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। গৌড়দেশ হইতে বহু শৈব আচার্য দক্ষিণ ভারতে গিয়া শৈবধর্ম প্রচার করিয়াছেন। বেদাচার্যদের মধ্যে তাঁহাদের কথা না বলিয়া অন্য প্রকরণে বর্ণিত হইবে।[৭৩]

গঞ্জামে প্রাপ্ত রাজা আনন্দ বর্মদেবের (৭০০ খ্রীঃ) এক লেখানুসারে দেখা যায় কামরূপীয় একজন ব্রাহ্মণকে রাজা ভূমিদান করিতেছেন।[৭৪]

বাংলা দেশের বাহিরে বাঙালী বেদজ্ঞদের এই যে সম্মান তাহার কারণ হইল বাংলা দেশের মধ্যে তখন বেদবিদ্যার বিলক্ষণ চর্চা ছিল।

প্রমাণ-পঞ্জী

১ পদ্মপুরাণ, উত্তর, ১৮৯ অধ্যায়

২ জার্ণাল অব ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ, বিংশ খণ্ড, চতুর্থ উদ্ধৃতি

৩ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী : ভারতবর্ষ, ১৩৪১, ভাদ্র, পৃ ৪০৮

৪ সরস্বতী ভবন গ্রন্থমালা, চতুর্থ খণ্ড, নং ৪, পৃ ১২৩

৫ গায়কোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজ নং ২৪

৬ হিন্দু রিলিজিয়ন—১৮৯৯, পৃ ৯

৭ নির্ণয় সাগর, কাব্যমালা গ্রন্থাবলী, পৃ ২২
৮ সরস্বতী ভবন স্টাডিস-ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ ১৬৭
৯ সরস্বতী ভবন স্টাডিস-ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ ১৬৮
১০ সরস্বতী ভবন স্টাডিস-ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ ১৭৭
১১ এস. বি. টি. নং ৫১
১২ বলদেব ছিলেন উৎকলীয়। তাঁহাকে গৌড়ীয় মতেরই বলা হয়।
১৩ রামপাল কপারপ্লেট অব শ্রীচন্দ্র, পৃ ৫ (শাসনপংক্তি ২৭-৩০)
১৪ শাসনপংক্তি ৩৭-৪১
১৫ শাসনপংক্তি ৪৯-৫২
১৬ শাসনপংক্তি ৪০-৪৩
১৭ শাসনপংক্তি ৪১-৪৫
১৮ পংক্তি ৪৫-৪৮
১৯ পংক্তি ৬২-৬৪
২০ পংক্তি ২৯-৩১
২১ পংক্তি ২২-২৪
২২ পংক্তি ১১-১৩
২৩ পংক্তি ১৯-২১
২৪ পংক্তি ৫৩-৫৬
২৫ পংক্তি ৪৭-৫০
২৬ পংক্তি ৪২
২৭ পংক্তি ৪৩, ৪৬
২৮ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ ৩৭
২৯ বল্লাল চরিত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, অধ্যায় ১২, ৪৮
৩০ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, পঞ্চদশ খণ্ড, পৃ ৫৫
৩১ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, পৃ ১৪১, ১৫৫ ইত্যাদি
৩২ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, পৃ ১৫৯
৩৩ ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৪৪, পৃ ২৬৭
৩৪ ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়্যারি, সেপ্টেম্বর ১৮৮৩, পৃ ২৫১
৩৫ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, একাদশ খণ্ড, পৃ ২৬৪
৩৬ এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন এণ্ড এথিক্স, নবম খণ্ড, পৃ ৫৬৬
৩৭ জার্ণাল অব এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, পঞ্চম খণ্ড, পৃ ৩৮৩
৩৮ জার্ণাল অব আমেরিকান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটি, সপ্তম খণ্ড, পৃ ৩২
৩৯ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, বিংশ খণ্ড, পৃ ১৩০
৪০ আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ময়ূরভঞ্জ, পরিশিষ্ট, পৃ ১৭৬

৪১ আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ময়ূরভঞ্জ, পরিশিষ্ট, পৃ ১৫৩
৪২ সিংঘী জৈন গ্রন্থমালা—রামচন্দ্র প্রবন্ধ, পৃ ৯৭
৪৩ সিংঘী জৈন গ্রন্থমালা, দ্বিতীয় খণ্ড, নং ২৫৮, ২৫৯, পৃ ৭৭
৪৪ সিংঘী জৈন গ্রন্থমালা, ষষ্ঠ গ্রন্থ, পৃ ৬৭-৭১, ৫৮৬১
৪৫ প্রবন্ধকোষ—হর্ষবর্ধন প্রবন্ধ
৪৬ নৈষধ চতুর্দশ খণ্ড, ৫১
৪৭ পৃ ১৭১ পাদটীকা
৪৮ চতুর্দশ খণ্ড, ১৪
৪৯ চতুর্দশ খণ্ড, ৫১ টীকা
৫০ পঞ্চদশ খণ্ড, ১২
৫১ নৈষধ পঞ্চদশ খণ্ড, ১২
৫২ পঞ্চদশ খণ্ড, ৬০, ৭০
৫৩ ষোড়শ খণ্ড ৪৬
৫৪ নৈষধ চতুর্দশ খণ্ড, ৭০
৫৫ শিরং স্ম সিন্দুবম্—পঞ্চদশ খণ্ড, ৫৫
৫৬ ছান্দোগ্য ৩, ১৯, ৩
৫৭ বিরাট, ২, ২৭, ১১, ১
৫৮ জগেন্তু চরিত
৫৯ নৈষধ ১৯, ৫৭
৬০ পৃ ১৮৪-১৮৮
৬১ পৃ ১৮২-১৮৩
৬২ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ ৬
৬৩ সেন্সাস রিপোর্ট ১৯৩১, প্রথম খণ্ড, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, পৃ ৪৭১-৭২
৬৪ রাজপুতানেকা ইতিহাস, পৃ ২৪৩
৬৫ রাজপুতানেকা ইতিহাস, পৃ ২৪৪-২৪৫
৬৬ স্তায়মঞ্জরী ভূমিকা গঙ্গাধর শাস্ত্রী বাঃ ১
৬৭ মলাকাপুরম্ স্টোনপিলার ইন্‌স্ক্রিপশান অব রুদ্রাম্বা, জার্ণাল অব অন্ধ্র হিস্টোরিক্যাল রিসা[র্চ]
সোসাইটি, চতুর্থ খণ্ড
৬৮ শাসনপংক্তি ৪১-৪২
৬৯ শাসনপংক্তি ৬২-৬৩। জার্ণাল অব অন্ধ্র হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ সোসাইটি, চতুর্থ খণ্ড এব
কাকাটিয়া সংক্ষিকা, পৃ ১৪৮
৭০ প্রবাসী ১৩৩৮, পৃ ৫৭৭
৭১ জার্ণাল অব জেকোেগু একাডেমি, নবম খণ্ড
৭২ জার্ণাল অব অন্ধ্র হিস্টোরিকাল রিসার্চ সোসাইটি, পৃ ১৫২-১৫৩
৭৩ সাউথ ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্ক্রিপশান প্রথম খণ্ড পৃ ৫৯, দ্বিতীয় খণ্ড পৃ ৩১
৭৪ যোগেশচন্দ্র ঘোষ : জার্ণাল অব আসাম রিসার্চ সোসাইটি তৃতীয় খণ্ড

ঘরে ও বাহিরে বাংলার বৌদ্ধমত

প্রদীপের পরিচয় তাহার আলোকে অর্থাৎ দীপের মাটির পাত্রের বাহিরে। বঙ্গের বৌদ্ধধর্মের কথাতে তাই বাংলার ভিতরের বৌদ্ধ কথার আলোচনা না করিয়া বাংলায় বৌদ্ধমত যে নানা দেশে ছড়াইয়াছে তাহারই কথা প্রথমে বলা ভাল। বাংলার মধ্যে বৌদ্ধপ্রভাবের কথা বহু বহু প্রখ্যাত পণ্ডিত প্রভূত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রসারে বাংলাদেশ যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। বিজয়সিংহের কথা সর্বজন-বিদিত।

খনার বচন বলিয়া যাঁহার খ্যাতি, সেই খনা নাকি সিংহল উপনিবেশের বঙ্গকন্যা। তবে এইসব কথা জনশ্রুতি মাত্র। আমাদের সকল গল্পের সদাগর পুত্রেরাই তো জাহাজ লইয়া বাণিজ্যে যান সিংহলে। শ্রীমন্ত তো সিংহল-রাজকন্যা সুশীলাকে বিবাহ করিয়া দেশে লইয়া আসিলেন।

সিংহলের রাজা প্রক্রমবাহুর (১২৪০-১২৭৫) সময়ে বাংলার বরেন্দ্র দেশ হইতে মহাপণ্ডিত বৈষ্ণব বংশীয় রামচন্দ্র কবি ভারতী সিংহলে যান। তাঁহার নিজ লিখিত পরিচয়—

> ভারদ্বাজকুলোদ্ভবাভিজননী দেবীতি নাম্নী সতী
> শ্রীকাত্যায়নবংশজো গণপতি ধীমান্ পিতা মে প্রভুঃ।
> সোদর্যৌ চ হলায়ুধশ্চ গুণিনবাঙ্গীরসশ্চানুজৌ—
> গ্রামো মে চিরবাটিকোঽত্থবিবুধানন্দো মুকুন্দাশ্রমঃ ॥

অর্থাৎ বৈষ্ণব ও পণ্ডিতবহুল চিরবাটিক গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতার নাম গণপতি, মাতার নাম দেবী। হলায়ুধ ও আঙ্গীরস দুই ছোট ভাই।

সিংহলে গিয়া রামচন্দ্র বৌদ্ধ হন ও ভক্তিশতক নামে কাব্য রচনা করেন। ছন্দঃ শাস্ত্রে তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার স্বরচিত বৃত্তমালা এবং কেদার ভট্টের বৃত্তরত্নাকরের সুবিখ্যাত টীকা পঞ্জিকা তিনি রচনা করেন। প্রক্রমবাহু রামচন্দ্রকে "বুদ্ধাগম চক্রবর্ত্তী" উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহার নাম আজও সিংহলে পূজিত। বিত্তরত্নাকরের পঞ্জিকায় জানা যায় তিনি "গৌড়দেশ বান্ধবা" এবং ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহলে উপস্থিত হন।

এইখানেই বাঙ্গালী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের কথা উল্লেখ করা উচিত। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চর্যাপদগুলি এবং শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচীর দোহাকোষে এইরূপ বহু পদ ও পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। ইহাদের সময় মোটামুটি দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব বলেন লুই পাদ প্রভৃতির সময় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী। মৈথিল পণ্ডিত জ্যোতিরীশ্বর কৃত বর্ণনা রত্নাকরে বাঙ্গালী সিদ্ধাচার্য দারিপা, বিরূপ, জালন্ধর, কাহ্ন, ধেন্দন ভাদে, কামলি, শবর, শান্তি, চাটল, গণ্ডি প্রভৃতি নাম পাই। এই গ্রন্থখানি চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদের রচিত [১]।

পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের মতে বৌদ্ধ মহাপণ্ডিত দার্শনিক শান্ত রক্ষিত ছিলেন বাংলা দেশের লোক। ইনি আচার্য শঙ্করের পূর্ববর্তী এবং বিক্রমশিলায় আচার্য ছিলেন। নেপাল রাজার প্রার্থনায় তিনি ভারত হইতে তিব্বতে যান। তিনি বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ লেখেন। তাহার মধ্যে তত্ত্ব সংগ্রহ গ্রন্থখানি বডোদা ষ্টেট লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তিব্বত, নেপাল ও বাংলাদেশে বৌদ্ধমত প্রচারে ইহার গ্রন্থ বহু সাহায্য করিয়াছে।[২]

বৌদ্ধাচার্য শীলভদ্র

বাংলা দেশের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের মধ্যে আচার্য শীলভদ্রের নাম চিরস্মরণীয়। তিনি বাংলা দেশের সমতটের এক রাজপুত্র। জাতিতে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মনীষা ও বিদ্যানুরাগ ছিল অসাধারণ রকমের। ত্রিশ বৎসর বয়সে নালন্দায় আসিয়া সেখানকার সর্বাধ্যক্ষ বোধিসত্ত্ব ধর্মপালের শাস্ত্রজ্ঞান ও ধর্মজীবন দেখিয়া শীলভদ্র তাঁহার শিষ্য হইলেন। ধর্মপাল তাঁহার সমস্ত জ্ঞান অতি অল্পদিনের মধ্যেই শীলভদ্রকে দিতে পারিলেন এমন অপূর্ব মনীষা ছিল শীলভদ্রের।

একবার এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ধর্মপালকে বিচারে আহ্বান করিলে শীলভদ্র গুরুর বদলে স্বয়ং গেলেন এবং দিগ্বিজয়ীকে দুই চারি কথায় একেবারে পরাস্ত করিয়া দিলেন। রাজা ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া শীলভদ্রকে একটি নগর দান করেন। শীলভদ্র সন্ন্যাসী, তিনি বিষয় লইয়া কি করিবেন তাই নগরের উপস্বত্বে তিনি একটি প্রকাণ্ড সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

চীন দেশের মহাপণ্ডিত যুয়ান-চুয়াং বা হিউয়েন সাঙ খ্রীষ্টীয় সপ্তশতকের প্রথমার্ধে শাস্ত্রশিক্ষার জন্য ভারতে আসেন। যুয়ান-চুয়াং নালন্দা বিহারে সর্বাধ্যক্ষ

শীলভদ্রের পাদমূলে বসিয়া ভারতের সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার সকল সন্দেহ দূর করিয়া গিয়াছেন। কাশ্মীর প্রভৃতি দেশের মহাপণ্ডিতেরাও যুয়ান-চুয়াং-এর যে সব সন্দেহ দূর করিতে পারেন নাই, তাহা শীলভদ্র দূর করিয়া দেন। শীলভদ্র মহাযান বৌদ্ধ হইলেও হীনযানী সব শাস্ত্রে ও ব্রাহ্মণদের সর্বশাস্ত্রে পরমপণ্ডিত ছিলেন। তিনি যুয়ান-চুয়াংকে বেদও অধ্যাপন করেন। শীলভদ্র অতিশয় উদার ছিলেন। চীন-জাপান-কোরিয়া প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে তাঁহারও কৃতিত্ব কম নহে; বহু গ্রন্থও শীলভদ্র রচনা করিয়া গিয়াছেন।

তিব্বতে

তিব্বতে প্রাচীনকালে যে বহু বাঙ্গালী গিয়াছেন তাহা সর্বজনবিদিত। দীপঙ্করের নাম সবারই জানা এবং নিশ্চয় বহুবার তাঁহার নাম হইয়াছে। তিনি ছাড়াও বহু বাঙ্গালী পণ্ডিত সেইদেশে গিয়াছেন। একজন মহাসিদ্ধার নাম অভয়াকরগুপ্ত। নবম শতাব্দীতে তিনি গৌড়ের নিকট জন্মগ্রহণ করেন। যখন ইসলাম ধর্ম আসিতেছিল তখন তিনি বৌদ্ধধর্মের জন্য আজীবন প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন।[৩]

রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস প্রভৃতির লেখা কর্দিয়ে সাহেবের তিব্বতীয় গ্রন্থাবলীর রচয়িতাদের নাম-সূচী দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। এখন আমার বন্ধুপ্রবর শ্রীরাহুল সংকৃত্যায়ন, অধ্যাপক তুচী, শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, ভি ভি গোখলে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য, শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যে কাজ করিতেছেন তাহাতে আরও বহুনাম পাওয়া যাইবে। কাজেই আমি তিব্বতের কথায় আর আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইব না।

বাংলা বহুগ্রন্থ প্রাচীনকালে তিব্বতীয় ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে, এইটুকু মাত্র এইখানে বলিয়া রাখি। বৌদ্ধ আচার্য দীপঙ্করের সামান্য একটুমাত্র পরিচয় এখানে দিব।

বৌদ্ধ আচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গ বিক্রমপুরে। ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে রাজবংশে তাঁহার জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনি বিক্রমশীলা বিহারে আশ্রয় নেন এবং অল্প দিনেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়। সেই সময় সুমাত্রায় বৌদ্ধ মঠগুলিতে সংস্কারের প্রয়োজন হয়। সেখানে বৌদ্ধধর্মের সত্যগুলি ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিক্রমশীলা বিহার হইতে অতীশ প্রেরিত হন। সেখানে অতীশ সুন্দর ভাবে কার্য সম্পাদন করিয়া ফিরিয়া

আসিলে বিক্রমশীলা বিহারের সর্বাধ্যক্ষের পদে তিনি নির্বাচিত হন। বিক্রমশীলা অতি প্রখ্যাত বিদ্যাক্ষেত্র। নৈয়ায়িক রত্নাকর শান্তি বোধিচর্যাবতার পঞ্জিকাকার প্রজ্ঞাকর মতি ভিক্ষু ভট্টারশ্রী প্রভৃতি মহা মহা মনীষী এই বিক্রমশীলারই মানুষ।

দশম শতাব্দীতে তিব্বতে বোন্-পা ধর্মের প্রভাবে বৌদ্ধ ধর্ম ক্রমে কোণঠাসা হইয়া আসে। তাই ১০৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত নরপতি য়ে-শেস্-ওদ ১০৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অতীশকে নিমন্ত্রণ করিতে বিক্রমশীলা বিহারে লোক পাঠাইয়া দেন। অতীশ প্রথমে যাইতে চাহেন নাই। পরে যখন বুঝিলেন তিনি না গেলে বৌদ্ধধর্মের ক্ষতি হইবে তখন রাজি হইলেন। তিব্বতরাজ মহা সমারোহে তাঁহাকে নেপালের পথে তিব্বতে লইয়া যান। পথে অতীশ নেপালের স্বয়ম্ভুক্ষেত্র ও তিব্বতী বহু মঠে বিশ্রাম করিতে করিতে যান। কারণ তখন অতীশের বয়স ৭০ বৎসর। যে সব মঠে তিনি বিশ্রাম করিয়া যান এখনও তাহা তিব্বতীয় বৌদ্ধদের মহাতীর্থ। ৭০ বৎসর বয়সে তিব্বতে গিয়াও তিনি বহুশাস্ত্র অনুবাদ করিয়া ও রচনা করিয়া গিয়াছেন। বজ্রযান ও কালচক্রযানের তিনি একজন মহাগুরু তাঁহার অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে বোধিপথ প্রদীপ অন্যতম। তিনি কহ্-দম-প সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাতা। ১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। মরুপ ও সিদ্ধাচার্য এবং মহাকবি মিল-রস্‌পা (১০৩৮–১১২২) ইঁহার সমসাময়িক।[৪]

চীনে

চীন দেশেও প্রাচীনকালে বহু ভারতীয় পণ্ডিত গিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। বৃহত্তর ভারতের পরিচয়দাতাগণ তাঁহাদের নাম করিয়াছেন।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন কবিবর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমরা চীনদেশে যাই তখন নানকিনের নিকটে প্রখ্যাত জু সিয়া তুঙ্গ গিরিগুহায় দেখি ভারতীয় সব পণ্ডিতদের মূর্তি। একেবারে চাদর গায়ে দেওয়া বাঙ্গালী ভট্টাচার্য পণ্ডিতের মূর্তি। আমাদের সঙ্গে শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু ও অধ্যাপক শ্রীকালিদাস নাগ ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন "এই সব মূর্তি বাঙ্গালী না হইয়া যায় না।" নন্দবাবু তাহার সব স্কেচ নিলেন।

কবিবর রবীন্দ্রনাথকে পিকিং সহরে রাখিয়া আমরা তিনজন কয়েকটি স্থান দেখিতে বাহির হইলাম। নানাস্থান ঘুরিয়া ৩ই মে তারিখ আমরা বিখ্যাত কাইফং নগরে গেলাম। সেখানে একটি বিখ্যাত প্যাগোডা ১২ তলা উচ্চ।

তাহা সুং রাজাদের সময় (৯৬০-১২৮০) নির্মিত এবং মিং রাজাদের সময় (১৩৬৮-১৬৪৪) সংস্কৃত। মন্দিরটি বিরাট। তার গায়ে সব চীনামাটির রং-করা ইট। সেই ইটের মধ্যে এক জায়গায় দেখি কীর্তন চলিয়াছে। ঠিক বাংলা দেশের কীর্তন। কীর্তনীয়াদের কোমরে চাদর বাঁধা, কোঁচা ঝুলান, কারও কারও গায়ে চাদর, মাথায় ঝুঁটি, বাঁশী ধরিবার ভঙ্গীতে খোল করতালে কীর্তন বসিয়াছে।

চীনদেশের ধর্মমন্দিরে অর্হতদের সঙ্গে এদেশের দেবদেবী যথা মহাদেব, তারা, ভৈরব, স্কন্দ, বিনায়ক প্রভৃতির নানা মূর্তি দেখা যায়।

১২ই মে তারিখে পিকিং-এর নিকটে রূতাং স্সু অর্থাৎ পঞ্চচূড়া মন্দির দেখিতে গেলাম। মন্দিরটি বাংলার পঞ্চরত্ন মন্দিরের ভঙ্গীতে তৈরী। দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলাম। তারপর দেখি সেখানে আমাদের অক্ষরে লেখা সব মন্ত্র বা ধারণী। বুদ্ধমূর্তিগুলি বাংলা দেশের মত চাদর মুড়ি দেওয়া।

শেষে জানা গেল খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দক্ষিণবঙ্গের এক ধনী বৌদ্ধ পাঁচটি স্বর্ণনির্মিত বুদ্ধমূর্তি ও সিংহাসন লইয়া এদেশে আসেন। তাঁহার নাম নাকি "পণ্ডিত" (Bandida)। তখন সম্রাট ছিলেন মিং বংশীয় য়ুংলো (১৪০৩-১৪২৪)। মূর্তিগুলি তাঁহাকে উপহার দেওয়া হয়। তিনি সেগুলি এই মন্দিরে স্থাপন করান। এই মন্দিরটি সেই সাধুর নির্দেশ অনুসারে চীনদেশী ও তিব্বতী কারিগরদের দ্বারা রাজার ব্যয়ে নির্মিত। কি দুঃখে তিনি বাংলা দেশ ছাড়িয়া এই স্বর্ণ মূর্তিগুলি রক্ষা করিতে এই দেশে আসিলেন তাহা বলিতে পারি না তবে তিনি চীনদেশেই জীবন কাটাইয়া গেলেন। এই মন্দিরটি ১৪৭১ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট চেনহুয়ার সময় পুনরায় নির্মিত হয়। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে চিয়েনলুঙের সময় একবার সংস্কৃতও হয়। এইবার বোধ হয় যুদ্ধে ইহা নষ্ট হইয়া গেল।

এতক্ষণ তো বৌদ্ধযুগে বাংলা ও চীনদেশের কথা বলিলাম। এখন এই প্রসঙ্গেই এই যুগেও বাঙ্গালীরা যে চীনে গিয়া বসবাস করিয়াছেন তাহার কিছু কৌতূহলজনক খবর দিতে ইচ্ছা করি।

পিকিন থাকিতে শুনিলাম এখানে একজন বাঙ্গালী আছেন। বড়-আগ্রহ হইল তাঁহাকে দেখিতে। তিনি একজন বিহারবাসী মুসলমান। তিনি তাঁহার [illegible] কথা বলিলেন।

পিকিনে সত্যিই একজন বাঙ্গালী বহু পূর্বে ব্যবসা করিয়া অনেক টাকা রাখিয়া মারা যান। কিছু ভূ-সম্পত্তি ও তাহার উপর সিনেমা ও হোটেলও ছিল। তিনি

উইল করিয়া যান যে কোনো বাঙ্গালী সেখানে ঐ সম্পত্তি নিতে চাহিলে তাঁহাকে যেন দেওয়া হয় ; বাঙ্গালী তখন কই ? এই খবর পাইয়া বিহারবাসী আবদুলবারি, চীনের ইংরেজ দূতের কাছে তাঁহার পাসপোর্ট দেখাইয়া প্রমাণ করিলেন বিহার বাংলারই মধ্যে। তাই তিনিই এই বিপুল বিত্তের অধিকারী হইলেন। আমবা বাঙ্গালী বলিয়া তিনি আমাদের সহায়তা করিতেও উৎসুক ছিলেন। এখানে বলা ভাল চীনে শিখদেরও বাঙ্গালী বলে।

১৯২৪ সালের ১৯শে মে তারিখে আমরা চীনেব সুবিখ্যাত পণ্ডিত হু সীর সঙ্গে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের চীন সংস্কৃতি বিভাগের কাজ দেখিতে গেলাম। চমৎকার সব কাজ করিতেছেন দেখিলাম। নানা কাজের মধ্যে দেখিলাম পুরাতন সরকারী কাগজ পত্রেব ৮০০০ বস্তা ইহারা পুবাতন কাগজের দরে কিনিয়া তার মধ্যে অমূল্য সব ঐতিহাসিক দরকারী কাগজপত্র পাইয়াছেন। তার মধ্যে কয়েকটি তাঁহাদের দুর্বোধ্য কাগজ দিলেন। কয়েক টুকরা বাংলাজীর্ণ কাগজ। অনেক অংশ ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। নেপালের বঙ্গসীমা হইতে আগত দরখাস্ত হইবে। একটি হিন্দী অক্ষরে লেখা সুলিখিত দরখাস্ত নষ্ট হয় নাই। পর্গনা মেল্যাপুর কোতিপুব হইতে শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীচীন রাজচক্রবর্তীকে ১৮২৮ সংবতে লেখা। নেপালের রাজার বিচারে অসন্তুষ্ট হইয়া চীন রাজার কাছে আরজি।

কোরিয়া জাপানে

কোরিয়াতেও নাকি বাংলা তন্ত্রধারণী বা মন্ত্র দেখা গিয়াছে, আমি নিজে সেখানে যাই নাই।

জাপানে নারা ও হরিউজীতে যে সব চিত্র ও মূর্তি আছে আচার্য নন্দলাল বসু বলেন সেগুলি বাংলার সঙ্গেই মেলে। সেখানকার বহু বুদ্ধমূর্তির আশেপাশে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে ধারণী ও বীজ লেখা।

কিয়োটোতে ওতানী বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ সংগৃহীত আছে। তাহা আমি নিজে দেখিয়া আসিয়াছি। নারাতে ও হরিউজীতে অসংখ্য হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি আছে। এখানে সিংহবাহিনী মূর্তি দেখিলে মনে হয় যেন বাংলা দেশের কোনো পূজার দালানে আসিয়াছি।

১৯২৪ সালে ৮ই জুন তারিখে আমি বিশেষ করিয়া জাপানে কোয়াসান তীর্থ দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে পর্বতের চূড়ায় নাকি দশ হাজার মন্দির আছে

মোটকথা কোয়াসান হইল জাপানী বৌদ্ধদের গয়াকাশী। এই তীর্থের আদিগুরু কো-বো-দাইশি ছিলেন তান্ত্রিক সাধক। তাঁহাদের স্থণ্ডিল ও যন্ত্র দেখিলাম বাংলার সঙ্গেই মেলে। তিনিও এই দেশীয় বিশুদ্ধ তন্ত্রমতেই দীক্ষিত। এখানে লোকেরা পরলোকগত আত্মীয়জনের শ্রাদ্ধ করেন এবং অস্থি পবিত্র কোয়া নদীতে নিক্ষেপ করেন। তাহার পরে সেখানে যে কাষ্ঠ প্রোথিত করেন তাহা এই আমাদের দেশেরই বৃষকাষ্ঠ। তাঁহাতে যে সব অক্ষর লিখিয়া দেন, তাহাও আমাদের দেশেরই মত, নিজেরা তাহা বুঝেন না।

যবদ্বীপে বালিতে সুমাত্রায়

যবদ্বীপ, বালি, সুমাত্রা প্রভৃতি সকল দেশ চিরদিন ভারতবর্ষকে গুরু বলিয়া মানিয়া আসিয়াছেন। ভারতে সমুদ্রযাত্রা যখন হঠাৎ বন্ধ হইল তখনও বহুদিন পর্যন্ত ঐসব দেশবাসীরা ভারত হইতে গুরুদের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বহুদিন চলিয়া গেল লোকে ভারতীয় গুরুদের বেশ ও ভাষা বিস্মৃত হইলেন তবু ভারতের দিকে মুখ করিয়া ব্যর্থ প্রতীক্ষায় দিন কাটাইতে লাগিলেন। এমন সময় আরব দেশীয় মুসলমান প্রচারকেরা প্রচার করিতে আসিয়া দেখিলেন ইহারা চান ভারতীয় গুরু। তাই তাঁহারা বলিলেন "আমরাই সেই দেশের গুরু।" তখন লোকেরা তাঁহাদের স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন বটে কিন্তু তাহাদের রীতিনীতি ভিন্ন রকম দেখিয়া সম্পূর্ণ স্বীকার করিলেন না। বলিদ্বীপবাসীরা একেবারেই তাঁহাদিগকে স্বীকার করিলেন না। তাঁহারা বিশুদ্ধ শৈবই রহিয়া গেলেন। যবদ্বীপের পশ্চিমে এখনও কিছু শুদ্ধ হিন্দু আছেন। তাঁহারা দুর্গম অরণ্যে ও পর্বতে বাস করেন। কাহারও সঙ্গে মেশেন না। তাঁহারা তাই এখনও রামায়ণ মহাভারত লইয়া জীবন যাপন করেন, উৎসবাদিতে শিবদুর্গা স্মরণ করেন, তবে বিবাহ ও শ্রাদ্ধের সময় ইসলাম গুরুদের আশীর্বাদ লইতে আসেন। এখনও তাঁহারা নিজেদের অর্জুন, বলরাম প্রভৃতির বংশধর মনে করেন। কোনো গানের আসরে বা যাত্রায় বলরামের নিন্দা হইলে বলরাম বংশীয় (?) মদুরাবাসিগণ ক্ষেপিয়া ওঠেন।

সুমাত্রা যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপে যখন ভারতীয় সভ্যতা গিয়াছিল তখন সেই সব দেশের বিশেষ যোগ ছিল বাংলা দেশের সঙ্গে। ডি, আর, ভাণ্ডারকর মহাশয় এই কথাটিতে জোর দিয়া লিখিয়াছেন।*

বোম্বাই গেজেটিয়ারও এই কথায় সায় দেন (প্রথম খণ্ড পৃ ৪৯৩)। যবদ্বীপে "অ"কারের উচ্চারণ ঠিক আমাদের বাংলাদেশের মত "ও"কার ঘেঁসা অর্থাৎ

হিন্দীতে যাহাকে বলে "গোল গোল"। বরবুদুর প্রভৃতি মন্দিরের গঠনপ্রণালী বাংলা দেশের পাহাড়পুরের সঙ্গে কিছুটা মেলে। পাহাড়পুর প্রাচীনতর।

যবদ্বীপ ও বাংলার সম্বন্ধ বিষয়ে একটি ভাল প্রবন্ধ দেখিলাম। শ্রীহিমাংশুভূষণ সরকারের লেখা।[৭]

যবদ্বীপের পূর্ব-নাগরী লেখগুলির লেখার মিল দেখা যায় বাংলা দেশের ধর্মপাল দেবের খালিমপুর লিপির, দেবপালের মুঙ্গের ও নালন্দা লিপির সঙ্গে।

যবদ্বীপে কেলুরকে একটি শিলা লেখ (৭৮২ খ্রীঃ) পাওয়া যায় তাহাতে গৌড়দ্বীপের গুরুর কথা লিখিত আছে। এই গুরু হয়তো সেই লেখেই বর্ণিত কুমারঘোষ। বরবুদুরের বৌদ্ধধর্মের মধ্যে বাংলাদেশের বজ্রযান মন্ত্রযান, ও তন্ত্রযান মিশ্রিত ছিল। বাংলাদেশে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে এইসব মতের

যবদ্বীপের ও বাংলার প্রাচীন শিল্পের মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য দেখা যায়। বরবুদুরের শিলালিপিতে জাহাজের যে নমুনা দেখা যায় তাহা বাংলার জাহাজের সঙ্গেই মেলে। মহাস্থান ও পাহাড়পুরের মন্দির গঠন রীতির সঙ্গে যবদ্বীপের বরবুদুর ও চণ্ডীসের মন্দিরের গঠনের সাজাত্য আছে।

১৯৩১ সালে লেভি সাহেব দেখাইয়াছেন যে পুরাতন যবদ্বীপীয় মহাভারতে অনেকগুলি শ্লোক বঙ্গীয় কবি ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার নাটক হইতে গৃহীত। বেণীসংহার প্রভৃতি নাটকের মধ্য দিয়া বঙ্গদেশ হয়তো বা কতকপরিমাণে যবদ্বীপীয় নাটকের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

যবদ্বীপের য়ায়াং ছায়ানাট্যের কথায় বাংলারও উল্লেখ আছে। বাংলাদেশেও এইরূপ নাট্য ছিল। মালাবারের পাভাকুট্টুর সঙ্গে তাহার যোগ আছে।[৮]

১০১৫ খৃষ্টাব্দে লেখা নেপালের পুঁথিতে যবদ্বীপ দীপঙ্কর চিত্র পাওয়া গিয়াছে। দীপঙ্করের জন্ম পূর্ববঙ্গে (৯৮০ খ্রীঃ), সুবর্ণদ্বীপে অর্থাৎ সুমাত্রায়। তিনি বার বৎসর ধর্মকীর্তির কাছে শিক্ষা করেন। সেই সময়ে নিশ্চয় আরও বহু বাঙ্গালী পণ্ডিত সে দেশে যাতায়াত করিয়াছেন। যবদ্বীপে প্রাপ্ত দ্বাদশ শতাব্দীর তূণবিন্দু মূর্তিগুলিতে সেই সময়কার বঙ্গাক্ষরই উৎকীর্ণ পাওয়া যায়।

চতুর্দশ শতাব্দীতে মাজাপাহিত সাম্রাজ্যের যখন দেশে বিদেশে প্রতিপত্তি, তখন রাজকবি প্রপঞ্চ তাঁহার নাগর কৃতাগম রচনা করেন। তাহাতে জম্বুদ্বীপ কর্ণাটক ও গৌড়ের উল্লেখ আছে।

[illegible] ১৩৪৪ সালের [illegible][৯] দেখা যায় যে বৌদ্ধমঠ পর্যবেক্ষক নামের চাত্র

ছিলেন ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন। চান্দ্র রচয়িতা চন্দ্রগোমী ছিলেন বরেন্দ্রবাসী। চতুর্দশ শকাব্দীতে, তিব্বত, নেপাল, সিংহল, যবদ্বীপে তাঁহার ব্যাকরণের যথেষ্ট সমাদর ছিল।

বাংলাদেশের গল্প ও উপকথার সঙ্গে যবদ্বীপের গল্প ও উপকথায় যথেষ্ট মিল দেখা যায়।

শ্যাম চম্পা

শ্যাম দেশেও হিন্দু দেবদেবীর পূজা প্রচলিত। হিন্দু আচার বিচার ব্রত নিয়ম উপবাস এখানে পালিত হয়। এখানে ব্রাহ্মণ আছেন। এখানে "পৌনারা"ও আছেন। ব্রহ্মদেশের বিবরণে পৌনাদের কথা বর্ণিত হইবে। ব্রাহ্মণ এখানে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের আচার্য বা আচাল বলে। তাঁহারা বঙ্গদেশীয় পদ্ধতিতেই জ্যোতিষগণনা করেন। অর্থাৎ তাঁহাদের জন্মকোষ্ঠী অষ্টোত্তরী রীতিতে রচিত হয়, বিংশোত্তরী পদ্ধতি এখানে নাই। পৌরাণিক দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও বৈদিক অগ্নি বায়ু বরুণ সমান ভাবে অর্চিত হয়। আচার্যেরা অনেকেই সৌর উপাসক। এখানকার নদীর নামও হিন্দু। শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে নদীতে যাইতে হয়। অঙ্কোরবট মন্দির দ্বারে নাকি বঙ্গাক্ষরে শ্লোক লিখিত আছে। ঐতিহাসিক বাউরিং বলেন "শ্যামদেশীয়রা গঙ্গাতট, খুব সম্ভব বাংলা হইতে আগত। তাঁদের চেহারা বাঙ্গালীর মত, বাংলার সঙ্গে তাহাদের বাণিজ্যাদি যোগ ছিল। বঙ্গবণিকদের সন্ততি এখনও ঐসব দেশে আছে।"[১০] ধর্মানন্দ মহাভারতী আসাম রাজ্যে বাংলার সব যোগচিহ্ন দেখিয়াছেন।[১১]

মহাপ্রাচ্যে ধর্মপ্রচারের সুফল

বাংলা দেশের শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মগুরুগণও যথেষ্ট উদার। তাঁহারাও সেই যুগে ঐ সব দেশান্তরে ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। বৌদ্ধদের তো প্রচারে কোনো বাধাই নাই। তাই ভারতের পূর্বদিকটা ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার যোগে ভারতের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে বদ্ধ হয়। একবার বিশ্বভারতীতে বক্তৃতাকালে আচার্য সিলভ্যাঁ লেভি মহাশয় বলিতেছিলেন, বাংলাদেশ ভারতের পূর্বদেশগুলিকে ধর্ম ও সংস্কৃতি দান করিয়া আপন করিয়া দেশকে ঐ দিক দিয়া নিরাপদ করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতের পশ্চিম দিকে ছিলেন জৈনরা, তাঁহারাও যদি ভারতের পশ্চিম সব দেশে তেমন করিয়া ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচার করিতে পারিতেন তবে ঐদিক হইতে ভারতের আর কোনো বিপদের শঙ্কা থাকিত না।

ব্রহ্মদেশে

ব্রহ্মদেশেও বৌদ্ধধর্ম গিয়াছিল এবং তাহাতে বাংলা দেশের সঙ্গেও যোগ ছিল। ব্রহ্মদেশে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মও প্রবেশ করে, তাহাতেও বাংলার আচার্যগণের হাত ছিল। ব্রহ্মদেশের কল্যাণীর শিলা লেখ (১৪৭৬) অনুসারে বুঝা যায় গোলমট্টিকা নগর আসলে গৌড়দের মাটির বাড়ীর নগর, তৈকুলও গৌড়দের উপনিবেশ। এই সব সংবাদ দিয়াছেন সেই দেশের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্তা তাও-সেন-কো। ইণ্ডিয়ান এনিটকারী ১৯শ, ২১শ, ২৩শ, ৩২শ, ৪২শ খণ্ডে এই বিষয়ে যথেষ্ট সংবাদ পাওয়া যায়।

বাঙ্গালী মুসলমান ব্রহ্ম শ্যাম প্রভৃতি দেশে বিস্তর বসবাস করিতেছেন। তাঁহাদের সে দেশে বিবাহাদি করিবারও বাধা নাই।

ব্রহ্মদেশে সেই যুগের পরে আর এক শ্রেণীর বাঙ্গালী গিয়াছেন, তাঁহাদের নাম পৌনা। পৌনা শব্দ কেহ বলেন "পাবন" কেহ বলেন "ব্রাহ্মণ" হইতে উদ্ভূত। চারিশত বৎসর পূর্বে অনেক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আরাকান পথে ব্রহ্মদেশে যান। তাঁহারা ব্রাহ্মণের আচার প্রতিপালন করেন। তন্ত্রে ও জ্যোতিষে তাঁহাদের বিলক্ষণ অধিকার, তাই ব্রহ্মে, শ্যামে এবং কম্বোডিয়ায় পর্যন্ত তাঁহাদের সমাদর।

পরে ব্রহ্ম রাজারা মণিপুর জয় করিয়া কয়েক ঘর মণিপুরী ব্রাহ্মণ ধরিয়া লইয়া যান। তাঁহারাও পৌনা। রেশমের কাজ করিতে জানেন বলিয়া তাঁহাদের আদর ছিল। তাঁহারা পূর্বেই মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন অমরাপুর প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদের বসতি।

ব্রহ্মের রাজারা অনেক সময় বাঙ্গালী কারিকর বিশেষতঃ কামান ঢালাই কাজের শিল্পীদের লইয়া যাইতেন। পূর্বে ব্রহ্ম রাজার বাড়ীর কাছে একটি বৃহৎ কামানে বাংলা অক্ষরে ছিল "কালীকুমার দে"।

মাণ্ডেলেতে যে সব পৌনা আরাকান পথে গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সংস্কৃত পড়িতে নবদ্বীপ আসিতেন। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে পৌনা বংশীয় রাজবল্লভ চক্রবর্তী নবদ্বীপে পড়িতে আসেন। সেই সময়ে উলা গ্রামের মহামারীতে শান্তিপুরের পরম সাধক রাধিকানাথ গোস্বামী মহাশয় পিতৃমাতৃহীন হইয়া সতর বৎসর বয়সে নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি মদন গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের ছাত্র। উক্ত রাজবল্লভ চক্রবর্তী রাধিকানাথের

পিতা শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামীর শিষ্য। তিনি তাঁহার গুরুপুত্রের এইরূপ দুঃখ দেখিয়া নিজ দেশে লইয়া যান। সেখানে রাধিকানাথ ব্রহ্ম রাজার সভাপণ্ডিত হন। ব্রহ্মরাজ মিণ্ডোন তাঁহাকে রাজগুরু পদে বৃত করিয়া স্বর্ণপত্রে তাহা লিখিয়া দেন। সেই দেশে বহুলোক গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য হন। তিনি মহামারীর ভয়ে ব্রহ্মদেশ ছাড়িয়া দেশে আসেন ও বিবাহ করেন। আর একবার তিনি ব্রহ্মে গিয়াছিলেন বটে কিন্তু রাজা থিবোর সময়ে নানা রাষ্ট্রীয় গোলযোগে বহু সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া আসেন। বুদ্ধগয়াতে যে ব্রহ্মরাজার উপহৃত ঘণ্টা আছে তাহাতে ব্রহ্মাক্ষরে লেখা শ্লোকগুলি সব গোস্বামী মহাশয়ের রচনা। ব্রহ্মদেশে তাঁহার একজন পৌনা সহকর্মী ছিলেন। তাঁহার নাম অচিন্ত্য রাজগুরু। জ্যোতিষশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য বৃন্দাবনে এখন তাঁহার খ্যাতি। পৌনা বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবনে একটি মন্দির তৈয়ার করাইয়াছেন। অচিন্ত্য রাজগুরুকে সকলে বর্মী পণ্ডিত বলেন।

এই সব খবর আমি পাইয়াছি স্বর্গীয় রাধিকানাথ গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামীর কাছে। তিনি পূর্বে বিশ্বভারতীর ছাত্র ছিলেন, এখন তিনি শান্তিনিকেতনেরই একজন কর্মী। তিনিও ১৩৩১ সালে মাণ্ডেলে গিয়া তাঁহার পিতার শিষ্য সেবকদের দেখিয়া আসিয়াছেন।

এই পৌনারা সব সামবেদী। তাঁহারা বাংলা বলিতে পারেন, বাংলা ভাষায় লেখা ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন, বাংলা কীর্তন গান করেন। চীনদেশে আমাকে একজন একটি বাংলা অক্ষরে লেখা বই দেখান। কম্বোডিয়াতে একজন ব্রাহ্মণের কাছে তাহা পাওয়া। বোধ হয় সেই ব্রাহ্মণ পৌনা। গ্রন্থখানি দেখিলাম "গোবিন্দলীলামৃত"। বঙ্গাক্ষরে লেখা।

বাংলার সংস্কৃতির প্রসার

বাংলা দেশের সংলগ্ন যে সব দেশ যথা কোচবিহার, ভুটান, কাছাড়, মণিপুর সেই সব জায়গায় বাঙালী পণ্ডিতেরা হিন্দুধর্ম ও বাঙালী সংস্কৃতি উপস্থিত করিয়াছেন। পলাশীর যুদ্ধের পর যখন ইংরাজ রাজত্ব বাংলা দেশের চারিদিকে ছড়াইতে আরম্ভ করিল, তখন ভুটানের দেবরাজা, আসাম, মণিপুর, কাছাড়ের রাজন্যবর্গ কলিকাতায় লাটসাহেবের সঙ্গে বাংলাতেই কথাবার্তা চালাইতেন। কোচবিহারেরই বড়পুত্রের বংশীয়রা জলপাইগুড়ির রায়কত বংশ। রায়কতেরা কোচবিহারের সেনাপতির সন্তান। এক সময় কোচবিহারের মহারাজা ও

রায়কতদের মধ্যে বিরোধ ঘটে। তখন রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের মুখপাত্রও সব ছিলেন বাঙ্গালী, নাজির খগেন্দ্রনারায়ণের মুখপাত্রও ছিলেন বাঙ্গালী। কোচবিহারের উকিল সর্বনারায়ণ ঘোষের মহত্ত্বের কথা কমিশনার নর্ম্যান অ্যাকণিও ঘোষণা করিয়াছেন। একবার কোচবিহার ও ভুটানের রাজ্যসীমা লইয়া বিবাদ হয়। তখন উকিল কৃষ্ণকান্ত বসু ও রামমোহন রায় ভুটানের দেবরাজ দরবারে প্রেরিত হন। কৃষ্ণকান্ত ভুটানের একটি বিস্তৃত বিবরণ মুদ্রিত করেন পরে তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করা হয়। স্যার এস সি ইডেন এবং কাপ্টেন পেমবারটন প্রভৃতি রাজপুরুষগণও কৃষ্ণকান্তের বহু প্রশংসা করিয়াছেন। কোচবিহারের মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ বাঙ্গালী কর্মচারী দ্বারাই কাজ করাইতেন। একবার এক ইউরোপীয় দূত নিযুক্ত করিয়া তিনি প্রবঞ্চিত হন, তাহার পর তিনি দেশীয় মুখপাত্রদের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেন। আসাম দরঙ্গের রাজা কৃষ্ণনারায়ণও বরকন্দাজ বিদ্রোহের সময় কাপ্টেন ওয়েলসের কাছে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকেই দূতরূপে প্রেরণ করেন। কাছাড়ের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র বাংলা ভাষায় বাঙ্গালী দূতের সাহায্যে বড়লাটের সঙ্গে কাজ চালাইতেন। ইংরাজ কর্মচারীরাও এইসব বাঙ্গালী দূতের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন।[১২]

এই তো গেল রাজনীতিক্ষেত্রের কথা। ধর্মের ক্ষেত্রেও বাঙ্গালী গুরুগণ কম কাজ করেন নাই। কাছাড় মণিপুর প্রভৃতি স্থানে যখন হিন্দুধর্মের কথা কেহই জানেন না তখন বিনা অস্ত্রবলে ও বিনা লোকবলে এই সব গুরু অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। তখন সেই সব স্থানের প্রাচীন ধর্মের গুরুগণ তো সহজে তাঁহাদিগকে আপন আপন স্থান ছাড়িয়া দেন নাই তবু সেই সব নির্ভীক গুরুর দল প্রাণভয় তুচ্ছ করিয়া আপন কাজ করিয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভু চৈতন্যের জন্মেরও পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্বে অহোম রাজাদের সভায় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ গুরু ক্রমশঃ প্রতিপত্তি জমাইতে থাকেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের এক শতাব্দী পরেই অহোম রাজ প্রতাপ সিংহের সময়ে বাঙ্গালী গুরুদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে কাছাড়ের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাম্রগাভীর গর্ভে প্রবেশ করিয়া শুদ্ধ হন এবং হিন্দু ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সময়ে কাছাড়ে বহু বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান বসবাস করিতে আরম্ভ করেন।

বিদ্বদ্বর কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলেন প্রবাণ মণিপুর নৃপতি চিংথোম খোম্বার সময়ে শ্রীহট্টবাসী একজন বৈষ্ণব অধিকারী মাহিষ-বরাহ-কুক্কুট মাংসভোজী মণিপুরীগণকে পরম বৈষ্ণব করিয়াছিলেন। তাহা ১৭৫ বৎসর মাত্র

পূর্বে ঘটিয়াছে। জমেণ্ট সাহেব বলেন এই বৈষ্ণবীকরণ ঘটে আরও একটু পূর্বে চরাই রংবা রাজ্যশাসন কালে। তিনি ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

মণিপুর

মণিপুরে সর্বপ্রথম গিয়া পৌছে শৈব ধর্ম। মণিপুরী পুরাণে পুরাতন শৈবধর্মের কথাই পাওয়া যায়। অর্জুনের সঙ্গে মণিপুর রাজকন্যার বিবাহ উপলক্ষে একটা প্রাচীন আভিজাত্যের দাবীও মণিপুরীদের আছে।

তারপর মণিপুরে আসাম হইতে তান্ত্রিক ধর্ম প্রচারিত হয়। যে পূর্ণানন্দ ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে শাক্তাক্রম লেখেন ও ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীতত্বচিন্তামণি রচনা করেন, সেই মহাতান্ত্রিক পূর্ণানন্দই আসামের কামাখ্যা পীঠের পুনরুদ্ধার করেন। তিনি কিছুকাল মণিপুরে থাকিয়া সে দেশে তান্ত্রিক ধর্মের প্রচার করেন। সেই জন্য পৌনারা বৈষ্ণব হইলেও তাঁহাদের মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রচার আছে।

১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মণিপুরের মহাপুরুষ, খগেন্ বা সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া মণিপুর রাজ্যকে সর্বপ্রকার শিল্পে, বিজ্ঞানে ও সংস্কৃতিতে বিভূষিত করেন। ইঁহার রাজত্বকালে বহু চীন দেশীয় লোক মণিপুরে আসিয়া আশ্রয় লয়। তাহারা বারুদ, কামান, বন্দুক প্রস্তুত করিতে ও মাটির টালি প্রভৃতি তৈয়ার করিতে দক্ষ ছিল। রাজা খগেন্ বা তাহাদিগকে সমাদরে গ্রহণ করিয়া মণিপুরে সেই সব শিক্ষা প্রবর্তিত করেন। ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি মণিপুরে কামান বন্দুকের কারখানা স্থাপিত হয়। তাহাদের এই খ্যাতি ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মণিপুরীরা খুব দক্ষ শিল্পী। তাই ব্রহ্মের রাজারা মণিপুরী কামান-শিল্পীদের দেশে লইয়া যাইতেন।

মহারাজা গরীব নেওয়াজের সময় সন্ত দাস গোস্বামীর রামানন্দী মত মণিপুরে উপস্থিত হয়। সে দেশে রামচন্দ্র ও হনুমানের মূর্তি স্থাপিত হইল, এখনও তাহার পূজা চলে কিন্তু এই ধর্ম মণিপুরে বেশি দৃঢ়মূল হইল না।

এই সময়েই এই রামানন্দী মতের ও রামোপাসনার ঢেউ পশ্চিম প্রদেশ হইতে আসিয়া বাংলা দেশের ময়মনসিংহ জেলাতেও প্রবেশ করে। ময়মনসিংহ শেরপুর সহরে রঘুনাথজীর মন্দির তাহার সাক্ষী। সেখানে পূজারীরা পশ্চিম দেশবাসী। শেরপুরের জমীদারগণের বদান্যতায় রঘুনাথজীর মন্দিরের সেবা এতকাল উত্তমরূপে নির্বাহিত হইয়াছে।

ক্রমে মণিপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম গিয়া পৌঁছিল, কুঞ্জবিহারী, কৃষ্ণচরণ, গঙ্গানারায়ণ, নিধিরাম প্রভৃতি বহু ব্রাহ্মণ প্রচারকও সে দেশে গেলেন। রামগোপাল প্রভৃতি বহু বৈরাগী প্রচারকও ছিলেন। তাঁহারা প্রায় সব নরোত্তমেরই শিষ্য। নরোত্তমের গুরু লোকনাথ গোস্বামী। কাজেই ইঁহারা সব অদ্বৈত শাখার বৈষ্ণব।

১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে মণিপুরের রাজ আজ্ঞায় বৈষ্ণব ধর্মই রাজধর্ম রূপে গৃহীত হয়। মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র বাঙ্গালী গোস্বামীদের ধর্মপ্রচারে একেবারে বৈষ্ণব-ভাবে ভরপুর হইয়া যান। তিনি অকালে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে বাস করেন এবং সেখানেই দেহ রক্ষা করেন।

মণিপুরীদের মধ্যে বাংলা বৈষ্ণব গ্রন্থই আদৃত। বাংলা পদাবলী ঘরে ঘরে গীত হয়। রাস নৃত্য প্রভৃতিতে বাংলা গান প্রচলিত। রাস উৎসব ও মণিপুর কন্যাদের রাসনৃত্য সর্বত্র প্রসিদ্ধ।

মণিপুরে যে সব ব্রাহ্মণ বাস করেন তাঁহারা সেই দেশের কন্যা বিবাহ করেন। তাঁহাদের সন্তানরাই মণিপুরী ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের সব উপাধি বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণদেরই উপাধি। তাঁহাদের মধ্যে বঙ্গদেশীয় অন্যান্য জাতি ও উপাধিও আছে দেখিয়াছি। বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত হইবার পূর্বেই বহু বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সেই দেশে গিয়া বসবাস করেন। সেখানকার ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণ অত্যন্ত আচারনিষ্ঠ।

বাংলার বাহিরে বাংলার যোগী

যোগী এবং নাথধর্মে বাংলার যথেষ্ট দান আছে। তাঁহারা ভারতের মধ্যযুগের ধর্মের ইতিহাসে কতো যে সম্পদ দান করিয়াছেন তাহা তাঁহারাই জানেন না। তাঁহাদের পদ, ময়নামতী ও গোপীচাঁদের গান, মীন-গোরখী পদ সারা উত্তর ভারত এমন কি কচ্ছ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটেও গীত হয়। বাংলা নাথ ও যোগীদের অনুরূপ বাণী রাজপুতানা, যোধপুরে গির্ণার পর্বতে, আবু, এমন কি কচ্ছ দিনোধরেও গাহিতে শুনিয়াছি।

দাদূপন্থীদের সংগ্রহে বহু নাথ-পদ সংগৃহীত আছে। রাজপুতানায় একটি সংগ্রহে যে পদ আমি পাইয়াছি তাহার সঙ্গে পূর্ববঙ্গের নাথপদের হুবহু মিল আমার "দাদূ" পুস্তকের উপক্রমণিকায় ৩৮—৩৯ পৃষ্ঠায় তাহা আমি দেখাইয়াছি।

এই সব যোগীরা তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে ভারতের সর্বত্র যাইতেন। বেলুচিস্তানে

হিংলাজ যাত্রায় বাঙ্গালী যোগীকে যাইতে দেখিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে পূর্বে অনেকে পারস্য আরব প্রভৃতি দেশ হইয়া মিশর দেশে নীলনদে স্নান করিতে যাইতেন। এইরূপ ভারতীয় যোগীর সঙ্গে দেখা মুসলমান স্বাধীন চিন্তার গুরু আবুল আলা মু' অরীর (৯৭৩ খ্রীঃ) জীবনে ঘটে। সে কথা আমি আমার ঢাকার শিক্ষা সম্মিলনীর অভিভাষণে (১৩৪৪) বলিয়াছি। *

এই সব যোগীরা য়ুফ্রেটিস টাইগ্রিস নদীতে তীর্থস্নান করিতেন, বোগদাদ প্রভৃতি নগরে যাইতেন, মিশরের তীর্থস্থানগুলিতে যাতায়াত করিতেন। জুলনুন বা জুন্নুন হইলেন মিশরের সুফী যোগী, ভারতের যোগীদের সঙ্গে তাঁহার যোগ ছিল।

টলেমি নাকি তাঁহার অনেক খবর আলেকজেণ্ড্রিয়া নগরে এই সব ভারতীয়দের কাছে পান। সিরিয়া দেশে ভারতীয় জ্ঞানীদের লুসিয়ান দেখিয়াছেন। কুশদ্বীপের জ্বালামুখী তীর্থে অনায়াসা দেবীর স্থান, সেখানেও তাঁহারা যাইতেন। বাকু নগরে বহু ভারতীয় যোগী থাকেন। তাঁহাদেব মধ্যে একজন রুশ দেশের মস্কোর দিকে যান। রুশিয়ার লোকেরা তাঁহার কোনো অসম্মান করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের ঔৎসুক্য ও আগ্রহের আতিশয্যের জন্য তিনি ফিরিয়া আসেন।[২৩]

বাংলার যোগীরা এখন তাঁহাদের সব গ্রন্থ নষ্ট করিয়া শিবগোত্রীয় হইয়া হিন্দু সমাজে স্থান পাইবার চেষ্টায় আছেন। তাই বাংলার সব দাবী লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। এদিকে পঞ্চনদের কেহ কেহ দাবী করিতেছেন যোগী ও নাথ-পন্থের উদ্ভবভূমি হইল পাঞ্জাবে। তাঁহাদিগকে যোগ্য উত্তর দিবার পথ যোগীদের উত্তরাধিকারীরাই সযত্নে বন্ধ কবিয়া আনিতেছেন। নিজেদের পূর্ব-পুরুষের গৌরব নিজেরা যদি উচ্ছেদ করেন তবে কে আর কি বলিবে ?

বাঙ্গালী যোগী ও তান্ত্রিক সাধুদের বহু পুঁথি বাংলার বাহিরে এখনও রক্ষিত আছে। কাঠিয়াওয়াড়ের কয়টি প্রাচীন গ্রন্থাগারে আমি দেখিয়াছি। একটি তো শৈলা গ্রামের জৈন গ্রন্থভাণ্ডার। তাহাতে কি করিয়া এমন পুঁথি স্থান পাইল তাহা তো বুঝি না।

ঝিনোধরে ও গির্ণারের নিকট দামোদর কুণ্ডের তীরস্থ যোগীদের মঠে একখানা অদ্ভুত গ্রন্থ দেখিয়াছি। তাহার নাম "চৌরাশী ধাম যাত্রী পরচা"। অর্থাৎ ভারতের সর্বত্র যে যোগীরা আছেন, নানাস্থানে তাঁহাদের মঠ। তাহাদের মধ্যে কোন মঠ অধ্যক্ষশূন্য হইলে তাহার দাবীদারও জুটে। স্থানীয় লোক

হইলেই ভাল হয়। তাই দাবীদারেরা কে কোথাকার তাহা জানা প্রয়োজন। ভারতের চৌরাশীধামের যাত্রীদের উচ্চারণ ও বলিবার বিশেষত্ব দিয়া এই "পরচা" অর্থাৎ পরিচয় গ্রন্থ লেখা। ইহা তাঁহাদের নিজ গরজে লেখা, সেই যুগের প্রাদেশিক ভাষার তুলনা সংগ্রহ।

দিনোধর (বা দিনো দয়ের) গ্রন্থ আমি আগাগোড়া দেখি নাই—মাত্র আচ্ছাদন দেখিয়াছি; তবে দামোদর কুণ্ডীয় মঠের পুঁথিখানা দেখার সুযোগ আমার হইয়াছিল। ইহারা কিছুতেই দেখান না। কিন্তু এই মঠটি "অতীথ" সম্প্রদায়ের সাধুরা কাড়িয়া লইয়াছেন। তাই স্থানভ্রষ্ট সাধুরা গির্ণারে ছত্রভঙ্গ। ১৯২১ সালে আমার বন্ধু আহমেদাবাদবাসী শ্রীযুত হরিপ্রসাদ মেহতার সঙ্গে যখন আমি গির্ণার গিয়াছিলাম তখন এই পুঁথিখানি দেখিতে পাই।

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, সুকুমার সেন, পৃ ৩৪

২ মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ ; প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৮ পৃ ৫২৯

৩ জার্ণাল অব রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, নবম খণ্ড ১৯৪৩, নং ১১, পৃ ১২

৪ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : সুনীতি চট্টোপাধ্যায়কৃত চরিত্র-সংগ্রহ, দীনেশচন্দ্র সরকারের তিব্বতের বৌদ্ধ-সংস্কৃতি, ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩৫০, পৃ ৮৬

৫ Wu Ta Sus

৬ ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারি, জানুয়ারী ১৯১১

৭ ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টার্লি, ডিসেম্বর ১৯৩৭, পৃ ৫৮৯ : দি সেণ্ট্রাল কণ্টাক্ট বিটুইন জাভা এণ্ড বেঙ্গল

৮ ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টার্লি, মার্চ ১৯৩৪

৯ শেকার বাজানেগারা নং ৩

১০ সিয়াম দ্বিতীয় খণ্ড

১১ বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৪৪১-৪৪৩

১২ অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সেন : কাশী প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন বক্তৃতা, ১৩৪৮

১৩ এসিয়াটিক রিসার্চেস ১৭৯২, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ২৯৬-২৯৭

বাংলায় তন্ত্রশাস্ত্র

বাংলার আর একটি বিশেষ দান তাহার তন্ত্রশাস্ত্র। তন্ত্র বাংলায় অতি প্রাচীন। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা খুব কম করিয়া ধরিয়াও স্বীকার করিয়াছেন যে পূর্ববাংলায় পঞ্চম শতাব্দীতেও শাক্ত সাধনা ও তন্ত্রশাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব ছিল।[১]

কিন্তু আসলে শাক্ত সাধনা আরও অনেক প্রাচীন। অধ্যাপক উইন্‌টারনিট্‌জ সাহেবের মতে বাংলায় ইহার উৎপত্তি, পরে নেপাল ও আসামে বিস্তার। কালীবিলাস তন্ত্রে আসামী ও পূর্ব বাংলার চল্‌তী ভাষার খিচুড়ি পাওয়া যায়।

তন্ত্রশাস্ত্রের বহু গ্রন্থকার বাঙ্গালী। তাঁহাদের মধ্যে, এখন পর্যন্ত যতদূর দেখা যায় তাহাতে মনে হয়, মহামহোপাধ্যায় পরিব্রাজকাচার্যই সর্বাপেক্ষা পুরাতন। তাঁহার গ্রন্থের নাম কাম্যমন্ত্রোদ্ধার। যে পুঁথিখানি পাওয়া গিয়াছে তাহা ১৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লেখা।

তারপরই মনে পড়ে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকে। তিনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক। তন্ত্রসার গ্রন্থের জন্য তিনি সর্বত্র বিখ্যাত। তাহার পরেই ব্রহ্মানন্দ ও তাঁহার শিষ্য পূর্ণানন্দ। কেহ বলেন তাঁহার জন্ম রাজশাহী জেলায়, কেহ বলেন ময়মনসিংহ জেলায় কালীহাতীতে। তিনি আসামে ও মণিপুরে তন্ত্রশাস্ত্র প্রচার করেন।

কামাখ্যাতে শাক্তধর্ম প্রচার করেন কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশ। অহোম রাজ রুদ্রসিংহ ছিলেন তাঁহার শিষ্য। কৃষ্ণরাম সেখানে বঙ্গ ও মিথিলা হইতে ভাল ভাল তান্ত্রিক পণ্ডিতদের আনিয়া বসতি করান। পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ ছিলেন কামরূপরাজের সভাপণ্ডিত। তাঁহার বিবাহকৌমুদী ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখা।

আর্থার এভেলনের সম্পাদিত কৌলাবলীনির্ণয় গ্রন্থে দেখা যায় তান্ত্রিক কুলগুরুর একটি পরম্পরা।

> প্রহ্লাদানন্দ নাথঞ্চ সনকানন্দ নাথকম্।
> কুমারানন্দ নাথঞ্চ বশিষ্ঠানন্দ নাথকম্॥
> ক্রোধানন্দ সুখানন্দৌ জ্ঞানানন্দং ততঃপরম্।
> বোধানন্দ ময়াভ্যর্চ্য ক্রমেণানেন সাধকঃ॥

দ্বিতীয় উল্লাস ৯২-৯৩

ইহাতে দেখা যায় সবারই নামের শেষে নাথ আছে। তাহাতে মনে হয় এই মতের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে নাথপন্থের যোগ ছিল।

তাহা ছাড়া ইহাদের কায়াসাধনও অনেকটা সেই ভাবেরই। ইহাদেরও অনাহত ধ্বনি ঘণ্টা (৩, ৪৫) আছে। সদা সামরস্যং ধ্যেয়ং (৩, ৭৭) দেখা যায়। মহাশূন্যে লয়ং কৃত্বা (৩, ৭৮) ইহাদের সাধনা। উন্মনীও ইহাদের আছে (৩, ৯৪)।

তান্ত্রিক মতে পৃথিবীতে অশ্বক্রান্তা, রথক্রান্তা, বিষ্ণুক্রান্তা এই তিন ভাগ। সময়াচার মতে ইহার একটি ভাগেই ৬৪ তন্ত্র আছে। তাহা ছাড়াও আটটি যামল এবং তিনটি ডামর গ্রন্থ আছে।

সাধকপ্রবর বশিষ্ঠ বৈদিক সাধনায় সিদ্ধি না পাইয়া যোগপন্থায় দেবী বুদ্ধেশ্বরীর সাধনা করেন। তার পর সাধনা করেন কামাখ্যাতীর্থে।

সেখানেও ফল না পাওয়ায় দেবীকে শাপ দিতে উদ্যত হন। দেবীর কথায় তিনি মহাচীনে যাইয়া চীনাচারে সাধনা করেন ও ত্বরিত সিদ্ধি লাভ করেন। সেখানে দেখেন সাধকেরা বুদ্ধ, সুরা ও শক্তি লইয়া সাধনায় রত। যাঁহারা চীনাচার সম্বন্ধে জানিতে চাহেন, তাঁহারা রুদ্র যামলের সপ্তদশ-পটল বা ব্রহ্ম-যামলের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পটল দেখিলেই সব বুঝিতে পারিবেন।

মীননাথকৃত স্মরদীপিকায় বুদ্ধদেবকে কামশাস্ত্রের গুরু বলা হইয়াছে।

> সারং নিষ্ক্রম্য বুদ্ধবিদ্ মুনীনাং প্রমুখাৎ শ্রুতম্।
> শ্রীমতা মীননাথেন ক্রিয়তে স্মরদীপিকা ॥[২]

পূর্ববঙ্গে ত্রিপুরার মেহারের নাম প্রসিদ্ধ। এই শক্তিপীঠের আদি সাধক সর্বানন্দ ১৪২৫ খ্রীষ্টাব্দে সিদ্ধিলাভ করেন। ইঁহার পিতামহ বাসুদেবের পূর্বস্থান রাঢ় এবং তপস্যাস্থান কামাখ্যা। ইঁহার প্রভাব ভারতের সর্বত্র বিদ্যমান। কাশ্মীরের রঘুনাথ মঠের নবাহ্ন পূজাপদ্ধতি ও মধ্য ভারতের ত্রিপুরার্চনদীপিকা অনেকের মতে ইঁহারই রচিত। কাশীতে তিনি অনেক দিন ছিলেন। গণেশ মহল্লায় ইঁহাদের মঠ আছে। হিমালয়ের গাঢ়বাল প্রদেশে ইঁহার মতবর্তী সাধক দেখিয়াছি।[৩]

হিমালয়ে যে বাঙ্গালীদের উপনিবেশের কথা বলিয়াছি সেখানে বাংলার তন্ত্রও গিয়াছে। নেপালে, তিব্বতে, চীনে, জাপানে, ব্রহ্মে, চম্পায়, শ্যামে, বলি ও যবদ্বীপে বাংলার তন্ত্র বিস্তৃত হইয়াছে।

প্রভাসে পূর্বে বহু তান্ত্রিক ছিলেন। বাংলার বহু তান্ত্রিক পুঁথি সেখানে ছিল। ১৯২১-১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে খোঁজ করি। পণ্ডিত কালিদাস নামে একজন তান্ত্রিকের পুত্র বলেন, "সে সব গ্রন্থ দ্বারভাঙ্গা মহারাজার লোকেরা লইয়া গিয়াছেন।"

সতীশ মিত্র মহাশয় স্বীকার না করিলেও রাজপুতানায় যে যশোরেশ্বরী গিয়াছেন সেকথা অনেকেরই জানা। তাহা ছাড়া বাঙ্গালী অনেক তান্ত্রিক পুষ্করে আবুতে ও গির্ণার পর্বতে বাস করিতেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আলৱারে রসুল সাহ নামে একজন ফকীর ছিলেন। বাঙ্গালী তান্ত্রিকের কাছে তিনি তন্ত্রদীক্ষা পান। ইঁহার শিষ্যেরা বীরাচারী। তাঁহারা চক্রে বসেন, সুরাপান করেন, ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া সহস্রার রস পান করেন।

রসুল সাহের শিষ্য সম্প্রদায়ের সাধক সাহ আলি। তিনি রাজপুতানা হইতে সাধকের সন্ধানে বাংলা দেশে আসেন। সেখানে রংপুর নীলফামারির সাধক রূপচাঁদ গোঁসাইর সঙ্গে মিলিত হন। তাঁহাদের সাধনার সঙ্গে সেই স্থানে বাউল সাধনার যোগ আছে।

সাময়িক পত্রে কিছুদিন পূর্বে ভারতের দেবীপীঠ প্রবন্ধে আমি সপ্তশৃঙ্গের নাম করিয়াছি। ইহা নাসিকের নিকট একটি মহাতীর্থ। এই পীঠটি সহ্যাদ্রিমালার মধ্যে, সমুদ্রতল হইতে স্থানটি ৫২৫০ ফুট উচ্চ। এখানে যোগীদেরও মহাপীঠ, কারণ এখানে মৎস্যেন্দ্রনাথের সমাধিস্থান বিদ্যমান।

দ্বিতীয় বাজিরাও পেশওয়ার (১৭২০-১৭৪০) সময়ে এই পর্বতে কালিকাতীর্থে গৌড়স্বামী নামে একজন বাঙ্গালী সাধু বাস করিতেন। তাঁহার শিষ্য অভোলাবাসী সর্দার ছত্রসিংহ ঠোকে কালিকাকুণ্ড ও সূর্যকুণ্ড তৈয়ার করাইয়া দেন। গৌড়-স্বামীর বহু শিষ্য ছিলেন। তাহার মধ্যে অনেকে সেই দেশীয় রাজরাজড়া। তাঁহার সমাধির কাছে শিষ্য ধর্মদেবের সমাধি। ধর্মদেব ছিলেন সুরত ধর্মপুরের রাজা। গুরুর দর্শনে আসিয়া তিনি মারা যান। ধর্মদেবের সমাধি মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে।[৪]

এই তন্ত্রশাস্ত্র আসামে, নেপালে, হিমালয়ের গড়ৱাল কুমায়ুন প্রদেশে, কাশ্মীরে, মিথিলায়, কাশী বিন্ধ্য অঞ্চলে রাজপুতানায়, প্রভাস, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, কর্নাট, মালাবার, তৈলঙ্গাদি সর্বপ্রদেশেই আছে। সুপ্রসিদ্ধ তৈলঙ্গ-স্বামী তন্ত্রমতেরই সাধক ছিলেন। তাঁহার মঠ ও স্থণ্ডিলাদি এখনও আছে। তবে এই তন্ত্রবিদ্যায় বাঙ্গালীরই শ্রেষ্ঠ নাম।

ভারতের সর্বপ্রদেশেই শক্তিপীঠ। বাংলা দেশের শাক্তদের সেই সব তীর্থেই যাতায়াত আছে। সেই সূত্রেই তাঁহাদের মতামত প্রচারিত হইত।

রাঢ়ের সব তান্ত্রিক সাধক বেলুচিস্থানের হিংলাজ পর্যন্ত যান। এখনও সেখানে বাঙ্গালী সাধকদের স্থান আছে। কলিকাতার মনোহরপুকুরের মহানির্বাণ মঠের সাধক জ্ঞানানন্দ দেব ও তাঁহার গুরু ব্রহ্মানন্দ বহুকাল সেখানে ছিলেন। সেখানে তাঁহাদের একটি আশ্রম আছে।

আমরা ছেলেবেলায় দেবী বন্দনায় শুনিতাম,

আদ্যেতে বন্দনা করি হিঙ্গুলার ভবানী।
তারপরে বন্দনা করি পাওয়াগড়ের কালী॥

এই পাওয়াগড়, গুজরাতের শক্তিতীর্থ।

বাঙ্গালীরাও ইংরাজের আমলে নানা দেশে দুর্গা কালী প্রভৃতি দেবীর পূজা প্রচার করিয়াছেন। বিহারে "কালী" দেবতা নাকি বাঙ্গালীরই আমদানী।[৫]

বৈদ্যবিদ্যা ও বৈদ্যশাস্ত্র

ইংরেজীর অধ্যয়ন-অধ্যাপন ভারতের মধ্যে প্রথম আরম্ভ হয় বাংলাদেশে। বাংলাদেশই অন্য প্রদেশের অপেক্ষা প্রথমে ইংরেজী ভাবাপন্ন হয়। তবু আজ পর্যন্ত ভারতের সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাংলা দেশেই আয়ুর্বেদের প্রচার বেশি। উত্তর-ভারতে সকল স্থলে য়ুনানী হাকিমী চিকিৎসাতেই ভরিয়া গিয়াছিল। যদিও তাহার মধ্যে আয়ুর্বেদীয় প্রণালী বহু পরিমাণে গৃহীত হইয়াছে, তবু সেই সব প্রদেশে আয়ুর্বেদের অধ্যয়ন-অধ্যাপন ছিল সামান্য ভাবে। উত্তর-ভারতে আজ যে প্রদেশে-প্রদেশে আয়ুর্বেদের পুনরুজ্জীবন হইতেছে তাহাতেও প্রায় সর্বত্রই বাঙ্গালী কবিরাজগণ অথবা তাঁহাদের ছাত্রগণই শিক্ষাগুরু।

গ্রন্থ, টীকা, টিপ্পনী প্রভৃতি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের যত কিছু অঙ্গ দেখা যায়, যাহা অধীত হয়, তাহা প্রায়ই বাংলা দেশের। তাহার একটি গূঢ় হেতুও আছে।

বেদের মধ্যে আমরা কয়েকটি ব্যাধি ও কয়েকটি গাছগাছড়ার ঔষধের নাম পাই। তাহার পর ভারতবর্ষে যে অপূর্ব বিশাল আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উদ্ভব হইল তাহাতে হয়তো এ দেশীয় আর্যপূর্ব গাছগাছড়া ও অন্যান্য স্থাবর-জঙ্গমাদি বিষ ও নানা ধাতুর অভিজ্ঞতা মিশ্রিত। কাজেই এই শাস্ত্রে আর্য-অনার্য জ্ঞানের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম হইয়াছে।

বাংলা দেশটিও ঠিক ঐরূপ একটি সন্ধিস্থান। আর্য-অনার্য সভ্যতারও একটি অপূর্ব সম্মেলন এখানে হইয়াছে। হয়তো এই সব কারণেই এখানে এই আয়ুর্বেদ বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি ও সংরক্ষণ হয়। পরে অন্যান্য প্রদেশে যখন আয়ুর্বেদের স্থান হাকিমী শাস্ত্র গ্রহণ করিল তখনও বাংলা দেশে কবিরাজেরা নানা গ্রন্থের টীকায় টিপ্পনীর রচনাতে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকে জীবন্ত রাখিলেন। অন্যান্য দেশে যখন হিন্দু রাজাদেরও মুসলমান হাকিম নিযুক্ত হইলেন তখন বাংলাদেশে মুসলমান রাজার চিকিৎসক ছিলেন বৈদ্য কবিরাজ। পাবনা মালঞ্চীবাসী শিবদাস সেন ছিলেন বার্বেক সাহের সভা-বৈদ্য। বার্বেক সাহ বাংলাদেশে ষোড়শ শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। অন্যান্য প্রদেশে বহু শতাব্দী ধরিয়া চিকিৎসকেরা দুই-একখানি গ্রন্থ ও কয়েকটি সিদ্ধযোগ ও ঔষধের তালিকা দেখিয়া চিকিৎসা করিতেন। বৈদ্যশাস্ত্রের কিছু পঠন-পাঠন কেরল মালাবারে ছিল আর সর্বত্র বড়ই দুর্দশা গিয়াছে।

রাজপুতানায় ও কাথিয়ারাড় জৈনভাণ্ডারে দেখিয়াছি বঙ্গাক্ষরে লেখা বৈদ্য-গ্রন্থ সংগৃহীত। কাথিয়ারাড় সায়লাতে গ্রন্থভাণ্ডারে এইরূপ দুইখানি বাংলায় লেখা যোগ-ঔষধি গ্রন্থ আছে। বহুদিন ধরিয়া নানা প্রদেশ হইতে বাংলাদেশেই ছাত্রেরা বৈদ্যশাস্ত্র পড়িতে আসিতেন। গঙ্গাধর দ্বারিকানাথের ছাত্র গুজরাতে, রাজপুতানায় ও পঞ্চনদে দেখিয়াছি।

অতি প্রাচীন কবিরাজবংশে আমার জন্ম। বাল্যকালে এই শাস্ত্র পড়িতেও হইয়াছে। তাই এই শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থের নাম ও পরিচয় আমাদের জানার কথা। বাংলাদেশের বৈদ্যশাস্ত্রের তালিকার কতক উপকরণও আমার হাতে ছিল। তাহা লইয়া যখন একটি বিবরণী প্রকাশ করিতে যাইব, তখন দেখি শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় এই বিষয়ে "দি বৈদ্যক লিটারেচার অব বেঙ্গল ইন আর্লি মিডিইভ্যাল পিরিয়ড" নামে একটি ভাল প্রবন্ধ ইণ্ডিয়ান কালচার পত্রের ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে লিখিয়াছেন। সেই প্রবন্ধটিতে আমার অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়া গেল। আমাদের স্বভাবের মধ্যে বিপুল আলস্য আছে। তাই ভাবিলাম আমি যদি সামান্য দুই একটি কথা লিখি তবেই হইবে। যাঁহারা আরও কিছু জানিতে চাহিবেন তাঁহাদের ঐ প্রবন্ধটি দেখিলেই হইবে।[৩]

বৌদ্ধ সাধুরা নানা দেশে-বিদেশে ধর্ম-প্রচারে যাইতেন। প্রচারের এক প্রধান অঙ্গ ছিল লোকসেবা। লোকসেবার শ্রেষ্ঠ উপকরণ চিকিৎসা। তাই বৌদ্ধ সাধুরা অনেকেই চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইতেন। ভারতের বাহিরে

যেখানে যেখানে বৌদ্ধধর্ম গিয়াছে, সেইখানেই ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। সুদূর সাইবেরিয়াতে পর্যন্ত ভারতীয় চিকিৎসা-গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়াছিল। তাই এই দেশে চিকিৎসার যথেষ্ট উন্নতি হয়। তান্ত্রিকেরাও চিকিৎসাশাস্ত্রে যথেষ্ট অনুশীলন করিতেন। রস চিকিৎসা ও বিষ চিকিৎসা প্রায় তাঁহাদেরই একচেটিয়া ছিল। অল্পদিন পূর্বেও বাংলার বাহিরের চিকিৎসকেরা রসাদি ধাতু নিজেরা পাক করিতেন না। বাঙ্গালী চিকিৎসকদের দিয়া পাক করাইয়া লইতেন।

বৌদ্ধ সাধনা ও তন্ত্রের পীঠস্থান বলিয়া বাংলাদেশে আয়ুর্বেদের বিশেষতঃ রসাদি চিকিৎসার যথেষ্ট প্রচার আছে। বৈদ্যশাস্ত্রের চর্চা বাংলাদেশে এতটা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে ভট্টভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তিতে (২৩শ শ্লোক) দেখি তিনি ছিলেন,

আয়ুর্বেদাস্ত্রবেদ প্রভৃতিষু কৃতধীরদ্বিতীয়ঃ

উপাধ্যায় শূলপাণি তাঁহার যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার ব্যাখ্যার নানাস্থানে আপন গভীর আয়ুর্বেদ-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন।

নিদান-রচয়িতা মাধবকরের নাম বাংলায় জানেন না এমন বৈদ্য কেহ নাই। তাঁহার নিদান গ্রন্থের আরম্ভে শিব প্রণতিতে বুঝা যায় তিনি শৈব। অন্তভাগে তিনি পরিচয় দিয়াছেন,

শ্রীমাধবেনেন্দুকরাত্মজেন[৭]

অর্থাৎ ইন্দুকরের পুত্র শ্রীমাধবের সংগৃহীত এই গ্রন্থ। অমরকোষ টীকাকার ক্ষীরস্বামী (১১শ শতাব্দী) তাঁহার বিখ্যাত টীকায় ইন্দুকৃত নির্ঘণ্টুর উল্লেখ করিয়াছেন। অষ্টাঙ্গহৃদয়ের এক টীকায় ইন্দুর সন্ধান মিলিয়াছে। মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের পুঁথিশালায় ইন্দুকৃত শশি-লেখা টীকা পাওয়া গিয়াছে। এই দুখানিই চিকিৎসা গ্রন্থ। ইন্দু তখন খুব চলিত নাম নহে। তাই মনে হয় সম্ভবতঃ এই ইন্দুই মাধবকরের পিতা।

মাধব-নিদান ছাড়া বাংলায় বৈদ্যদের এক মুহূর্তও চলে না। মহামহোপাধ্যায় বৈদ্য বিজয় রক্ষিত ব্যাখ্যামধুকোষ নামে তাঁহার টীকার কতক অংশ রচনা করেন। নিদান গ্রন্থখানি পূর্বে বিষ নিদানের পরই (৮১ অধ্যায়) সমাপ্ত হইয়াছিল। বিজয় রক্ষিত তাহার মধ্যে ৩৫টি অধ্যায়ের অর্থাৎ উদর-নিদান পর্যন্ত টীকা করিয়া পরলোকগমন করেন। তাহার পর সেই টীকা সম্পূর্ণ করেন

তাঁর শিষ্য বৈদ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীকণ্ঠ দত্ত। তাহার পর একটি পরিশিষ্ট ভাগ জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্যাখ্যামধুকোষ টীকা সমাপ্ত হইয়া গেলেও পরিশিষ্ট ভাগের টীকাও ঐ নামেই চলিত হইয়াছে। হর্ণেল সাহেব মনে করেন বিজয় রক্ষিতের সময় ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি। বিজয় রক্ষিত ছিলেন আরোগ্য-শালা অর্থাৎ হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক। তাই তাঁহার উপাধি দেখা যায় আরোগ্যশালীয়।

শ্রীকণ্ঠ দত্ত ছাড়াও বিজয় রক্ষিতের আরও যোগ্য সব ছাত্র ছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে কবিরাজ নিশ্চল কর তাঁহার গুরু বিজয় রক্ষিতের স্বর্গ গমনের পর গুরুর উপদেশ অবলম্বনে চক্রদত্তের একটি টীকা রচনা করেন। কিন্তু পরে শিবদাস সেনের টীকা এমন উৎকৃষ্ট হইল যে নিশ্চল কৃত টীকা একেবারে চাপা পড়িয়া গেল।

কবিরাজ শ্রীকণ্ঠ দত্তও স্বতন্ত্রভাবে বৃন্দ-কৃত সিদ্ধযোগের একটি টীকা লেখেন। এই টীকার নাম কুসুমাবলী।

বিজয় রক্ষিতের সময় যদি ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দ হয় তবে নিশ্চল কর, শ্রীকণ্ঠ দত্ত প্রভৃতির সময় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ সিদ্ধ হয়।

বিজয় রক্ষিত তাঁহার টীকায় প্রথম নমস্কার শ্লোকের পরেই কয়েকজন প্রাচীন মহাবৈদ্যের নাম করিয়াছেন।

ভট্টার জেজ্জড় গদাধর বাপ্যচন্দ্র
শ্রীচক্রপাণি বকুলেশ্বর সেন ভব্যৈঃ।
ঈশান-কার্তিক-সুধীর-সুকীর বৈদ্য
মৈত্রেয় মাধব মুখৈ র্লিখিতং বিচিন্ত্য॥

কাশ্মীরে মাধব করের প্রভূত সম্মান। কাশ্মীরীয় আচার্য, দৃঢ়বল তাঁহার চরক-সংহিতায় মাধবনিদানের অনেক সহায়তা লইয়াছেন। বগদাদের খলিফা মনসুর (৭৫৩-৭৭৪ খ্রীঃ) ও হারুণের (৭৮৬-৮০৮ খ্রীঃ) আজ্ঞায় এই গ্রন্থখানি আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। কাজেই মাধবের সময় সপ্তম শতাব্দী হওয়াই সঙ্গত।

মাধবের চিকিৎসাও বৈদ্যগণের আদরণীয় গ্রন্থ। তাঁহার কূটমুদ্গর হইল খাদ্য ও পরিপাক ক্রিয়া সম্বন্ধে একখানা উৎকৃষ্ট পুস্তক। কিন্তু তাঁহার দ্রব্যগুণ ও সুশ্রুত টীকার পরিচয় এখন নানা গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া গেলেও

আর গ্রন্থাকারে পাওয়া দুর্লভ। পর্যায়রত্নমালা গ্রন্থখানির রচয়িতা বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি আছে। তাহাতে ভোজ্য-পানীয়-স্নান-বাস-দিন কৃত্যাদির বিচার আছে। ইহাতে লিখিত বস্তুর নামগুলি বাংলাদেশে প্রচলিত। নিদানেও তাঁহার আমবাত প্রভৃতি অধ্যায়ধৃত নামগুলি বাংলাদেশের।

বাংলাদেশে তাঁহার বংশীয় কর-উপাধিধারী বৈদ্য এখনো অনেক আছেন।

সিদ্ধযোগ-প্রণেতা বৃন্দমাধবকে বৃথা কেহ কেহ মাধব করের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। মাধবেরই নিদানের প্রণালীতে তিনি তাঁহার সিদ্ধযোগ গ্রন্থ লেখেন। আবার ১০৬০ খ্রীষ্টাব্দে চক্রপাণি দত্ত তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ চক্রদত্ত লেখেন। বৃন্দের টীকাকারও শ্রীকণ্ঠ দত্ত।

চক্রদত্ত তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্তিতে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই,

> গৌড়াধিনাথ রসবত্যাধিকারিপাত্র
> নারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়োন্তরঙ্গাৎ।
> ভানোরনু প্রথিত লোধ্রবলী কুলীনঃ
> শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্তৃপদাধিকারী।

অর্থাৎ গৌড়াধিনাথ নরপালদেবের পাকশালার অধ্যক্ষ "অন্তরঙ্গ" নারায়ণের পুত্র ভানুর অনুজ সুনীতিজ্ঞ লোধ্রবলী কুলীন শ্রীচক্রপাণি এই গ্রন্থের কর্তা। কেহ কেহ "অন্তরঙ্গ" শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন মন্ত্রী। শিবদাস সেন অন্তরঙ্গ অর্থে বলিয়াছেন অভিজাত বংশের বিশ্বস্ত বৈদ্য। চক্রদত্তের পিতা নারায়ণ কে? শ্রীধর দাসের সদুক্তি কর্ণামৃতে (১২০৫ খ্রীঃ) এক নারায়ণ কবিরাজের শ্লোক গৃহীত আছে। রত্নমালাধ্যায়া নামে বৈদ্যকনামমালাও নারায়ণ-রচিত, তিনিও অন্তরঙ্গ। তবে কি তিনি এই নারায়ণই ?

চক্রপাণির গুরুর নাম নরদত্ত। তিনি চরক-সংহিতার একজন উত্তম ব্যাখ্যাতা। চক্রদত্তও সেই গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন।

চিকিৎসা-সার বা গূঢ়বাক্যবোধক গ্রন্থও চক্রপাণি-রচিত। বনৌষধির নামগুলির ও গুণাগুণের একটি নির্ঘণ্ট বা দ্রব্যগুণসংগ্রহ তাঁহার রচিত। শিবদাস সেন তাহার একটি টীকা রচনা করিয়াছেন। কাষ্ঠাদি ও রসাদি (অর্থাৎ বনৌষধির ও ধাতু ঔষধির) নামগুলির একটি শব্দ-চন্দ্রিকাও তিনি রচনা করেন। ভানুমতী নামে সুশ্রুতের এবং আয়ুর্বেদদীপিকা নামে চরকের ব্যাখ্যাও তাঁহারই রচনা। সর্বসারসংগ্রহকার চক্রপাণি দত্ত তিনি কিনা সন্দেহ।

রত্নপ্রভা নামে একখানি প্রাচীন টীকা অবলম্বন করিয়া শিবদাস সেন চক্রদত্তের একটি উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন। টীকাখানির নাম তত্ত্বচন্দ্রিকা। পূর্বেই বলা হইয়াছে শিবদাসের বাড়ী পাবনা মালঞ্চী গ্রামে।

বাগ্‌ভটের সময় হইতে চিকিৎসা প্রকরণে কাষ্ঠাদির অর্থাৎ বনৌষধির সঙ্গে রসাদির অর্থাৎ ধাতুঘটিত ঔষধের ব্যবহার আরম্ভ হয়। চক্রপাণির সময়ে দেখা যায় ধাতুঘটিত ঔষধের ব্যবহার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে।

রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সভা-বৈদ্য ছিলেন দেবগণ। এই গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গেই কি রাজেন্দ্র চোলের যুদ্ধ হয়? দেবগণ নামে কেমন একটু জৈনভাব আছে। দেবগণের পৌত্র কবি-কদম্ব-চক্রবর্তী গদাধর ছিলেন বঙ্গের রাজা রামপালের সভা-বৈদ্য। ভদ্রেশ্বরের পুত্র সুরেশ্বর বা সুরপাল ছিলেন পাদীশ্বর ভীমপালের অন্তরঙ্গ সভা-বৈদ্য। তিনি শব্দপ্রদীপ নামে একটি বনৌষধিকোষ রচনা করেন। লোহ-পদ্ধতি বা লোহ-সর্বস্ব নামে সুরেশ্বরের একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থখানি নাগরাক্ষরে লেখা। সুশ্রুত, হারিত, ব্যাড়ি, নাগার্জুন প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে তিনি লোহের আময়িক প্রয়োগ সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন। অনেকে মনে করেন তিনি বৃক্ষায়ুর্বেদেরও রচয়িতা এবং এই গ্রন্থখানি শার্ঙ্গধর পদ্ধতিকারের (১৩৬৩ খ্রীঃ) পরিচিত ছিল। লোহ-পদ্ধতিতে দেখা যায় সুরেশ্বরেরও উপাধি ছিল কবীশ্বর বা কবিরাজ।

চিকিৎসাসারসংগ্রহ রচয়িতা বঙ্গসেন ব্যাকরণেও মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত আখ্যাতবৃত্তি কলাপ-ব্যাকরণ শিক্ষার্থীদের অপরিহার্য গ্রন্থ। চিকিৎসাসারসংগ্রহের দুইখানি পুঁথির কথা ভাণ্ডারকরের ডেকান কলেজের পুঁথির তালিকায় দেখা যায়। পুঁথি দুইখানি লেখার সময় ১৩১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দ। তবেই বুঝা যায় তিনি তাহার পূর্ববর্তী। কিন্তু অন্য প্রমাণে বুঝা যায় তিনি ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বা কাছাকাছি জীবিত ছিলেন।

তাঁহার গৃহপতির নাম গদাধর। সুশ্রুত টীকায় এক গদাধরের নাম পাওয়া যায়। বৃন্দকৃত সিদ্ধযোগ টীকায় শ্রীকণ্ঠ দত্তও এক গদাধরের নাম করিয়াছেন। শ্রীধর দাস কৃত সদুক্তিকর্ণামৃতের (১২০৫) মধ্যে বৈদ্য গদাধরের রচনা দেখা যায়। বিজয় রক্ষিত ও তাঁহার মাধবীয় নিদান-টীকার প্রারম্ভে আচার্যগণের মধ্যে গদাধরের নাম করিয়াছেন। তবে কি বঙ্গসেনের গৃহপতি গদাধরের নামই এই সব নানা স্থলে পাওয়া যায়?

যাদব রাজা রামচন্দ্রের সমকালীন হেমাদ্রি অষ্টাঙ্গহৃদয়ের টীকায় বহু স্থলে

বঙ্গসেন হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। যাদব রামচন্দ্রের রাজত্বকাল ১২৭১-১৩০৯ খ্রীষ্টাব্দ। হেমাদ্রি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। কাজেই বঙ্গসেন নিশ্চয়ই তাঁহার কিছুকাল পূর্ববর্তী। বাংলা দেশ হইতে এতটা দূরে গ্রন্থখানির খ্যাতি পৌছিতেও কিছুকাল নিশ্চয় লাগিয়াছিল। কিন্তু তখনকার দিনেও প্রদেশে প্রদেশে বিদ্যালোচনার যে এত ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল তাহা এখন চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই সব প্রমাণের বলে শ্রীযুক্ত পি, কে, গোড়ে মহাশয় বলেন বঙ্গসেনের সময় ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী কালে।

বঙ্গসেনের লেখাতে দেখা যায় তাঁহার নিবাস ছিল কাঞ্জিকা গ্রামে। ছান্দোগ্যপরিশিষ্টপ্রকাশ-রচয়িতা নারায়ণের বাসস্থান ছিল রাঢ়ের কাঞ্জিবিল্লী গ্রামে, কাঞ্জিকা ও কাঞ্জিবিল্লী খুব সম্ভব একই গ্রামের নাম।

পরমেশ্বর রক্ষিতের গণাধ্যায়ও একখানা বৈদ্যক গ্রন্থ। অষ্টাঙ্গহৃদয়ের সর্বাঙ্গসুন্দরাখ্যা টীকার রচয়িতা অরুণ দত্ত অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। সুশ্রুতের একটি টীকা তিনি রচনা করেন। তাঁহার পিতার নাম মৃগাঙ্ক দত্ত।

নেত্রগঠন সম্বন্ধে তাঁহার মত বিজয় রক্ষিত খণ্ডন করিয়াছেন। বিজয় রক্ষিতের সময় ১২৪০ স্থিরীকৃত হইয়াছে। কাজেই অরুণ দত্তের সময় অন্ততঃ তাহার ৩০।৪০ বৎসর পূর্বে হওয়া উচিত।

বন্দ্যোঘটীয় সর্বানন্দ কৃত টীকাসর্বস্ব নামে অমরকোষ টীকায়[৮] ও বৃহস্পতি রায়মুকুটকৃত অমর টীকায়[৯] শাব্দিক অরুণ দত্তের নাম পাওয়া যায়। বৈদ্য অরুণ দত্ত ও শাব্দিক অরুণ দত্ত একই ব্যক্তি কি না বলা কঠিন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলায় অন্যান্য শাস্ত্র রচনা ক্ষীণ হইয়া আসিল। কিন্তু সেই শতাব্দীতেই বিস্তর বৈদ্যক গ্রন্থ বাংলা দেশে রচিত হইয়াছিল। বৈদ্য বিদ্যার পণ্ডিতেরা বৈদ্যশাস্ত্র ছাড়াও আরও নানা বিষয়ে বহু রচনা রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার সামান্য দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। মালঞ্চীবাসী হরিহরের পুত্র বিনায়ক সেন। বিনায়কের পুত্র গৌরাঙ্গ মল্লিক। গৌরাঙ্গের পুত্র ভরত মল্লিক বা ভরত সেন ষোড়শ শতাব্দীর লোক,[১০] যদিও কোলব্রুক সাহেব অমরকোষ ভূমিকায় বলেন ভরত মল্লিক সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। ভারবির উপরে ভরত মল্লিক কৃত সুবোধাখ্যা ব্যাখ্যা, ভরত মল্লিকের রচিত। তাঁহার রচিত আরও অনেক গ্রন্থ আছে। যথা

উপসর্গ-বৃত্তি, গণপাঠ, ঘটকর্পর টীকা, দ্রুতবোধ ব্যাকরণ, একবর্ণার্থসংগ্রহ, দ্বিরূপ ধ্বনি সংগ্রহ, অমরকোষ টীকা, ভট্টিকাব্য টীকা, সুখলেখনম্, সুবোধা

নামে ছয়খানি প্রখ্যাত কাব্যের (কুমার-নলোদয়-নৈষধ, মেঘদূত-রঘুবংশ-শিশুপাল বধ) টীকা। ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে তাঁহার সময় নিরূপিত।[১১]

বঙ্কিম দাস কবিরাজের বৈষম্যোদ্ধরণী নামে ভারবি টীকা ১৬৭২ সালের পূর্বে রচিত। কারণ ১৬৭২ সালে লেখা পুঁথিই পাওয়া গিয়াছে।[১২]

জ্যোতিষ বিদ্যাতেও বাংলার নিজস্ব কিছু সাধনা আছে। সেই বিষয় বিশদভাবে এখানে বলিবার অবকাশ নাই।

কাহারও কাহারও মতে ষষ্ঠ্যাদিকল্প দুর্গাপূজা খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীর। তাহা এই দেশের। ২৪৭ বৎসর একমাসে যে যুগচক্র হয় তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল এই বঙ্গদেশেই।[১৩]

খ্রীষ্টাব্দের দ্বাদশ শতকে রাঢ় দেশে মহিন্তা গ্রামীয় শ্রীনিবাস অর্থাৎ বৃহস্পতি রায় মুকুটশুদ্ধিদীপিকা নামে একখানি ধর্মাচরণ কাল-নির্ণয়ের গ্রন্থ লেখেন। হলায়ুধ এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিবাস গণিত চূড়ামণি নামে একখানা বিশুদ্ধ গণিতের গ্রন্থ লেখেন। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে শ্রীনিবাস হয়ত রাজা গণেশের পুত্র যদুরও অধ্যাপক ছিলেন। তিনিই বৃহস্পতিকে আচার্য ও কবিচক্রবর্তী উপাধি দেন। বৃহস্পতি রচিত স্মৃতিরত্নহার গ্রন্থে এবং অমরকোষের টীকা পদার্থচন্দ্রিকায় তাহার কিছু পরিচয় মেলে। তাঁহার পিতা গোবিন্দ, মাতা নীলমুখায়ী এবং স্ত্রী রমা। তাঁহার পুত্র বিশ্রাম ও রাম ছিলেন দাতা, মহাপণ্ডিত ও বহু গ্রন্থরচয়িতা। "গৌড়াবলী বাসব" গৌড়দেশের রাজা জলালউদ্দীন বৃহস্পতিকে ছয়টি উপাধি দেন—(১) আচার্য, (২) কবিচক্রবর্তী, (৩) পণ্ডিত সার্বভৌম, (৪) কবিপণ্ডিত চূড়ামণি, (৫) মহা আচার্য, (৬) রাজপণ্ডিত। সর্বশেষে তাঁহাকে রাজোচিত জাঁকজমকে রায়মুকুট উপাধি দেওয়া হয়। নির্ণয় বৃহস্পতি নামে তিনি শিশুপালবধের একখানি টীকা লেখেন—তাহাতে দেখা যায় তিনি ছিলেন বিষ্ণুর ভক্ত। তবু তাঁহার স্মৃতিরত্নহার গ্রন্থে যে সব উৎসবের সূচী আছে, তাহাতে জন্মাষ্টমী, রামনবমী, রথ ও দোলের কথা নাই। রাসের স্থানে আছে সুখরাত্রি। কার্তিক পূজা ও কালীপূজাও নাই। দূর্বাষ্টমী, তালনবমী, অনন্তব্রত প্রভৃতিও নাই।

বোধ হয় বৃহস্পতির সময়েও ব্রাহ্মণদের চারিবর্ণে বিবাহ চলিত, কারণ তিনি বর্ণসন্নিপাতাশৌচের ব্যবস্থা করিয়াছেন অর্থাৎ এক ব্রাহ্মণের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের স্ত্রীগণের সন্তানদের অশৌচ কিরূপ হইবে সেই ব্যবস্থা। রঘুনন্দন ও অর্বাচীন স্মৃতির গ্রন্থে এই বিষয়ে কোনো উল্লেখ নাই।

রায়মুকুটের অমর টীকা ষোলখানি টীকা দেখিয়া লেখা। ২৭০ খানি পুঁথি হইতে তাঁহার প্রমাণ গৃহীত। কাজেই বুঝা যায় গৌড় সুলতানের আশ্রিত রায়মুকুটের গ্রন্থসংগ্রহ বিপুল ছিল। রায়মুকুট দুই চারিটা বাংলা শব্দেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

বন্দ্যোঘটীয় সর্বানন্দও অমরকোষের একখানি প্রসিদ্ধ টীকা লেখেন। তিনি ১০খানি টীকা এবং ১৯৪ খানি গ্রন্থ এইজন্য ব্যবহার করেন। তিনি অমরকোষের ধৃত প্রায় দুইশত শব্দের বাংলা প্রতিরূপ দিয়াছেন। সর্বানন্দ ও বৃহস্পতি উভয়েই পাণিনি ও ব্যাকরণে দক্ষ ছিলেন। উভয়েই বৌদ্ধাগমে মহাপণ্ডিত ছিলেন।

রায়মুকুট গণরত্ন মহোদধি হইতে বুদ্ধচরিতের সব প্রমাণ উদ্ধৃত করেন। বৌদ্ধ অভিধান ও ব্যাকরণ তাঁহারা যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন। তখনও বাংলায় বিস্তর বৌদ্ধশাস্ত্রের চর্চা হইত। বর্ধমান বেণুগ্রামে ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বোধিচর্যাবতার নকল করা হয়। ইহার দশবৎসর পূর্বে মালদহে কালচক্রতন্ত্র নকল হয়। বৌদ্ধমঠে সংস্কৃত শিখিতে হইলে তখন সটীক কলাপ ব্যাকরণের সাহায্য লওয়া হইত।[১৪]

মনসা পূজা ও বেহুলার কথা

সংস্কৃত শাস্ত্র ও গ্রন্থাদির প্রসঙ্গের মধ্যে এখন একটু প্রাকৃত শাস্ত্রের কথাও আনিয়া ফেলিতে চাই। মনসা দেবী ও বেহুলার কাহিনী বাংলাদেশ তাহার নিজস্ব বলিয়াই জানে। বিহার ও আসাম বেহুলার দাবী রাখে। কাশীতেও বেহুলার পুঁথি দেখিয়াছি। কাশীর কচুড়ী গলীতে বেহুলার কাহিনী লিথো ছাপা বিস্তর ছেলেবেলায় দেখিতাম। আমার হাতের কাছে একখানা হিন্দী বিহুলা কথা রহিয়াছে, তাহা কাশী বিশ্বেশ্বর প্রেসে ছাপা। বৈজনাথ প্রসাদের দ্বারা তাহা প্রকাশিত। তাহার ভাষা না-হিন্দী না-বাংলা।

হোরে ফুল তোড়ে গেলো হে মাতা
কমল কে দহ হে।
হোরে বাসুকী জে নাগ হে মাতা দেল দরশন হে॥
হোরে খোজেতো লাগলরে চাংদো ছরো কোরী
মলাহো রে॥
হোরে হংকারে লাগলেরে চাংদো ধন্না মন্না মন্ত্রীরে॥

ইহাতে সাতমাসে সোনাই ভাজা সাধ খাইলেন, নবম মাসে সাধ খাইলেন।

পুস্তকখানির মাঝে মাঝে আছে "বঙ্গালারাগ"।

ওরে জালনী পঠারোলে চান্দো
ব্রাহ্মণের বাড়ী রে।
ওরে তোমার বেঁদে বিহাইবো বালা লখীংদর রে।
ওরে জালনী পঠাউলে চান্দ মলিয়ার বাড়ী রে।
ওরে তোমার মউরে বিহাইবো বালা লখীংদর রে॥
... ...
ওরে জালনী পঠাউলে চান্দ ঢোলোয়ার বাড়ী রে।
ওরে তোমার বোলে বিহাইবো বালা লখীংদর রে॥
... ...
হোরে আরন জারন করে নাগারে কালে নীংদে চাপল।
তুমাকে কালে সরপে আগে মোরাকে ডংসল হে॥
... ...
খৈছা ভরী কৌড়িয়া হে—

পূর্ববঙ্গে খৈচা হইল একরকম ডালা। বিহারেও বালিয়া জেলায় খৈচা হইল আঁচল। ইহা গ্রাম্য শব্দ।

ভঁঠীয়া ঢার

ওরে ই কাছে জায় কন্যা ও কাছে জায় কী হায়না।...
হায়না বলিলো মোরে প্রাণ নাগা ধায় রে॥
হোরে দী-দী-দী-দী করিয়ে রে দেবা সারে তো পায় এরে॥

এই তো ভাষার নমুনা। এমনই সর্বত্র। মন্তব্য নাই করিলাম।

প্রমাণ-পঞ্জী

১ এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন এণ্ড এথিক্স, ২য় খণ্ড, পৃ ৪৪১
২ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় সম্পাদিত, তারামন্ত্র, পৃ ৩২
৩ কল্যাণ "সন্ত" অঙ্ক, পৃ ৫১৫

৪ নাসিক গেজেটিয়র

৫ এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন এণ্ড এথিক্স, ২য় খণ্ড, পৃ ৪৯১

৬ অল্প কিছু দিন হইল শ্রীগুরুপদ হালদার "বৈদ্যকবৃত্তান্ত" নামে যে ৭০০ পৃষ্ঠার বিপুল গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহা সত্যই মহনীয়।

৭ বিষয়ানুক্রমণিকার উপান্ত শ্লোক

৮ ১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দ

৯ ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দ

১০ গোপীনাথ কবিরাজ, সারস্বতালোক, সরস্বতীভবন স্টাডিস, ১ম কিরণ, পৃ ৪৮

১১ সারস্বতালোক, পৃ ৪৮

১২ ঐ পৃ ৫০—৫১

১৩ ভারতবর্ষ, ১৩৩১ আশ্বিন; ১৩৩৪ চৈত্র, পৃ ৪৪৮

১৪ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৮, ২য় সংখ্যা; প্রবাসী, ১৩৩৮ ফাল্গুন, পৃ ৭০৭

বাঙ্গালী রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ

সংস্কৃত সাহিত্যে বাংলা দেশের বহু দান আছে। তাহার পরিমাণ কি তাহা বলা সহজ নহে।

মন্মথ ভট্টাচার্য প্রভৃতিদের মত কালিদাসকে আমরা নিঃসংশয়ে বাঙ্গালী বলিয়া যদি না-ও ধরি তবু বাঙ্গালী কবি অনেক জন্মিয়াছেন।

পণ্ডিত বীরেশ্বর সেন মহাশয় লিখিয়াছেন যে ভগবদ্‌গীতার রচয়িতা ছিলেন বাঙ্গালী। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বলেন তাঁহার নাম ছিল পদ্মনাভ।[১] এই বিষয়ে আমরা কিছু দাবি করিতেছি না। তবু ধর্ম বিষয়ে বড় বড় বাঙ্গালী লেখক জন্মিয়াছেন।

বাঙ্গালা দেশে সংস্কৃতের চর্চা অতি পুরাতন। কাব্যমীমাংসাকার রাজশেখর গৌড়ের প্রগাঢ় সংস্কৃত বিদ্যার কথা দুই স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন।

ভারতে নানাবিধ সংস্কৃত রীতি বা পদ্ধতি ছিল। গৌড়ী একটি প্রসিদ্ধ রীতি। সাহিত্যদর্শন মতে এই রীতি ওজঃপ্রকাশক বর্ণে সমাসবাহুল্যে আড়ম্বরপূর্ণ। বিশেষ সংস্কৃত চর্চা না থাকিলে এমন একটি রীতির উদ্ভব গৌড়ে হইত না।

বাংলাদেশ যখন বৌদ্ধধর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত তখন বহু বৌদ্ধগ্রন্থ বাংলাদেশে সংস্কৃতে রচিত হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রেও বহু গ্রন্থ বাঙ্গালীর রচনা। বৈদ্যশাস্ত্রে বাংলার যাহা দান সে সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র প্রকরণ লেখা হইয়াছে। আরও নানা বিশেষ বিদ্যার প্রকরণে বাঙ্গালীর রচিত বহু সংস্কৃত গ্রন্থের কথা বলা হইয়াছে।

বাংলার বাহিরের সঙ্গে বাঙ্গালীর যোগ ছিল তখনকার দিনের সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্য দিয়া। তাই প্রাচীনকালে বাঙ্গালীর রচিত সংস্কৃত গ্রন্থগুলির নাম করিতে পারিলেই ভাল হয়। বাংলা গ্রন্থের নাম এইক্ষেত্রে উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই।

এই বিষয়ে পণ্ডিত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় ভাণ্ডারকর ওরিএণ্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট পত্রিকায় একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহা হইতে কিছু উল্লেখ করিয়াছি। এইখানে অল্প কয়েকখানা সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম করা যাইতেছে। ইহা ছাড়া আরও অনেক গ্রন্থকার আছেন।

হস্তীর সম্বন্ধে আলোচনা বাংলাতে বহু পুরাতন। পালকাপ্যের হস্ত্যায়ুর্বেদ খ্রীষ্টপূর্বকালে লেখা। বাংলার ইহা গৌরব।

চন্দ্রগোমিকৃত চান্দ্রব্যাকরণের নাম করা যায়। বরেন্দ্রভূমিতে চন্দ্রগোমির জন্ম। বাংলাদেশ হইতে এই ব্যাকরণ শ্যাম, কাম্বোডিয়া, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানে প্রচারিত হয়। যবদ্বীপে প্রাপ্ত ১৩৬৫ খ্রীষ্টাব্দের এক তাম্রশাসনে দেখা যায় যে তখন সে দেশে চান্দ্রব্যাকরণের যথেষ্ট প্রসার ছিল।

মাধব করের নিদান বিখ্যাত গ্রন্থ। ৮ম শতাব্দীতে হারুণ অল রসীদ ইহার অনুবাদ করান।

পাল রাজত্বকালে গৌড়শিলালেখবর্ণিত মহা মহা পণ্ডিতের দল এই বাংলাদেশেরই গৌরব।

বৌদ্ধরা পাণিনির আদর করিলেও মহাভাষ্যকে সমাদর করেন নাই। রাজ-তরঙ্গিণীর কৃপায় সাধারণতঃ সকলে ইহাই জানেন যে বাংলাদেশে পাণিনীয় মহাভাষ্যের আদর হয় নাই। বৌদ্ধপ্রধান দেশে পাণিনির ব্যাখ্যা হিসাবে বামন-জয়াদিত্য রচিত কাশিকা ও বোধিসত্ত্ব দেশিয়াচার্য শ্রীজিনেন্দ্র বুদ্ধির ন্যাসের সমাদর ছিল। পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন ভাগবৃত্তিকার বাঙ্গালী। পাণিনীয় মতে বাংলাদেশের এইটুকুমাত্র দাবী সকলের জানা আছে। কিন্তু পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে[২] দেখা যায় গৌড়দেশে কৃপালু (পাঠান্তরে কৃপাণ) নরসিংহ নামে রাজা হইয়াছিলেন :

কৃপালুর্ণরসিংহোভূন্নাম্না গৌড়েষু ভূপতিঃ ॥

তাঁহার রাজ্যে ফণীশ্বর মহাভাষ্যকে পুনরায় উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন।

পুনরুজ্জ্বলয়াঞ্চক্রে মহাভাষ্যং ফণীশ্বরঃ ॥

এই নরসিংহ রাজা কে ?

ভাগবৃত্তিকারের পরিচয় লইয়া কিছু মতভেদ আছে। কেহ বলেন ভর্তৃহরি। কিন্তু তাহা বিচারে টেকে নাই। পণ্ডিত ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইয়াছেন[৩] কাতন্ত্র পরিশিষ্টকার শ্রীপতি দত্ত বলিয়াছেন—"ভাগবৃত্তিকৃতা বিমল মতিনা।"

তবেই দেখা যায় তাঁহার নাম বিমলমতি। বাংলাদেশে ভাগবৃত্তিই যথার্থ ভাবে মহাভাষ্য মতবাদী। পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র ঘোষ মনে করেন—ফণীশ্বর স্থলে মুনীশ্বর পাঠ হইবে। কারণ পুরী গোবর্ধন মঠের পুঁথীতে সেইরূপ পাঠ আছে।

খুব সম্ভব বিমলমতিই এই মুনীশ্বর। বিমলমতি জৈন ছিলেন। ৮৫০-১০৫০ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে তাঁহার কাল।

১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দে অমরকোষের একখানি সুন্দর টীকা বাংলাদেশের পণ্ডিত সর্বানন্দ প্রণয়ন করেন। বন্দ্যঘটি অর্থাৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে তাঁহার জন্ম। তিনি দশটি অমরটীকা জানিতেন। তাহাতে তাঁহার মন উঠে নাই বলিয়াই তিনি তাঁহার অপূর্ব টীকা-সর্বস্ব রচনা করেন। গ্রন্থারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন,

অথ টীকাসর্বস্বং দশটীকাবিৎ করোত্যমরকোষে
শ্রীমৎসর্বানন্দো বন্দ্যঘটীয়ার্তিহরপুত্রঃ॥

গ্রন্থ সমাপ্তিতে তিনি বলিতেছেন তিনখানি ব্যাকরণের তিনি পারগামী সকল সাহিত্যের তিনি আলোচনা করিয়াছেন,

ত্রীণি ব্যাকরণান্যধীত্য সকলং সাহিত্যমালোক্য চ।

এই গ্রন্থখানি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিবান্দ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলীতে গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদন করেন। টীকাসর্বস্বের সাতখানি পুঁথি দেখিয়া গ্রন্থখানি সম্পাদিত। সবগুলি পুঁথিই মালয়ালম অক্ষরে লিখিত এবং সেই দেশে প্রাপ্ত। পুঁথিগুলির বয়স তুইশত বৎসরের কম হইবে না।

তিনশতাধিক সংস্কৃত শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ সর্বানন্দ দিয়াছেন। তাহাতে তখনকার দিনের বাংলা শব্দের রূপ কতকটা বুঝা যায়।

বাংলাদেশের প্রাচীন বহু তাম্রশাসনে চমৎকার সংস্কৃত রচনারীতির পরিচয় মেলে। উদাহরণস্বরূপ ধর্মপাল দেবের ৩২ রাজ্যাব্দে সম্পাদিত শাসনের উল্লেখ করা যায়। নারায়ণপাল দেবের মন্ত্রী ভট্টগুরব কৃত যে প্রশস্তি গরুড়স্তম্ভে উৎকীর্ণ পাওয়া গিয়াছে তাহাকে কাব্য বলাই সঙ্গত।[৪]

বাংলাদেশের সাধারণ লোকের আনন্দের জন্য সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিত কাব্য রচনা করেন। গৌড় অভিনন্দের কাদম্বরী-কথা-সার এই জন্যই লিখিত।

বাংলার সৌগত পণ্ডিতেরাও সংস্কৃতেই লিখিয়াছেন। বাংলাদেশে মহাযান ধর্মেরই প্রাতুর্ভাব ছিল। চট্টগ্রামের দিকে যে হীনযান ধর্ম দেখা যায় তাহা পরে ব্রহ্মদেশের দিক হইতে আগত। শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় নামে একখানা শ্লোকসংগ্রহ গ্রন্থ বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকার ১৩০৯নং গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয়। ইহার সংকলন কর্তা বৌদ্ধ ছিলেন। এই গ্রন্থের এক একটি বিষয়ে শ্লোক সংগ্রহের নাম ব্রজ্যা। প্রথমেই

সুগত ব্রজ্যা, তারপরেই লোকেশ্বর বা অবলোকিতেশ্বর ব্রজ্যা। তাহার পর হরিব্রজ্যা ও সূর্যব্রজ্যা। তাহার পর বসন্ত প্রভৃতি ব্রজ্যা। প্রায় নয় শত বৎসরের পুরাতন বাংলা লিপিতে গ্রন্থখানি লিখিত। গ্রন্থের সংগ্রহকর্তার নাম পাওয়া যায় না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুঁথিখানি নেপালে পান। ম্যুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ. ডবলু. টমাস অতিশয় যোগ্যতার সহিত গ্রন্থখানি সম্পাদন করেন। এই গ্রন্থে অপরাজিত রক্ষিত, অচল সিংহ, অভিনন্দ গৌড়, ধর্মকর, বৈদ্যধন, বুদ্ধাকর গুপ্ত, ভ্রমর দেব, মধু শীল, বন্দ্য তথাগত, বীর্যমিত্র, শুভঙ্কর, শ্রীধর নন্দী প্রভৃতি নাম বাঙ্গালীর। তাহা ছাড়া দিব্বোক, ললিতোক, বিতোক, সিদ্ধোক, সোনোক, হিঙ্গোক প্রভৃতি "ওক"-অন্ত নামও বোধ হয় বাঙ্গালীর। খুব সম্ভব ১০০০-১০৫০ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে গ্রন্থখানি বাংলাদেশে সঙ্কলিত হইয়াছিল। চর্যাপদগুলিও এইরূপ নানা কবির সংগ্রহ। এই নানা কবির রচনা হইতে মাধুকরী বৃত্তিতে সংগ্রহ করিবার কাজটা হয়তো বাংলাদেশেই আরম্ভ হইয়াছিল। কারণ কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়ের পরেই বাংলাদেশে কবি শ্রীধরদাস সদুক্তিকর্ণামৃত নামে এক শ্লোক সংগ্রহ রচনা করেন। টমাস সাহেব বলেন সদুক্তিকর্ণামৃত দ্বাদশ শতকে লেখা।[৫] আসলে কিন্তু গ্রন্থখানি লেখা ১১২৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১২০৫ খ্রীষ্ট বৎসরে।

ইহার পরেই কাশ্মীরবাসী জহ্লন কবি ১২৪৭ সালে সুভাষিতমুক্তাবলী সংগ্রহ করেন। ১৩৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বৈদ্য শার্ঙ্গধর যে শ্লোক-সংগ্রহ করেন, তাহা শার্ঙ্গধর পদ্ধতি নামে খ্যাত। পিটারসান সাহেব ১৮৮৮ সালে বোম্বাইতে তাহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করেন। ইহার পূর্বেই ১৮৮৬ সালে পিটারসন সাহেব বল্লভদেবের সংগ্রহ গ্রন্থ সুভাষিতাবলি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা পঞ্চদশ শতকে সংগৃহীত। ইহার কিছুদিন পরে শ্রীধর কবি আর একখানি সুভাষিতাবলি সংগ্রহ করেন। তারপর ক্রমে ব্রজনাথের পদ্যতরঙ্গিণী, বেণী দত্তের পদ্যবেণী, হরি ভাস্করের পদ্যামৃত তরঙ্গিণী, ভট্ট গোবিন্দজিতের সভ্যালঙ্করণ, সুভাষিত প্রবন্ধ, সুভাষিত শ্লোক, সুভাষিত রত্নকোষ, সুভাষিত হারাবলী প্রভৃতি বহু সংগ্রহ গ্রন্থই সঙ্কলিত হইয়াছে। সুভাষিতরত্নভাণ্ডারাগার প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থ বিশাল হইলেও কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় ও সদুক্তিকর্ণামৃতই এই সংগ্রহের পথপ্রদর্শক। উভয় গ্রন্থই বাংলাদেশে সংকলিত। এই সংকলনের পথ দেখাইয়াছেন বাঙ্গালী পণ্ডিত।

সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থখানি সম্পাদন আরম্ভ করেন আমার সতীর্থ পরলোকগত

পণ্ডিত রামাবতার শর্মা, সমাপ্ত করেন শান্তিনিকেতন বিদ্যাভবনের ছাত্র শ্রীমান হরদত্ত শর্মা। তাই এই গ্রন্থখানি আমি যত্নের সহিত ব্যবহার করিয়াছি। পরিশেষে ১৩৫০ শ্রাবণের বিশ্বভারতী পত্রিকায় শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অপূর্ব প্রবন্ধটি দেখিয়াও কিছু কিছু অদল বদল করিয়াছি।

কলিঙ্গরাজ কুলশেখরের প্রধানমন্ত্রী সূর্য সূক্তিরত্নহার সংগ্রহ করেন। সাম্য শিবশাস্ত্রী তাহা প্রকাশ করেন।[৬] ইহার উপজীব্য পুঁথিখানি তিনশত বৎসরের পুরাতন।

সদুক্তিকর্ণামৃত রচয়িতা শ্রীধরদাসের পিতা বটুদাস ছিলেন বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেনের কর্মসচিব প্রতিরাজ ও মহাসামন্ত। মূল সংগ্রহে ২৩৮০ শ্লোক ছিল, তাহার মধ্যে ২৩৭২টি শ্লোক পাওয়া গিয়াছে। অনেক শ্লোকে রচয়িতার নাম শ্রীধর দাস দিতে পারেন নাই। জয়দেবেরও শিবস্তুতি এই গ্রন্থে পাই। বৈদ্যগঙ্গাধরের শিবস্তুতিটিও সুন্দর। শিববিবাহের সর্বাপেক্ষা ভাল শ্লোকটির রচয়িতার নাম নাই। তবু তিনি ৪৮৫ জনের নাম দিয়াছেন। তাহার মধ্যে অর্ধেকের বেশি বোধ হয় বাঙ্গালী কবি। জয়দেব, গোবর্ধন, উমাপতিধর, শরণ, ও ধোয়ী কবিরাজ তো লক্ষ্মণ সেনের সভাতেই ছিলেন। তাঁহাদের অনেক কবিতা এই সংগ্রহে আছে। আদিত্য, কর, গুপ্ত, চন্দ্র, দত্ত, দাস, দেব, ধর, নন্দী, নাগ, পালিত, ভদ্র, মিত্র, রক্ষিত, শীল প্রভৃতি উপাধি তখন লোকে ব্যবহার করিতেন দেখা যায়। ব্রাহ্মণদের নামের সঙ্গে গ্রাম নাম বা গাঞি ব্যবহারও দেখা যায়। বন্দ্যঘটিয় সর্বানন্দ, প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া ভট্টশালী, তৈলপাটী, কেশর কেলীয়, তৈলপাটিয়, তালহরিয়, গাঙ্গোক, করঞ্জ প্রভৃতিও পাই। নটগাঙ্গক কবির কথা সেক শুভোদয়াতেও পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে বল্লাল কবির দুইটি কবিতা আছে। তখনকার দিনে নাথ-পাল-বৈদ্য-সেন প্রভৃতি উপাধিও চলিত ছিল।

এইসব কবিদের মধ্যে কেওট জাতীয় কবি পপীপের একটি গঙ্গাপ্রণতি শ্লোক পাই। বাঙ্গাল কবি পূর্ববঙ্গের নিজ নিজ ভাষাকে ঘনরসময়ী গভীরা গঙ্গাধারাবৎ পাবনী বলিয়াছেন।

কথক সংগ্রহ

এই শ্লোক সংগ্রহের কাজ সুরু হইল বঙ্গদেশে। চৈতন্য যুগের শ্রীরূপ গোস্বামী পদ্যাবলী নামে কৃষ্ণলীলা শ্লোকের সংকলন করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে

বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্লোকমঞ্জরী রচনা করেন। কথকদের মুখেও বহু শ্লোক চলিয়া আসিতেছে। পূর্ববঙ্গের কৃষ্ণকান্ত পাঠক ও তাঁহার কথক শিষ্যগণ প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বেকার একটি চমৎকার সংগ্রহ ব্যবহার করিতেন। কোটালি-পারবাসী বিখ্যাত কথক গুরুনাথ পাঠকের কাছে তাহা আমি দেখিয়াছি। পশ্চিমবঙ্গে ঠাকুরদাস কথক, শ্রীধর পাঠক প্রভৃতিরাও চমৎকার সব সংগ্রহ ব্যবহার করিতেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার একটি বিশাল সংগ্রহ নিজে লিপিবদ্ধ করেন। দাক্ষিণাত্য বৈদিক কুলে পুরাতন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশে তাঁহার জন্ম। তাই সেই সংগ্রহটি অপূর্ব ছিল। তাহার মধ্যে অনেকগুলি শ্লোকে সুরুচিবিরুদ্ধ কথা ছিল। তাই সেই সংগ্রহটি আর বাহির করা হয় নাই। শুনিয়াছি তাহা নষ্ট করা হইয়াছিল।

বোম্বাই প্রদেশে এইরূপ একটি সংগ্রহ সুভাষিতরত্নাকর নামে ভাট বভেডকর কৃষ্ণশাস্ত্রী সংকলন করেন। ১৯০৩ সালে গোপাল নারায়ণ কোম্পানী হইতে উদ্ধব শাস্ত্রী তাহা প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থখানি কথকেরাই বেশি ব্যবহার করেন। তাহা ছাড়া কাশী, বোম্বাই ও দক্ষিণ ভারতে কথকদের চমৎকার সব সংগ্রহ গুরুপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে।

ভাষাতেও চর্যাপদ বাঙ্গালীর অপূর্ব কীর্তি। তাহার পরে আমরা ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রাজপুতানায় সন্ত সাহিত্যের দুইটি সংগ্রহ দেখি। জগন্নাথ কৃত গুণগঞ্জনামা এবং রজ্জব কৃত সর্বাঙ্গী। তাহার পর ১৬০৪ সালে গ্রন্থসাহেব সংগৃহীত হয়। মহাপ্রভু চৈতন্যের অনুবর্তী ভক্তগণও এই কাজ চালাইয়া গিয়াছেন। সপ্তদশ শতক হইতে ক্রমে আমরা ক্ষণদাগীতচিন্তামণি, রাধামোহনের পদামৃতসমুদ্র, গোকুলানন্দ সেনের শ্রীপদকল্পতরু, গৌরসুন্দর দাসের কীর্তনানন্দ প্রভৃতি সংগ্রহে সেই ধারারই অনুবৃত্তি দেখিতে পাই। গীতগোবিন্দের প্রথমেই যে কয়টি শ্লোক আছে তাহাতে উমাপতি ধর, জয়দেব, শরণ, আচার্য গোবর্ধন ও ধোয়ী কবিরাজের নাম স্বয়ং জয়দেব করিয়াছেন। গোবর্ধনাচার্যের প্রণীত আর্যাসপ্তশতীর শ্লোকগুলি সুধীগণের সমাদৃত।

লক্ষ্মণসেন রাজার সভায় যে কয়জন পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই দিগ্বিজয়ী। উমাপতি ধর, শরণ, জয়দেব, গোবর্ধন, শ্রুতিধর, ধোয়ী প্রত্যেকে এক একটি দিক্‌পাল। চতুর্দশ শতাব্দীতে রসিকপ্রিয়া টীকাকার রাজা কুম্ভ গীতগোবিন্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই সভায় ছয় জন পণ্ডিতের কথা বলিয়াছেন।

ইতিষট্‌পণ্ডিতাস্তস্য রাজ্ঞো লক্ষ্মণ সেনস্য প্রসিদ্ধা ইতি রুঢ়িঃ। অর্থাৎ রাজা লক্ষ্মণসেনের এই ছয়জন পণ্ডিতের প্রসিদ্ধির কথা লোকমুখে খ্যাত।[৭]

পবনদূত গ্রন্থে ধোয়ী কবি দক্ষিণ দেশ হইতে গৌড় পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগের একটি চমৎকার বৃত্তান্ত দিয়াছেন। তখনকার দিনের ভূবৃত্তান্তের তাহা একটি সুন্দর নমুনা।

বাংলার সেন রাজারা দক্ষিণ ভারত হইতে আগত। দেওপাড়া লিপির পঞ্চম শ্লোকে দেখা যায় যে তাঁহারা ছিলেন ব্রহ্মক্ষত্রিয় বংশীয়। সেনগণ ধর্মাচার্যও ছিলেন।[৮]

কেরলীয় আচার

সেন রাজারা বাংলা দেশে দক্ষিণ ভারতের অনেক শাস্ত্র ও আচার আনেন। তাহার পূর্ব হইতেও অনেক দক্ষিণী আচার বাংলা দেশে নিশ্চয় ছিল, কারণ বাঙ্গালীর মধ্যে দ্রাবিড়ত্ব অনেক আছে। মালাবারের কেরলাচার দেখিলে বুঝা যায় বাংলার সঙ্গে তাহার সমতা। ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারী চতুর্থ সংখ্যার ২৫৫ পৃষ্ঠায় কেরলাচার সম্বন্ধে এক আলোচনাতে ৬৪টী কেরলীয় আচার বর্ণিত হইয়াছে।

তাহার কয়েকটি আচার বলা যাইতেছে। (৬) দাঁতনের দ্বারা দন্তশুদ্ধি করিবে না। (১) অস্নাত রাঁধিবে না। (৫) বাসি জল ব্যবহার্য নয়। (৬) স্পর্শাশৌচে স্নান (৯, ১০)। পর্যুষিত অন্ন অভোজ্য (১৫)। মহিষ দুগ্ধ ও ঘৃত অমেধ্য (১৯)। কন্যাবিক্রয় নিষিদ্ধ (২৬)। মহাগুরু মরণে বর্ষকাল অশৌচ (৩৬)। মৃতকে তাহার আপন ভূমিতে দাহ করিবে (৪০)। শ্বেতবর্ণ ছাড়া রঙিন বস্ত্র অব্যবহার্য (৪৬)। বিবাহকালে হোম অবশ্যকর্তব্য (৫৩)। শায়িতকে নমস্কার করিবে না (৫৪)। শ্রাদ্ধে ভাতেরই পিণ্ড দিবে (৬০)। বিধবারা ব্রহ্মচর্য পালন করিবেন (৬৩)।—ইত্যাদি

এইসব আচারের তুলনা এই গ্রন্থে ঠিক প্রাসঙ্গিক নহে। তবু উভয় দেশের যোগাযোগ ইচ্ছা করিয়াই দেখান হইল এইজন্য যে শাস্ত্র ও সংস্কৃতিতেও এই যোগের নানা সন্ধান পাওয়া যায়।

কীর্তনের প্রণালীতে ও কীর্তনের তালে উভয় দেশের মধ্যে অনেক যোগ ছিল। প্রাচীন কীর্তনশাস্ত্রগুলি তুলনা করিলে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

পূর্ববঙ্গে বিবাহের কন্যাকে অধিবাসের সময় বরের বাড়ী হইতে যেসব জিনিষ পাঠান হয় তাহার মধ্যে গলার মাদুলি প্রধান। ঐ মাদুলিই দক্ষিণ-ভারতের তালি বন্ধন। তালি বাঁধাই সে দেশে বিবাহের প্রধান অঙ্গ।[৯] বৈদিক এবং শাস্ত্রীয় আচার তো এক হইতেই পারে, তাই তার উল্লেখ না করিয়া এই স্ত্রী আচারই উল্লিখিত হইল।

স্ত্রী না বাঁচিলে পুরুষেরা যে আবার বিবাহ করে তখন তৃতীয় বিবাহ হয় কোনো গাছের সঙ্গে[১০]। নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণদের মধ্যেও বিবাহের সময় একটি জলাশয় রচনা করিয়া মাছধরার ন্যায় খেলা করিতে হয়।

স্ত্রী গর্ভবতী থাকিলে স্বামী মৃতসংকারের কোনো কাজে অংশ লইতে পারেন না।[১১] সন্তান জন্মিবার জন্য বাড়ীর সংলগ্ন স্থানে একটি নূতন সূতিকাগৃহ তৈয়ার করিতে হয়।[১২]

বাংলা দেশে সেন রাজারা হিন্দুসংস্কৃতিকে বৌদ্ধপ্রভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে প্রথমেই মনে পড়ে বল্লালগুরু শ্রীমদ্ অনিরুদ্ধের নাম। ইনি বল্লালের ধর্মাধ্যক্ষও ছিলেন। তাঁহার রচিত পিতৃদয়িতা গ্রন্থ এখনও সমাদৃত। বল্লাল তাঁহার দানসাগরে স্বীয় গুরু অনিরুদ্ধের পরিচয় দিতে গিয়া যে বলিয়াছেন তিনি বরেন্দ্রবাসী; সেকথা পূর্বেই বেদচর্চা প্রকরণে উক্ত হইয়াছে। বল্লালের অদ্ভুতসাগর, দানসাগর প্রভৃতি গ্রন্থ এখনও সমাদৃত। ১১১৮ হইতে ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বল্লাল রাজত্ব করেন।

অনিরুদ্ধকৃত হারলতাগ্রন্থকে রঘুনন্দন স্বীয় শুদ্ধিতত্ত্ব লিখিতে গিয়া বারবার প্রমাণরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। বারবার অনিরুদ্ধ আপনাকে চম্পাহট্টীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাহাতে বুঝা যায় চম্পাহট্ট গ্রামে তাঁহাদের পূর্ব নিবাস ছিল। কিন্তু স্বরচিত হারলতাগ্রন্থে অনিরুদ্ধ জানাইয়াছেন যে তিনি তখন গঙ্গাতীরে বিহারপট্ট গ্রামে বাস করেন।

> সুরাপগাতীরবিহারপট্টকে নিবাসিনা ভট্টনয়ার্থবেদিনা।
> কৃতানিরুদ্ধেন সতামুরঃস্থলে বিরাজতাং হারলতেয়মর্পিতা॥

—ইতি চম্পাহট্টীয় মহোপাধ্যায় ধর্মাধ্যক্ষ শ্রীমদনিরুদ্ধ বিরচিতা দৃশৌচ ব্যবস্থা হারলতা সমাপ্তা,—হারলতা,—কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ সম্পাদিত।

মদনপাল দেবের শাসনে দেখা যায় চম্পাহট্টবাসী কৌৎস গোত্রজ পণ্ডিত ভট্টের পুত্র বটেশ্বর স্বামীশর্মার কথা পাওয়া যায়। বরেন্দ্রদের মধ্যে চম্পটি

বা চম্পাহট্টী ব্রাহ্মণের সংখ্যা এখনও কম নয়। আচার্য কানে মহোদয় তাঁহার গ্রন্থে অনিরুদ্ধকৃত গ্রন্থের সমাদর করিয়াছেন।

বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের পরিচয় যেমন ইতিহাসে প্রখ্যাত তেমনি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনায়ও প্রখ্যাত। তাই কানে মহাশয় তাঁহার ধর্ম শাস্ত্রের ইতিহাসে বার বার ইঁহাদের নাম করিয়াছেন।

হলায়ুধের নামও কানে শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। আচার্য শূলপাণি স্বকৃত শ্রদ্ধা-বিবেক প্রায়শ্চিত্ত বিবেক গ্রন্থ সমাপ্তিতে আপনাকে সাহুড়িয়ান গাঁই বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় বুঝা যায় তিনি রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন।

শ্রীকরাচার্য পুত্র শ্রীনাথাচার্য চূড়ামণির কৃত্যতত্ত্বার্ণব, দুর্গোৎসব বিবেক প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট সমাদৃত। এই শ্রীনাথই নাকি রঘুনন্দনের গুরু। "শূলপাণি পাদৈঃ" বলাতে বুঝা যায় শ্রীনাথ ছিলেন শূলপাণির শিষ্য।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে আচার্য জীমূতবাহন ধর্মরত্ন নামে যে সুবৃহৎ গ্রন্থ লেখেন তাহারই অন্তর্গত হইল প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থ দায়ভাগ। তিনি এই গ্রন্থে নিজেকে পারিভদ্রীয় অর্থাৎ পাড়িহাল গাঁই বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে রঘুনন্দনের দায়তত্ত্ব ও পরে পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশের দায়কৌমুদী দায়ভাগকেই অনুসরণ করিয়া লিখিত। দায়কৌমুদী কামরূপে প্রচলিত। বাংলা দেশে জীমূত-বাহন ও পীতাম্বরই সমাদৃত। দায়ভাগের বহু টীকা। প্রাচীন টীকাকার অচ্যুতানন্দ, আচার্য চূড়ামণি, চণ্ডেশ্বর, মহেশ্বর, রামভদ্র প্রভৃতির গ্রন্থ এখন খুব প্রচলিত নয়। এখন শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের টীকাই বিশেষ আদৃত। কৃষ্ণনাথ ন্যায়-পঞ্চাননের টিপ্পনীরও আদর আছে। পীতাম্বরের মতামত এখনকার আদালতে মান্য নহে।

বর্ষক্রিয়াকৌমুদী রচয়িতা গোবিন্দানন্দ ছিলেন মেদিনীপুর জেলার বগরী গ্রামবাসী। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব এবং পশ্চিমের বৈদিক বংশীয়।

রঘুনন্দন (১৫৬০) বাংলার ধর্মশাস্ত্রের রাজা। বাংলার বাহিরেও তাঁহার সম্মান আছে।

চিরঞ্জীব ও মধুসূদন গোস্বামী বুন্দেলখণ্ডে ও রাজপুতানায় বিশেষ সমাদৃত। পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ ও শম্ভুনাথ আসামে প্রচলিত।

মহাভারতের বিখ্যাত টীকাকার অর্জুন মিশ্র ছিলেন বাঙ্গালী। এই বিষয়ে ১৯৩৫ সালের এপ্রিল খণ্ডের ইণ্ডিয়ান কালচার পত্রে পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ সুন্দর একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। অর্জুন মিশ্রের আশ্রয়দাতা ছিলেন

সত্য খাঁন। গোবর্ধন পাঠক রচিত পুরাণসর্বস্ব গ্রন্থের পুষ্পিকাতেও সত্য খাঁনের পরিচয় আছে। তিনি "শ্রীমদ্ গৌড়পতিপতিপ্রাপ্তপ্রসাদোদয়ঃ"।

অর্জুন মিশ্রের গ্রামের নাম বারেন্দ্র চম্পাহেটী। ঘোষ মহাশয়ের মতে সত্য খাঁনের সময় ১২৮৩-৯১ খ্রীষ্টাব্দ। শ্রীযুক্ত পি, কে, গোড়ে বলেন তিনি ১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি জীবিত ছিলেন।[১৩] কিন্তু ১৯৩৬ সালের জানুয়ারী মাসের ইণ্ডিয়ান কালচার পত্রে ঘোষ মহাশয় যোগ্যভাবে তাঁহার নিজমত স্থাপনা করিয়াছেন।

মহাভারতের প্রসঙ্গ হইল বলিয়া এইখানেই উল্লেখ করা যায় যে বিখ্যাত মহাভারত টীকাকার নীলকণ্ঠ দক্ষিণদেশ প্রচলিত মহাভারতের পাঠ হইতে বাংলা দেশের মহাভারতের পাঠই অধিকতর সমীচীন মনে করিয়াছেন। এই কথাটি ভাল করিয়া দেখাইয়াছেন অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়।[১৪]

ভাগবতের প্রখ্যাত টীকা দীপিকা রচয়িতা শ্রীধর স্বামীও নাকি বাংলা দেশের লোক। বন্দ্যঘটি কুলে তাঁর জন্ম।[১৫]

প্রাচীন কালের কথা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কৃষ্ণমিশ্র প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক রচনা করেন। তাঁহার বাড়ী ছিল. গৌড় রাজ্যের অন্তর্গত রাঢ় দেশের ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রামে।

গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী।
ভূরিশ্রেষ্ঠকনামধাম পরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা ॥[১৬]

শ্রীধরের ন্যায়কন্দলী এই ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রামেই প্রায় শ'খানেক বৎসর পূর্বে রচিত হয়। তাহার কথা পরে বলা হইবে। তাহাতে দেখি ভূরিশ্রেষ্ঠ দক্ষিণ রাঢ়ে। দক্ষিণ রাঢ়ের হইয়াও তিনি দক্ষিণ রাঢ়ের উপর এক এক স্থানে তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন।—"দক্ষিণরাঢ়াপ্রদেশবিশুদ্ধিভির্ণাক্রমণীয়মিদমাসনম্"। "অহঙ্কার" "দম্ভ" প্রভৃতি তিনি দক্ষিণ রাঢ়ীয় করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন।

এই প্রবোধচন্দ্রোদয় গ্রন্থখানিতে আমাদের আন্তর বৃত্তিগুলিকে মানুষ রূপ দিয়া অভিনয় করান হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি সারা ভারতে সমাদৃত হইয়াছিল। গীতগোবিন্দ, যোগবাশিষ্ঠ, গীতার সঙ্গে সঙ্গে দারাস্কোই ইহারও পারসী অনুবাদ করান।[১৭] সেই সূত্রে ইহা পশ্চিম এসিয়া হইয়া য়ুরোপে পর্যন্ত পরিচিত হয়।

শ্রীমান এ, বি, এম, হবিবুল্লা ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিকাল কোয়ার্টার্লির ১৯৩৮ সালের

মার্চ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লেখেন—মধ্যযুগের ভারত-পারস্য সাহিত্য। তাহাতে লেখা কৃষ্ণদাস মিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকখানি ১৬৬২-১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বনওয়ারী দাস পারসী ভাষায় অনুবাদ করেন। তাহার পারসী নাম গুলজার-ই-হাল। মূল নাটকের ছয়টি অঙ্কে ছয় "ঘমন" নামে বিভক্ত হয়। এই পারসী অনুবাদটি ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ নগরে ছাপা হইয়াছিল।

জয়দেবের গীতগোবিন্দের কথা আর কাহাকেও নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। কাশ্মীর হইতে কুমারিকা, দেরা ইসমাইল খাঁ হইতে মণিপুর সর্বত্র তাহার পরম সমাদর। সকল ভক্ত বৈষ্ণবের গাহিবার মত একমাত্র গীতাবলী শ্রীজয়দেব গোস্বামীর।

তাহাতে আমরা উমাপতি ধর, গোবর্ধন, শরণ, ধোয়ী প্রভৃতি কবির নাম পাই। প্রসন্নরাঘবকার জয়দেব আর একজন। ধোয়ী কবির পবনদূত গ্রন্থখানি শ্রীযুত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় সম্পাদন করিয়াছেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়দের আদিপুরুষ ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার ভারতবর্ষে সর্বত্রই সমাদৃত। তাঁহারও দেশ বোধ হয় ভূরিশ্রেষ্ঠের কাছাকাছি।

বাংলা দেশে লক্ষ্মণসেনের সময়ে চমৎকার শ্লোকভাণ্ডার সংগৃহীত হয়। বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস তাঁহার বিখ্যাত সদুক্তিকর্ণামৃত বাহির করেন।[১৮] তাঁহার প্রস্তাবশ্লোকের প্রথমটিতেই লক্ষ্মণসেনের স্তুতি পাই—"স শ্রীলক্ষ্মণসেন একনৃপতি-র্মুক্তশ্চজীবন্নভূৎ"।[১৯]

সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত গ্রন্থখানি অনেকদিন আগে মদনপাল দেবের সময় লেখা। তাহা ঐতিহাসিকদের অত্যন্ত আদরণীয় গ্রন্থ হইলেও বাংলার বাহিরে ইহার পরিচয় কম। বাংলা দেশেও ইহা পণ্ডিতবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কৃপায় সকলের নয়নগোচর হইয়াছে।

প্রথম মহীপাল দেবের সময়ে আর্যক্ষেমীশ্বর চণ্ডকৌশিক রচনা করেন। ভারতের সর্বত্র তাহার প্রসার আছে।

১২০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি বাংলা দেশে বিখ্যাত কবিরাজ বঙ্গসেনের জন্ম. তাঁহার লেখা হইতে হেমাদ্রি তাঁহার অষ্টাঙ্গহৃদয় টীকায় বহুবার অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। হেমাদ্রি ছিলেন দক্ষিণদেশে যাদবরাজ রামচন্দ্রের সমকালীন। ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশ হইতে কোনো গ্রন্থ যে এতদূরে তখনকার দিনে যাইত তাহা বিস্ময়কর। বৈদ্যক গ্রন্থ প্রকরণে এই প্রসঙ্গ ভাল করিয়া আলোচিত হইয়াছে।

মহারাষ্ট্র দেশীয় পণ্ডিত আচার্য কানে যে ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের বিষয়ে বিশদ গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহাতে বিস্তর বাঙ্গালী স্মৃতিশাস্ত্রকারের নাম আছে। তাঁহার গ্রন্থ পরিশিষ্টে বাংলার রচিত বহু স্মৃতিগ্রন্থের ও গ্রন্থকারের নাম পাই। যাঁহারা দেখিতে চাহেন তাঁহারা সেই গ্রন্থ দেখিতে পারেন। এখানে আর বাহুল্য ভয়ে বেশি বিবরণ দেওয়া গেল না।

ঈশান রচিত আহ্নিকপদ্ধতি গ্রন্থের সমাদর বাংলার বাহিরেও আছে। বাসুদেব সার্বভৌমের সময়ে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবদ্বীপে বসিয়া শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি মহাশয় দায়তত্ত্বার্ণব, কৃত্যতত্ত্বার্ণব, উদ্বাহতত্ত্বার্ণব প্রভৃতি বহু গ্রন্থ লেখেন।[২০] ইনি নবদ্বীপের লেখকদের অনেকের পরিচয় দিয়াছেন।

কাতন্ত্রব্যাকরণ প্রকরণে বাংলা দেশের বহু বৈয়াকরণ ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থের কথা লেখা হইয়াছে।

বোপদেবের মুগ্ধবোধ গ্রন্থের উপরও বাংলাদেশ দাবী রাখে।

লক্ষ্মণ সেনের সভায় বৌদ্ধ পুরুষোত্তমকৃত ভাষাবৃত্তি ললিত পরিভাষা, উনাদিবৃত্তি, মনুর টীকা লিখিয়া কুল্লূক যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাহাতে সারা ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত। রঘুনন্দন স্মৃতির অষ্টবিংশতি তত্ত্ব লিখিয়া সর্বশাস্ত্রে অপার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

ইংরাজ রাজত্বকালেও গঙ্গাধর কবিরাজ দেখাইয়াছেন বাংলার প্রতিভা মরে নাই। গঙ্গাধর (১৭৯৮-১৮৮৫) কৃত জল্পকল্পতরু, সুশ্রুতটীকা, মুগ্ধবোধ ও কুসুমাঞ্জলি টীকা, সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, পাতঞ্জলসূত্র ভাষ্য, গোভিল গৃহ্যসূত্র, তৈত্তিরীয় উপনিষদের টীকা, শাণ্ডিল্য সূত্রটীকা, মনুটীকা, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্যটীকা ইত্যাদি দেখিলে বুঝিতে পারি কি বিরাট তাঁহার প্রতিভা ছিল।

বাচস্পত্য তারানাথ তর্কবাচস্পতি (১৮১২-১৮৮৫) চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার (১৮৩৬-১৯০৯) কৃত স্মৃতিচন্দ্রালোচন, কাতন্ত্র ছন্দপ্রক্রিয়া।

কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৮৫৪ ১৯১৭) কৃত উদ্ধার চন্দ্রিকা প্রভৃতির কথাও এখানে স্মরণীয়।

ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল কোয়ার্টালির ১৯৩৭ সালের মার্চ সংখ্যায় পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় আকবরের সংস্কৃত পণ্ডিতদের একটি তালিকা দিয়াছেন। সেই তালিকার মধ্যে অনেকে বাঙ্গালী। যথা—প্রথম স্তরে মধুসূদন সরস্বতী, পরমানন্দ ভট্টাচার্য। চতুর্থস্তরে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সরস্বতী বাসুদেব সার্বভৌমের ভ্রাতুষ্পুত্র বিদ্যানিবাস।

পণ্ডিত শ্রীরামশর্মা মহাশয় আকবরের ধর্মনীতি সম্বন্ধে সুন্দর একটি বিবৃতি দিয়াছেন। আকবরের সমকালীন সংস্কৃত লেখকদেরও একটি তালিকা তিনি দিয়াছেন। তাহাতে কবি কর্ণপুর, রূপ গোস্বামী, রঘুনাথ শিরোমণি, তান্ত্রিক সাধক পূর্ণানন্দ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি বাঙ্গালী পণ্ডিতের নাম আছে। গোপাল ভট্টের নামও ইহাতে আছে। ইনি দক্ষিণ দেশীয় হইলেও ইনি গৌড়েরই একজন ভক্ত বনিয়া গিয়াছেন।

কবিকর্ণপুরের নাম পরমানন্দ সেন। ইহার জন্ম ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে। মহাপ্রভু ইহাকে কবিকর্ণপুর নাম দেন। ইহার রচিত আনন্দ বৃন্দাবনচম্পূ হইতে ভক্ত তুলসী দাস তাঁহার রামায়ণে কিছু সহায়তা পাইয়াছেন।[২১]

শ্রীরামশর্মা মহাশয় জাহাঙ্গীরের রাজ্যকালের সংস্কৃত গ্রন্থ রচয়িতাদের তালিকা দিয়াছেন ইণ্ডিয়ান কালচার পত্রের ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসের ৩২১ পৃষ্ঠায়। শাহ্‌জাহানের সময়কার তালিকা দিয়াছেন ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল কোয়ার্টার্লি পত্রিকায়। আওরংজেবের রাজনীতি তিনি বিবৃত করিয়াছেন ২১৫ ও ৩৯১ পৃষ্ঠায়।

সেই সময়কার সংস্কৃত গ্রন্থকারদের তালিকা তিনি দেন নাই। তাঁহার দেওয়া জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জাহানের সময়কার সংস্কৃত গ্রন্থকারদের মধ্যেও বাঙ্গালী গ্রন্থকারদের অনেকের নাম পাই।

এই গ্রন্থেই প্রকরণান্তরে চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের নাম দেওয়া হইয়াছে। তিনি গোয়ালিয়রের অন্তর্গত লাহাইর পতি রাজা গোবর্ধনের আশ্রিত ছিলেন। তাঁহার রচিত বিদ্বানোন্মাদতরঙ্গিণী কাব্য, বিলাস প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নিকট আজও আদরণীয়। তাঁহার পিতা রাঘবেন্দ্রও প্রখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

প্রমাণ-পঞ্জী

১ ভারতবর্ষ, ১৩৩৯ বৈশাখ, পৃ ৬৬০

২ ১৮৯ অধ্যায়, বঙ্গবাসী সংস্করণ

৩ ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল কোয়ার্টার্লি, ১৯৩১

৪ গৌড়লেখমালা, পৃ ৭১-৭৬

৫ কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় উপক্রমণিকা, পৃ ৭

৬ ত্রিবান্দ্রাম স্যাংস্কৃট সিরিজ, ১৪৯

৭ পবনদূত, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, পৃ ২

৮ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ভারতবর্ষ, ১৩২৮ মাঘ ; প্রবাসী, ১৩২৮ ফাল্গুন, পৃ ৬৪৩
৯ মাইশোর ট্রাইব্‌স্ এণ্ড কাস্টস্ পৃ ৩৩৪
১০ ঐ পৃ ৩৪৭
১১ ঐ পৃ ৪৯৬
১২ ট্রাইব্‌স্ এণ্ড কাস্টস্ অব সাদার্ণ ইণ্ডিয়া—থার্সটান
১৩ ইণ্ডিয়ান কালচার, জুলাই ১৯৩৫
১৪ ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল কোয়ার্টার্লি, সেপ্টেম্বর ১৯৪০
১৫ ভারতবর্ষ, ১৩৫১, কার্তিক, পৃ ৩২১
১৬ প্রবোধচন্দ্রোদয়, ২য় অঙ্ক, ৭
১৭ ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল কোয়ার্টার্লি, ১৯৩৬
১৮ কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়—এফ. ডবলু. টমাস
১৯ সদুক্তিকর্ণামৃত—রামাবতার শর্মাকৃত, পৃ ১
২০ কালীকিঙ্কর গাঙ্গুলী, বসুমতী, ১৩৪৫, আষাঢ়, পৃ ৩৮১—৩৮৭
২১ রামনরেশ ত্রিপাঠী সম্পাদিত রামচরিত মানস, ভূমিকা, পৃ ১৬০

দর্শন গ্রন্থ

জৈনশাস্ত্রের লেখক চন্দ্রগুপ্তের গুরু রুদ্রবাহু বাঙ্গালী ছিলেন সে কথা জৈন-প্রকরণে লেখা হইয়াছে। শরৎচন্দ্র দাসের মতে নালন্দার প্রধান আচার্য শান্ত-রক্ষিত ছিলেন গৌড়বঙ্গের লোক। তিনি অষ্টম শতাব্দীতে তিব্বতে গিয়া ৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সমেং মঠ স্থাপনা করেন এবং পদ্মসম্ভবকে তিব্বতে আমন্ত্রণ করেন। সতীশ বিদ্যাভূষণের মতে শান্তরক্ষিত জাহোরের রাজবংশে জাত। এই জাহোর কোথায় ছিল? বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন ইহা বাংলা দেশেই ছিল। বিক্রমপুরে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতীশের জন্ম। সাভারে ৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে শান্তরক্ষিতের জন্ম। সাভার তিব্বতীতে জাহোর হইতে পারে। তিব্বতে ১৩ বৎসর বাস করিয়া ৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে ৫৭ বৎসরে তিন পরলোক গমন করেন।

পদ্মসম্ভব শান্তরক্ষিতের ভগ্নীকে বিবাহ করেন। পদ্মসম্ভব ছিলেন উড্ডিয়ানের রাজার পুত্র।

শান্তরক্ষিতের শিষ্য কমলশীল ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও অতিশয় বিদ্বান ও বহু গ্রন্থের রচয়িতা। আচার্য শান্তরক্ষিতের বিখ্যাত গ্রন্থ তত্ত্ব-সংগ্রহ এবং কমলশীল কৃত পঞ্জিকা টীকা কৃষ্ণমাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া গায়কোয়াড় প্রাচ্য গ্রন্থাবলীতে ৩০শ গ্রন্থরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। শান্তরক্ষিতের ইতিহাস সেই গ্রন্থের ভূমিকায় বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের লিখিত। তাহা হইতেই এখানে উদ্ধৃত হইয়াছে। শান্তরক্ষিতের রচিত বহু গ্রন্থের নাম সেখানে দেওয়া আছে। এই ভূমিকাতে বহু প্রাচীন গ্রন্থকারের পরিচয় আছে তাহার মধ্যে শুভগুপ্ত একজন। সতীশ বিদ্যাভূষণ বলেন শুভগুপ্ত রায় পালের সমকালীন অর্থাৎ ১০৮০ সালের কাছাকাছি জীবিত ছিলেন। কিন্তু শান্তরক্ষিত শুভগুপ্ত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য বলেন শুভগুপ্তের সময় ৬৪০-৭০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

বঙ্গীয়দের রচিত সংস্কৃত গ্রন্থের বিষয়ে ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারীতে[১] শ্রীযুত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের লিখিত সুন্দর প্রবন্ধটি পড়িতে বলি।

তিনি বলেন, বৌদ্ধ দর্শন ছাড়াও বাংলাদেশে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে

পূর্বমীমাংসা ও বৈশেষিকের আলোচনা ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর কাছাকাছি পূর্বমীমাংসার স্থান অধিকার করিল স্মৃতি। বেদান্ত দর্শনের আলোচনা কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুব চলিতেছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ও ষোড়শের আদি ভাগে ন্যায় বৈশেষিকের আলোচনা আরম্ভ হয়। পরে ন্যায়ের আলোচনা বাংলায় মুখ্য বস্তু হইয়া উঠিল। নারায়ণ কৃত ছান্দোগ্যপরিশিষ্টপ্রকাশ রীতিমত প্রাচীন। দেবপালের সময়ে ইহার উল্লেখ মেলে।

রাজা মহীপালদেবের বানগড় লিপিতে দেখা যায় তখন মীমাংসা শাস্ত্রের আলোচনা ছিল।[২]

কেহ কেহ মনে করেন গৌড়মীমাংসক শালিকনাথ বাঙ্গালী। তাহা হইলে সপ্তম শতাব্দীতেই বাংলায় মীমাংসা শাস্ত্রের বিলক্ষণ প্রচার ছিল। ভট্ট ভবদেবের মীমাংসাদর্শনে তিনি কুমারিল ভট্টের একটি টীকা লেখেন (১২শ শতাব্দী)। লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ হলায়ুধ মীমাংসাসর্বস্ব লেখেন। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের (১৫শ শতাব্দী) অধিকরণ কৌমুদী, চন্দ্রশেখর বাচস্পতির ধর্ম দীপিকা, (১৮শ শতাব্দীর আদিভাগ)। বরেন্দ্রবাসী চন্দ্রশেখরের তত্ত্বসংবোধিনী, রঘুনাথ ভট্টাচার্যের মীমাংসারত্ন এইখানে উল্লেখযোগ্য।

প্রমাণ-পঞ্জী

১ ১৯২৯, নভেম্বর, ডিসেম্বর

২ মীমাংসা ব্যাকরণ তর্কক বিদ্যাবিদে গৌড়লেখমালা, পৃ ৯৭

বেদান্ত

বাসুদেব সার্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদ অদ্বৈত মকরন্দের টীকা লেখেন। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজনিগ্রহে দেশ ছাড়িয়া কাশী চলিয়া যান তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

মান্দ্রাজ আদিয়ার গ্রন্থালয়ে উপনিষৎ টীকার বহু পুঁথি পাওয়া গিয়াছে যাহা বঙ্গাক্ষরে লেখা। মেদিনীপুর জেলায় বেদান্ত তত্ত্বমঞ্জরী বঙ্গাক্ষরে লেখা পুঁথি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পাইয়াছেন।

গৌড়পাদের কারিকার কথা ভুলিলে চলিবে না। তারপরে নাম করিলে বলিতে হয় গৌড় পূর্ণানন্দ কবি চক্রবর্তীর তত্ত্বমুক্তাবলী "মায়াবাদ শতদূষণী"। এই গ্রন্থাংশ সর্বদর্শন সংগ্রহে উদ্ধৃত[১]।

বাসুদেব সার্বভৌম অদ্বৈত মকরন্দের একটি টীকা লেখেন। রঘুনাথ শিরোমণি লেখেন শ্রীহর্ষের খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্যের টীকা। ব্রহ্ম নির্ণয় গ্রন্থ-লেখক গদাধর কোন্ গদাধর ?

মধুসূদন সরস্বতীর নাম স্থানান্তরে বলা হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থ অসংখ্য এবং সবই অতি গভীর ভাবে পূর্ণ।

গৌড় ব্রহ্মানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী তাঁহারই সমসাময়িক। অদ্বৈত সিদ্ধি সিদ্ধান্তবিন্দুর উপর তাঁহার নিজস্ব গ্রন্থ অদ্বৈত সিদ্ধান্ত বিদ্যোতন।

নন্দরায় তর্কবাগীশ লেখেন আত্মপ্রকাশ।[২] তাহার পর কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ রামানন্দ বাচস্পতি মহাশয়ের লেখা বহু বেদান্ত গ্রন্থ আছে। তিনি পরে সন্ন্যাসী হইয়া রামানন্দ তীর্থ হন। কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশও নানা বিষয়ে বহু গ্রন্থ লেখেন। তাহার মধ্যে ন্যায় বেদান্তও আছে।

সারা ভারতে এবং ভারতীয় সব ধর্মসাধনায় সাংখ্যেরই আদর। সাংখ্য মতের প্রবর্তক কপিল মুনি নাকি গঙ্গাসাগরসঙ্গমবাসী। গঙ্গাসাগর বাংলা দেশে। বাংলা দেশেও ধর্মসাধনায় নানা প্রাকৃত মতে সাংখ্যেরই মুখ্য স্থান। সাংখ্যের প্রাচীনতম রূপ কি ছিল বলা কঠিন। তবে ঈশ্বর কৃষ্ণের ৭০টি কারিকার উপরই বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার তত্ত্বকৌমুদী লেখেন। হুয়েন সাংএর শিষ্য কুয়েকী চীন ভাষায় অনুবাদ কালে লেখেন (বিজ্ঞপ্তি মাত্র সিদ্ধি টীকায়) যে

কপিলের অষ্টাদশ শিষ্য মধ্যে বর্ষ বা বার্ষগণ কর্ণসুবর্ণে (রাঢ় দেশে) এক বৌদ্ধ পণ্ডিতকে হারাইয়া সেখানে তাঁহার কারিকা সপ্ততি রচনা করেন।[৩]

কেহ কেহ বলেন তাঁহার শিষ্য বিন্ধ্যবাস। তিনিই ঈশ্বর কৃষ্ণ। তিনি কৌশিক কুলে জন্মিয়া পঞ্চ শিখাচার্যের ষষ্টি তন্ত্রের সংক্ষেপ করেন।

সাংখ্য সূত্রে টীকাকার অনিরুদ্ধ বোধ হয় বল্লালগুরু অনিরুদ্ধ। বল্লাল দান-সাগরে অনিরুদ্ধের যে বিবরণ পাই তাহা এই,

বেদার্থস্মৃতিসংকথাদিপুরুষঃ শ্লাঘ্যো বরেন্দ্রী তলে
নিস্তন্দ্রো জলধী বিলাস নয়নঃ সারস্বত ব্রহ্মণি।
ষট্ কর্মাহ ভবদার্য-শীল নিলয়ঃ প্রখ্যাত সত্যব্রতো
বৃত্রারেরিবগীষ্পতি নয়শতেরস্যানিরুদ্ধো গুরুঃ ॥[৪]

রঘুনাথ তর্কবাগীশ ঈশ্বর কৃষ্ণ কারিকার টীকা সাংখ্যবৃত্তি প্রকাশ লেখেন। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সাংখ্যকৌমুদীও তাহাই। এই সঙ্গে রামানন্দ কৃত সাংখ্য পদার্থমঞ্জরীর নাম করা উচিত।

বৈশেষিক

শ্রীধরের ন্যায়কন্দলী তাঁহার অদ্বয়সিদ্ধি ও তত্ত্ববোধসংগ্রহ টীকা প্রখ্যাত গ্রন্থ। ইহা ছাড়া দর্শনে নানা শাখায় আরও বহু গ্রন্থ আছে। ন্যায়ের কথা পরেই বলা হইতেছে। রাঢ়দেশের উত্তর দক্ষিণ দুই ভাগের কথা আমরা পাই। বল্লাল সেনের নৈহাটী তাম্রশাসনে এবং বেলাব তাম্রশাসনে উত্তর রাঢ়ের কথা পাই। শ্রীধরের ন্যায় কন্দলীতে দক্ষিণ রাঢ়ের কথা পাই।[৫]

দক্ষিণ রাঢ়ের মধ্যে ভূরিকর্মা ব্রাহ্মণদের নিবাসস্থান ভূরিশ্রেষ্ঠি জনাশ্রয় ভূরিসৃষ্টি গ্রাম ছিল।

আসীদ্ দক্ষিণরাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্মণাম্।
ভূরি সৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরি শ্রেষ্ঠি জনাশ্রয়ঃ ॥[৬]

"সেখানকার ব্রাহ্মণকুলে অম্ভোরাশি হইতে ক্ষিতিচন্দ্রমা জগদানন্দ হেতু বন্দনীয়............সেখানেই বিশুদ্ধগুণ রত্ন মহা সমুদ্র বিদ্যালতা সমালম্বন ভূরুহ স্বচ্ছাশয় বিবিধ কীর্তি নদীপ্রবাহ প্রস্বাপন—উত্তম-বল বলদেব নামে দ্বিজের জন্ম।" এই বলদেব তাঁহার পিতা, অব্বোকাদেবী তাঁহার মাতা। এখানে ত্র্যধিকদশোত্তর

নবশত শকাব্দে অর্থাৎ ৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীপাণ্ডুদাসের অনুরোধে শ্রীধরের দ্বারা ন্যায়কন্দলী টীকা সমাপ্ত হয়।

কাশী সরস্বতীভবন আলোচনা তৃতীয় খণ্ড হইতে শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ ন্যায়বৈশেষিক গ্রন্থকারদের একটি পরিচয় কয়েক খণ্ডে দিয়াছেন। তাহাতে ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তের নাম পাই, কাশ্মীরবাসী গৌড়ীয় পণ্ডিতরূপে। ইহার কথা অন্যত্র বলা হইয়াছে। শ্রীধরের কথা এইমাত্র হইল। নবদ্বীপে বিদ্যানগরে রাঢ়ীয় বংশে বিশারদ মহেশ্বরের জন্ম। তিনি বেদান্ত শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ও কাশীবাসী ছিলেন। তাঁহার পুত্র বাসুদেব সার্বভৌম মহাপ্রভুর সময়কার। তিনি উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রদেবের দ্বারা পূজিত। বাসুদেবের ছোট ভাই নবদ্বীপেই শাস্ত্রচর্চায় রত রহিলেন। বাসুদেবের পুত্র জলেশ্বর বাহিনীপতি মহাপাত্র ভট্টাচার্য উড়িষ্যায় ছিলেন। উদয়নাচার্যের কুসুমাঞ্জলি কারিকার, গঙ্গেশের তত্ত্বচিন্তামণির, পক্ষধরের চিন্তামণ্যালোকের টীকা লেখেন হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য। জানকীনাথ ভট্টাচার্য চূড়ামণির ন্যায়সিদ্ধান্ত মঞ্জরী প্রভৃতি। তারপর মহনীয় কীর্তি রঘুনাথ শিরোমণি। শ্রীহট্ট পঞ্চখণ্ডে তাঁহার জন্ম। গঙ্গাতীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে সঙ্গীদের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া মাতার সঙ্গে তিনি বাসুদেবের গৃহে আশ্রয় পান। পরে মিথিলায়ও পড়িতে যান। তিনি উদয়ন-শ্রীহর্ষ-বল্লভ-গঙ্গেশ-বর্ধমান রচিত গ্রন্থের টীকা ও পদার্থ নিরূপণ গ্রন্থ লেখেন। তারপর মথুরানাথ তর্কবাগীশ, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ-ভট্টাচার্য, রামরুদ্র তর্ক-বাগীশ, রামভদ্র সার্বভৌম, জগদীশ তর্কালঙ্কার, রাঘবেন্দ্র, রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ, গৌরীশঙ্কর সার্বভৌম, হরিরাম তর্কবাগীশ, জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন, গদাধর ভট্টাচার্য, রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার, জয়রাম তর্কালঙ্কার, বিশ্বনাথ ন্যায়সিদ্ধান্ত পঞ্চানন, ত্রিলোচন দেব, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য চক্রবর্তী, মহাদেব ভট্টাচার্য, রামচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ, শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি বড় বড় গ্রন্থ ও টীকা গ্রন্থ প্রণেতা নৈয়ায়িকের পরিচয় পঞ্চমখণ্ডে দিয়াছেন। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থের সংখ্যা এত বেশি যে পড়িতে ধৈর্য থাকিবে না। কত আর বলা যায়।

তাহার পূর্বে ভেদসিদ্ধি রচয়িতা বিশ্বনাথ পঞ্চাননের কথা একটু বলা যাউক। ১৬৩৪ সালে ইনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি বাসুদেব সার্বভৌমের ভাইপো বিদ্যানিবাসের পুত্র। ইঁহার রচিত ভাষা পরিচ্ছেদ, কারিকাবলী, ন্যায়সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী প্রভৃতি ন্যায়গ্রন্থ[১]। ইঁহার রচিত মাংসতত্ত্ব-বিবেক মাংসাহারের যৌক্তিকতা বিচার লইয়া।

সর্ববিদ্যানিধান কবীন্দ্রাচার্য সরস্বতী দিল্লীতে সাহজাহানের সময়ে দরবারে গিয়া কাশীতে যাত্রীদের ট্যাক্স রহিত করান। বিশ্বনাথ তাঁহাকে অভিনন্দন করেন। তাহাতেই বিশ্বনাথের কাল মনে হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে।[৮]

১ ১৪শ শতাব্দা

২ ১৭শ শতাব্দী

৩ সুবর্ণসপ্ততি শাস্ত্র এন আয়াস্বামী শাস্ত্রী, বেঙ্কটেশ্বর ওরিয়েণ্টাল সিরিজ

৪ ইন্‌স্ক্রিপসন অব বেঙ্গল, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ১৭৫

৫ ইন্‌স্ক্রিপসন অব বেঙ্গল, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৯০

৬ প্রশস্ত পদ ভাষ্যে, শ্রীধরকৃত ন্যায়কন্দলী টীকার সমাপ্তি ভাগ

৭ কাশী সরস্বতীভবন আলোচনা ৪২ নং ভূমিকা

৮ কাশী সরস্বতীভবন আলোচনা ২০ নং ভূমিকা—গোপীনাথ কবিরাজ

বঙ্গে ন্যায়চর্চা

শ্রীধরের ন্যায়কন্দলী (৯৯১ খ্রীষ্টাব্দ) রাঢ়ের রচনা। অতি প্রাচীন সময়ে বাঙ্গালীর দৃষ্টি ন্যায়শাস্ত্রের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে বঙ্গীয় নৈয়ায়িকগণের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমার স্নেহাস্পদ সহকর্মী শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য দিয়াছেন। তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

পঞ্চদশ শতাব্দী হইতেই ন্যায়বিদ্যার প্রতি বহু ধুরন্ধর শাস্ত্রব্যবসায়িগণের দৃষ্টি পড়ে এবং তাঁহাদের বিশ্ববিখ্যাত পাণ্ডিত্য ন্যায়শাস্ত্রকে এক অপরূপ সম্পদে গড়িয়া তুলিয়াছে। মহাগুরু গঙ্গেশকে না ধরিলেও পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে —রঘুনাথ শিরোমণি চিন্তামণিদীধিতি, বৌদ্ধাধিকারশিরোমণি, পদার্থখণ্ড, কিরণাবলী প্রকাশদীধিতি, লীলাবতী প্রকাশদীধিতি অবচ্ছেদকত্বনিরুক্তি, নঞবাদ, আখ্যাতবাদ, খণ্ডন খণ্ডখাদ্যদীধিতি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঠিক একই সময়ে বাসুদেব সার্বভৌম সার্বভৌম নিরুক্তি, হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার কুসুমাঞ্জলি ব্যাখ্যা তত্ত্বচিন্তামণি প্রকাশ মণ্যালোকটিপ্পনী প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে আমরা আরো কয়েকজনকে ঐ কাজে ব্যাপৃত দেখিতে পাই।

জানকীশর্মার লিখিত ন্যায় সিদ্ধান্তমঞ্জরী কণাদ তর্কবাগীশের মণিব্যাখ্য ভাষারত্ন, অপশব্দখণ্ডন, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য চক্রবর্তীর গুণশিরোমণি প্রকাশিকা, কৃষ্ণদাস সার্বভৌমের তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি প্রসারিণী, অনুমানালোক প্রসারিণী, গুণানন্দবিদ্যাবাগীশের অনুমানদীধিতিবিবেক, আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতিটীকা, গুণবৃত্তিবিবেক, কুসুমাঞ্জলিবিবেক, ন্যায়লীলাবতী প্রকাশদীধিতিবিবেক, শব্দালোকবিবেক প্রভৃতি গ্রন্থ ঐ সময়েই রচিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে, সম্ভবতঃ ১৫৬০-১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে, সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মথুরানাথ তর্কবাগীশ নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেন—

১। তত্ত্বচিন্তামণি রহস্য, ২। আলোক রহস্য,
৩। দীধিতি রহস্য, ৪। সিদ্ধান্ত রহস্য,
৫। কিরণাবলী প্রকাশ রহস্য, ৬। ন্যায়লীলাবতী প্রকাশ রহস্য,
৭। লীলাবতী প্রকাশ দীধিতি রহস্য, ৮। বৌদ্ধাধিকার রহস্য

গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশও ঠিক সেই সময়েই অনুমানদীধিতিবিবেক, আত্ম-তত্ত্ববিবেকদীধিতিটীকা, গুণবৃত্তিবিবেক ন্যায়কুসুমাঞ্জলিবিবেক, লীলাবতীপ্রকাশ-দীধিতিবিবেক প্রভৃতি গ্রন্থ উপহার দিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রুদ্রবাচস্পতি, জগদীশ তর্কালঙ্কার, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিরাম তর্কবাগীশ এবং বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননকে আমরা ন্যায় গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যাপৃত দেখি।

বাচস্পতির তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতিপ্রকাশিকা, পদার্থখণ্ডন ব্যাখ্যা, কিরণাবলী প্রকাশ বিবৃতি পরীক্ষা, সিদ্ধান্তবাগীশের দীধিতিপ্রকাশিকা (যাহা ভবানন্দী নামে খ্যাত), প্রত্যক্ষালোক সারমঞ্জরী এবং চিন্তামণিটীকা, ন্যায়পঞ্চাননের নঞবাদটীকা, ন্যায়সূত্রবৃত্তি, ন্যায়তন্ত্র বোধিনী, পদার্থতত্ত্বালোক এবং সিদ্ধান্তমুক্তাবলী সহভাষা পরিচ্ছেদ আর জগদীশ তর্কালঙ্কারের দীধিতি প্রকাশিকা, চিন্তামণি ময়ূখ, ন্যায়াদর্শ, তর্কামৃত, দ্রব্যভাষ্যটীকা, লীলাবতীদীধিতি ব্যাখ্যা এবং শব্দশক্তি প্রকাশিকা সুধীসমাজে কিরূপ সমাদৃত তাহা সকলেই জানেন। ঠিক একই সময়ে হরিরাম তর্কবাগীশের চিন্তামণিটীকাবিচার, আচার্যমতরহস্য বিচার এবং রত্নকোষবিচার লিখিত হয়। ঐ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ —শব্দশক্তি সুবোধিনী নামে শব্দশক্তি প্রকাশিকার একখানি টীকা লিখেন। গোবিন্দ বাচস্পতি ন্যায়সংক্ষেপ ও পদার্থখণ্ডনব্যাখ্যা, রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার চিন্তামণি গূঢ়ার্থদীপিকা, কুসুমাঞ্জলি ব্যাখ্যা, দীধিতিটীকা, দ্রব্যসার সংগ্রহ এবং নবীন নির্মাণ এবং গদাধর ভট্টাচার্য দীধিতি প্রকাশিকা, চিন্তামণিব্যাখ্যা, মুক্তিবাদ, ব্যুৎপত্তিবাদ, বিধিবাদ, শক্তিবাদ প্রভৃতি প্রায় ১৩ খানি গ্রন্থ লিখিয়া ন্যায়শাস্ত্রে অনেক মৌলিক গবেষণা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাদগ্রন্থগুলির পঠন-পাঠন পণ্ডিত সমাজে খুবই প্রচলিত এবং গদাধরী টীকাই ভট্টাচার্য টীকা নামে প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ দীধিতি, জাগদীশী এবং গদাধরীই বর্তমান-নৈয়ায়িক সমাজে বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে নৃসিংহ পঞ্চানন, রামরুদ্র তর্কবাগীশ, শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার, রামভদ্র সার্বভৌম এবং জয়রাম তর্কালঙ্কারের রচিত কয়েকখানি টীকাগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়—তন্মধ্যে সিদ্ধান্ত মুক্তাবলীর রামরুদ্রী টীকাই সমধিক আদৃত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুদ্ররাম ভট্টাচার্য বাদপরিচ্ছেদ এবং বৈশেষিক পদার্থ নিরূপণ নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ ন্যায়রত্নাবলী, উপমান

চিন্তামণিটীকা এবং শব্দশক্তি প্রকাশিকার একখানি টীকা লিখেন, তন্মধ্যে শব্দশক্তির ঐ টীকাই পণ্ডিত সমাজে অধুনা আলোচিত হইয়া থাকে। কালীশঙ্কর ভট্টাচার্যের টিপ্পনীও (ভট্টাচার্য টীকার উপরে লিখিত এবং কালীশঙ্করী নামে প্রসিদ্ধ) অবশ্য পাঠ্যরূপে নৈয়ায়িক সমাজে বিশেষ আদর লাভ করিয়াছে।[১]

বঙ্গাক্ষরে লেখা কালীশঙ্করী আমি কর্ণাট মালাবার সিন্ধুদেশের ন্যায়-শিক্ষার্থীদেরও পড়িতে দেখিয়াছি। ভারতের দক্ষিণতম ভাগে গৌতমীয় ন্যায়সূত্রের বিশ্বনাথ কৃত বৃত্তি বাংলা অক্ষরে প্রচলিত দেখিয়াছি। এখন অবশ্য তাহা আনন্দাশ্রমের গ্রন্থমালায় শ্রীবিনায়ক গণেশ আপ্তে কর্তৃক সম্পাদিত হওয়ায় তাহা সকলের সুখলভ্য হইয়াছে। এই বিশ্বনাথের পিতার নাম ছিল বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য।

রঘুনাথ শিরোমণির অনুমান দীধিতি, বাসুদেব সার্বভৌমের সমাসবাদ ও চিন্তামণি ব্যাখ্যা, বাসুদেবের চিন্তামণি ব্যাখ্যার নাম "সারাবলী" পত্র সংখ্যা ১৯৯।

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এই গ্রন্থ উদ্ধার করেন। তাহাতে আরও গ্রন্থ হইতে নানা উপাদান সংগ্রহ করিয়া বাসুদেব, তাঁহার ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি, পুত্র জলেশ্বর বাহিনীপতি, পিতা মহেশ্বর রচিত ন্যায় গ্রন্থের আলোচনা প্রত্যক্ষ মাহেশ্বরী[৩] আপাতদৃষ্টিতে এই মহেশ্বরেরই মনে হয়। কিন্তু তাহা নহে। ইহা মিথিলার মহেশের রচিত। বাসুদেবের পূর্বেও বহু বাঙ্গালী নৈয়ায়িকের মত বাসুদেবাদির আলোচিত বাসুদেব পুত্র জলেশ্বর বাহিনীপতি মহাপাত্র বিরচিত শব্দালোকদ্যোত গ্রন্থের সম্পূর্ণ প্রতিলিপি কাশীর সরস্বতী ভবনে রক্ষিত[৪]। বাহিনীপতির পুত্র স্বপ্নেশ্বরাচার্য শাণ্ডিল্য সূত্রের ভাষ্যশেষে আত্মপরিচয়ে লিখিলেন,

> গৌড়ক্ষ্মাবলয়ে বিশারদ ইতি খ্যাতশ্চভূভৃন্মণেঃ
> সর্বাধিপতি সার্বভৌম পদভাক্ প্রজ্ঞাবতামগ্রণীঃ।
> তস্মাদাস জলেশ্বরো বুধবরো সেনাধিপঃ ক্ষ্মাভৃতাং
> স্বপ্নেশেন কৃতং তদঙ্গজনুষা সদ্ভক্তি মীমাংসনম্ ॥[৫]

সার্বভৌম ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির পুত্র বিদ্যানিবাস ও পৌত্র রুদ্রন্যায় বাচস্পতিও স্ব স্ব গ্রন্থে বিশারদ হইতেই আত্মপরিচয় দিয়াছেন। বিশারদ (চৈতন্য ভাগবতে মহেশ্বর ও সার্বভৌম রচিত অদ্বৈত মকরন্দ টীকায় নরহরি বিশারদ) ফণিভূষণ তর্কবাগীশ উদ্ধৃত,

ভট্টাচার্য বিশারদান্নরহরে যং প্রাপ ভাগীরথী ॥

পিতা নরহরি মাতা ভাগীরথী বেদান্তজ্ঞ ছিলেন। মথুরানাথের মতে নৈয়ায়িকও। খুব সম্ভব এই বিশারদই সুলতান বার্বক সাহের রাজত্বকালে, ১৩৯৭ শকাব্দের পরে এক স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করেন। নবদ্বীপ প্রবাদ অনুসারে তিনিও স্মার্ত ছিলেন। নরহরি চৈতন্য-মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তীর সহাধ্যায়ী। নবদ্বীপের নৈয়ায়িক বাসুদেব ও উড়িষ্যার বৈদান্তিক বাসুদেব অভিন্ন।

শব্দালোকোদ্দ্যোত পুঁথির জনেশ্বরের মঙ্গলাচরণ শ্লোক,

নৈগমে বচসি নৈপুণং বিধেঃ সার্বভৌমপদং সাভিদং মহঃ।
জীর্ণ তর্কতন্তু জীবনৌষধং জৈমিনের্জয়তি জঙ্গমং যশঃ।

পদ্যাবলীতে সার্বভৌমের নিজের উক্তিই আছে,

জ্ঞাতং কাণভুজং মতং, পরিচিতৈবান্বীক্ষিকী, শিক্ষিতা
মীমাংসা বিদিতৈব সাংখ্যসরণির্যোগেবিতীর্ণা মতিঃ।
বেদান্তঃ পরিশীলিতাং সরভসং, কিন্তু স্ফূরন্মাধুরী
ধারা কাচন নন্দ সূনুমূরলিমর্চিতমাকর্ষতি ॥

জনেশ্বর উড়িষ্যাবাসী ছিলেন—মহাপাত্র উপাধি তার সাক্ষী। উড়িষ্যার রাজসভায় থাকিয়া সার্বভৌম অদ্বৈত মকরন্দ টীকা লেখেন। তখনও চৈতন্য মত লয়েন নাই।

১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্য তিরোধানের পূর্বে সার্বভৌম পুরী হইতে কাশী যান।* জনেশ্বর একাধিক গ্রন্থ রচয়িতা নৈয়ায়িকদের প্রবাদে রঘুনাথ শিরোমণি সার্বভৌমের ছাত্র। তাহা ঠিক কি? কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ রঘুনন্দনেরও পরবর্তী। সার্বভৌম অদ্বৈত মকরন্দ টীকায় "শ্রেবন্দ্যান্বয়" পরিচয় দিয়াছেন।

সব পুঁথি এখনো ছাপাও হয় নাই। অনেক ফাঁকীও এখনো অধ্যাপকদের মুখে মুখে চলিতেছে। সেইসব শিখিবার জন্যই ভারতের নানা প্রদেশের বিদ্যার্থীর দল আজও বাঙ্গালী পণ্ডিতের গৃহে অতিথিরূপে আসিতে বাধ্য হন।

বাঙ্গালী অধ্যাপকরাও এই আতিথ্য বিতরণে কখনও কৃপণতা করেন নাই।

অল্প কিছুদিন পূর্বেকার একটি কথা বলিতেছি। দামোদর গোস্বামী তখন

ছিলেন নবদ্বীপে পণ্ডিতদের প্রিয়তম ছাত্র। তিনি বৃন্দাবনবাসী গোপালভট্ট সম্প্রদায়ী অবাঙ্গালী তবে মহাপ্রভুর মতানুবর্তী। অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন ও যদু সার্বভৌম তাঁহাদের বহু পুরুষের সঞ্চিত সব পুঁথি তাঁহাকেই দিয়া গেলেন। দামোদর গোস্বামীর কাছে রক্ষিত সেই পুঁথিগুলি একবার আদালতভুক্ত হইয়া তাহার পর একেবারে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। তবু অধ্যাপকরা এই বিষয়ে কেমন প্রাদেশিকতাহীন ও উদার তাহা তো বুঝা যায়।

প্রমাণ-পঞ্জী

বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনে গবেষণাব্রতী শ্রীমান সুখময় ভট্টাচার্য তর্কতীর্থের তালিকাটি সমাপ্ত হইল।

২ বাসুদেব সার্বভৌম অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ভারতবর্ষ, ১৩৪৭ চৈত্র, পৃ ৪২৩—৪৩০

৩ সরস্বতীভবন স্টাডিস, চতুর্থ খণ্ড

৪ ন্যায় বৈশেষিক, ৩৫৮নং পুঁথি, পত্রসংখ্যা ৫২, লিপিকাল ১৬৪২ সংবৎ

৫ শাণ্ডিল্য সূত্র, মহেশ পাল সংস্করণ, পৃ ১০৯

৬ চৈতন্য চন্দ্রোদয় শেষ অঙ্ক

বাংলাদেশের গণশক্তি

নানা ধর্মমত যেখানে মানুষের মনকে উদার করে সেখানে সাধারণ প্রকৃতি-পুঞ্জের মধ্যেও গণশক্তির উদার ভাব ও স্বাধীনতা লক্ষিত হইবার কথা। নানা কারণে মগধবঙ্গ প্রদেশে প্রজাদের স্বাধীনতা বিশেষভাবে দেখা গিয়াছে।

ভারতবর্ষে সর্বত্রই রাজারা শাসন করিয়াছেন, কিন্তু ভারতের উত্তর-পূর্বভাগে বৃজি, শাক্য, লিচ্ছবি প্রভৃতি জাতিদের মধ্যে চিরদিনই লোকেরা নিজেদের শাসন নিজেরা করিত। এখনকার দিনে যাহাকে প্রজাতন্ত্র বলে তাহা চিরদিনই তাহাদের মধ্যে সহজ ভাবে ছিল। ধর্মমতও তাহাদের ছিল স্বাধীন। শাক্যবংশে বুদ্ধদেব, লিচ্ছবিবংশে জৈনগুরু মহাবীরের জন্ম। কাজেই বুঝা যায় ইঁহারা ব্রাহ্মণ-শাসন মাথা পাতিয়া ল'ন নাই। উত্তর-পূর্ব ভারতে চিরদিনই গণমতের প্রাধান্য দেখা যায়। তাই এই দেশে আসা যাওয়া মধ্যদেশের সমাজপতি ব্রাহ্মণেরা পছন্দ করিতেন না। "অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে তীর্থযাত্রা বিনা কেহ যদি যান তবে তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত", এই ছিল তাঁহাদের অনুশাসন।

> অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাংশ্চ
> সৌরাষ্ট্রান্ মগধানস্তথা
> তীর্থযাত্রা বিনা গচ্ছন্
> পুনঃ সংস্কারম্ অর্হতি ॥

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে উত্তর পূর্ব ভারতে এমন একটি অরাজকতা উপস্থিত হইল যে প্রবলেরা দুর্বলদের গিলিয়া খাইতে প্রবৃত্ত হইল। ইহা ধর্মপালদেবের তাম্রশাসনে দেখি। এই মাৎস্যন্যায় দূর করিবার জন্য প্রজাবর্গ রণকুশল বপ্যটের পুত্র গোপালদেবকে রাজলক্ষ্মীর করগ্রহণ করাইয়াছিলেন অর্থাৎ রাজা নির্বাচন করিয়াছিলেন।

> ....খণ্ডিতা রাতিঃ শ্লাঘ্যঃ শ্রীবপ্যটস্ততঃ ॥৩
> মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যাঃ করং গ্রাহিতঃ
> শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশ শিরসাং চূড়ামণিস্তৎ সুতঃ ॥৪[১]

এই গোপালদেবই বাংলার পালবংশের আদি রাজা। লামা তারানাথের

ইতিহাসেও এই সব কথা দেখা যায়। তবে তাহা একটু অন্য রকম করিয়া বলা। তাঁহার পুত্র ধর্মপাল ও পৌত্র দেবপালের সময়ে বাংলার শিল্প সাহিত্য প্রভৃতি বিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর মহীপাল ২য়, শূরপাল ২য় ও রামপাল নামে তিন পুত্র রহিলেন। মহীপাল রাজা হইয়াই শূরপাল ও রামপালকে শৃঙ্খলে ও কারাগারে বদ্ধ করিয়া মন্ত্রীদের অগ্রাহ্য করিয়া নানা দুর্নীতিতে পূর্ণ হইয়া প্রজাদিগকে নানা দুঃখ দিতে লাগিলেন। যখন অত্যাচার প্রজাগণের অসহ্য হইল তখন কৈবর্তবীর দিব্য বা দিব্বোক রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। দিব্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রুদোক ও রুদোকপুত্র ভীম দীর্ঘকাল ধরিয়া এই প্রজাশক্তিকে পরিচালিত করেন। ইঁহাদের চেষ্টায় যথেচ্ছাচারী রাজশক্তি সংযত হইতে বাধ্য হয়।

আমি বাংলার ইতিহাস লিখিতে বসি নাই, কাজেই এই সব কূটকচালির তথ্য আর বেশি দিবার প্রয়োজন নাই। তবে অন্য সব দেশের তাম্রশাসন হইতে বাংলাদেশের তাম্রশাসনগুলির একটু বিশেষত্ব আছে তাহা বলা সঙ্গত।

বাংলাদেশের বাহিরে প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় রাজা যখন কাহাকেও ভূমিদান করেন তখন এই ভাবে সকলকে জানাইয়া দেন যে আমার ভূমি, এই ইহার চতুঃসীমা, এই পরিমাণ জমি আমি অমুককে দিলাম তোমরা সকলে জানিয়া রাখ। ইহাতে কেহ বাধা দিবে না, দিলে দণ্ডার্হ হইবে, ইত্যাদি।

বিদিতমস্তু ভবতাম্, অর্থাৎ 'তোমাদের বিদিত হউক'[২]

অস্তু বঃ সংবিদিতম্, তোমাদের ইহা সংবিদিত হউক[৩]

১১০৮ শকাব্দে পৃথ্বীশ্বরের পিঠাপুরম্ শাসনে দেখি—প্রোলুলাংটি বিষয়বাসী রাষ্ট্রকূট প্রমুখ কুটুম্বিগণকে ডাকিয়া সকলকে এইভাবে সমাজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে,

বিদিতমস্তু বঃ—'তোমাদের বিদিত হউক।'[৪]

১১১৭ শকাব্দে পিঠাপুরে কুন্তিমাধব মন্দির-দ্বার স্তম্ভে উৎকীর্ণ মল্লিদেবের শাসনে দেখি শুদ্ধবাদি বিষয়ে রাষ্ট্রকূট প্রমুখ সকল কুটুম্বিগণকে সমাহ্বান করিয়া এইরূপ আজ্ঞাপন করিতেছেন,

বিদিত মস্তু বঃ[৫]

সাহজহানপুর হইতে ২৫ মাইল দূরে বাঁশখেড়ায় প্রাপ্ত ৬২৮-৬২৯ খ্রীষ্টাব্দের শাসনেও দেখা যায়—

জানপদাংশ্চ সমজ্ঞাপয়তি, বিদিতমস্তু······৬

অন্ধ্রদেশের পিঠাপুরমে কুন্তি মহাদেব মন্দিরের দ্বারস্তম্ভে উৎকীর্ণ তৃতীয় লিপিতে রাজা মল্লপদেবের শাসনেও দেখা যায়,

সর্বান্ সমাহূয় ইত্থ মাজ্ঞাপয়তি বিদিতমস্তু বঃ···ইত্যাদি[৭]

গঞ্জাম নরসনপেটার নিকটে কোমর্তি গ্রামে প্রাপ্ত চন্দ্রবর্মার তাম্রশাসনে দেখি,

সর্বসমবেতান্ কুটুম্বিনঃ সমাজ্ঞাপয়তি···ইত্যাদি[৮]

ইহারই নিকটে নড়গ্রাম গ্রামে রাজা বজ্রহস্তের (৯৭৯ শকাব্দের) এক তাম্রশাসনে দেখা যায়—

সমস্তামাত্য প্রমুখ জনপদান্ সমাহূয় সমাজ্ঞাপয়তি
বিদিতমস্তু ভবতাম ইত্যাদি[৯]

গঞ্জামে প্রাপ্ত পৃথ্বী বর্মদেবের (১২শ, ১৩শ খ্রীষ্ট শতাব্দী) তাম্রশাসনে দেখা যায়,

·····সমাদিশতি বিদিতমস্তু ভবতাম—ইত্যাদি[১০]

গুজরাত বড়োদার অন্তর্গত সংখেড়ায় প্রাপ্ত চতুর্থ দদ্দের (প্রশান্ত রাগ) চেদী সম্বৎ ৩৯২ অব্দে সম্পাদিত শাসনে আছে,

অস্তু বো বিদিতম্

কৃষ্ণা জেলায় বিজয়ওড়ায় প্রাপ্ত চালুক্য প্রথম ভীমের (৮৮৮-৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ) তাম্রশাসনে,

বিদিতমস্তু বঃ[১১]

মসলিপট্টমে প্রাপ্ত প্রথম অম্মরাজের (৯১৮-৯২৫) শাসনেও,
সর্বান্ ইত্থম জ্ঞাপয়তি বিদিতমস্তুবঃ—ইত্যাদি

চালুক্যরাজ দ্বিতীয় ভীমের (৯৩৪-৯৪৫ খ্রীঃ) শাসনেও দেখা যায়,

বিদিতমস্তু বঃ ইত্যাদি

ওয়ার্ধার নিকটে দেওলীতে প্রাপ্ত তৃতীয় কৃষ্ণরাজের (৮৬২ শক) শাসনে,

সর্বান্ সমাজ্ঞাপয়তি অস্তু বো সংবিদিতম্ ইত্যাদি।[১২]

গঞ্জামে প্রাপ্ত শশাঙ্করাজের সময়কার শাসনেও দেখা যায়,

বিদিতমস্তু ভবতাম্ ইত্যাদি

এই বিষয়ে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সর্বত্র একই কথা। গুজরাত খম্বাতে (ক্যাম্বে) প্রাপ্ত চতুর্থ গোবিন্দ রাজার (শক ৮৫২) শাসনেও সেই একই কথা—

অস্তু বঃ সংবিদিতম্ ইত্যাদি

সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আছে ইহাতে যেন কেহ ব্যাঘাত না করেন।

ন কেন চিদ্ ব্যাঘাতঃ কর্তব্যঃ

এইরূপ সর্বত্র। কত আর লেখা যায়? নেল্লোর তালামাঞ্চিতে প্রাপ্ত প্রথম বিক্রমাদিত্যের (৬৬০ খ্রীঃ) শাসনেও সেই কথা—

বিদিতমস্তু বঃ ইত্যাদি

কোথাও কোথাও দানের মধ্যে সকলের অনুমতি গ্রহণ দূরে থাকুক, জানানটুকুও নাই। সোজাসুজি দানটুকু মাত্র লেখা। কৃষ্ণা জেলার কোণ্ডমুডি গ্রামে প্রাপ্ত রাজা জয়বর্মণের শাসনে ইহা দেখা যায়।

গোদাবরী জেলার টেকী গ্রামে প্রাপ্ত রাজরাজ চোড়গাঙ্গর শাসনে দেখা যায় "শাসনের দ্বারা ইহা আমি দিলাম, এইটুকু তোমাদের বিদিত থাকুক",

শাসনীকৃত্য দত্তমিতি বিদিতমস্তু বঃ

গোদাবরী জেলায় প্রাপ্ত রাজা বিমলাদিত্যের রণস্তিপুণ্ডী শাসনে আরও সোজাসুজি বলা হইল,

ময়াদত্তমিতিবিদিতমস্তু বঃ, "আমি দিলাম—ইহা জানিয়া রাখ।"

বরং কেহ যেন তাহাতে কোনো বাধা বা অসুবিধা সৃষ্টি না করে তাহার জন্য সাবধান করিয়া দেওয়া আছে। গঞ্জাম জেলায় অচ্যুতপুরে প্রাপ্ত রাজা ইন্দ্রবর্মার শাসনে দেখি,

তটাকোদক বন্ধ মোক্ষে ণ কেনচিদ্ বিঘাতঃ কার্য ইতি

তড়াগের জলের বন্ধ মোক্ষে যেন কেহ কোনো ব্যাঘাত না করে।

অন্ধ্রদেশের নেল্লোর জেলার ওঙ্গোল তালুকে চেণ্ডলুর গ্রামে রাজা সর্বলোকাশ্রয়ের (শক ৬৭৩) তাম্রশাসন পাওয়া যায়। তাহাতে দেখি "আমার এই শাসনকে যে অমান্য করিবে সেই হতভাগা শারীর দণ্ডের যোগ্য হইবে।"

যোঽস্মৎ শাসনমতিক্রমেৎ স পাপঃ শারীরং দণ্ডম্ ইতি[১৩]

এই কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন রাজা শিবস্কন্দ বর্মা। কৃষ্ণা জেলার ময়িদকেলু গ্রামে তাঁহার যে শাসন পাওয়া যায় তাহাতে আছে, "যে আমাদের শাসন অতিক্রম করিয়া বাধা দিবে বা দেওয়াইবে তাহাকে আমরা শারীর দণ্ড দিব।"

জো অম্হ-শাসনম্ অতিচ্ছিতূনা পীলা বাধ করেজ্জা বা কারাপেজ্জা
বা তস অম্হো শারীরং শাসনং করে জা মো।[১৪]

গৌড় দেশে দেখি রাজারা যদিও কখনও এইরূপ "বিদিতমস্তু ভবতাম" লিখিয়াছেন (দেবপালদেবের মুঙ্গের তাম্রশাসন) তবু তাহার পরেই আছে[১৫] "এই দান আপনারা সকলে দানফল গৌরব অপহরণে নরকভয় বশতঃও অনুমোদন করিয়া পালন করিবেন।"

দানমিদমনুমোদ্য পালনীয়ম্।

প্রথম মহীপালদেবের দিনাজপুরের বাণগড় তাম্রশাসনে[১৬] যদিও লেখা আছে "বিদিতমস্তু ভবতাম" তবু তাহার পরই আছে—বিষুব সংক্রান্তিতে বিধিবৎ গঙ্গাস্নান করিয়া এই ভূমি দান করা হইল। অতএব আপনারা সকলে ইহা অনুমোদন করিবেন। অতো ভবদ্ভি সর্বৈরে বানু মন্তব্যম্। এই লিপিতে দেখি রাজা মেদ অন্ধ্র চণ্ডালদের পর্যন্ত যথাযোগ্য সম্মান করিয়া বুঝাইয়া ইহা জানাইতেছেন।

এখানে জানা উচিত এই বিষুব সংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নান করিয়া যিনি দান করিলেন তিনি সৌগত অর্থাৎ বৌদ্ধ, তাঁহার শাসনেও ধর্মচক্রমুদ্রা সংযুক্ত।

মালদহ জেলার খালিমপুরের প্রাপ্ত ধর্মপালদেবের তাম্রশাসনে দেখা যায় রাজা যোগ্যপাত্রকে ভূমি দান করিতে গিয়া বলিতেছেন "ইহাতে আপনাদেরও মত হউক",

মতমস্তু ভবতাম।

এখানেও রাজা চাষাদের পর্যন্ত ব্রাহ্মণ মাননাপূর্বক যথাযোগ্য মানাইয়া বুঝাইয়া বলিতেছেন।

নারায়ণ পাল দেবের ভাগলপুর তাম্রশাসনে[১৭] দেখা যায় রাজা মতমস্তু ভবতাম্ দিয়া আরম্ভ করিয়া অন্ধ্র চণ্ডাল পর্যন্ত সকলকে যথাযোগ্য ভাবে মানাইয়া বুঝাইয়া এইরূপ আদেশ করিতেছেন, দান শেষে জানাইতেছেন "তাহার পরে আপনাদের সকলের অনুমন্তব্য।"

ততো ভবদ্ভিঃ স বৈরে বানুমন্তব্যম্

বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্রশাসনে[১৮] দেখি মতমস্তু ভবতাম্। এখানেও কর্ষকদিগকেও যথাযোগ্য মানাইবার বুঝাইবার কথা আছে তাহার পর তাহাদের মত চাওয়া হইয়াছে।

দিনাজপুর মনহলি গ্রামে প্রাপ্ত মদনপাল দেবের তাম্রশাসনে দেখি[১৯] চণ্ডাল পর্যন্ত সকলকে মানাইয়া বুঝাইয়া তাহার পর বলা হইতেছে,

অতো ভবদ্ভিঃ সর্বৈরে বানুমন্তব্যম্

দেখিতেছি বাংলাদেশে প্রাপ্ত যতগুলি তাম্রশাসন আছে, তাহার প্রায় সবগুলিতেই দেখি রাজারা ভূমিদান করিয়া যে শাসন বাহির করিতেছেন তাহাতে ক্ষেত্রকার কৃষকদের পর্যন্ত যথার্থ সম্মান করিয়া বুঝাইয়া প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহাদের দান যেন প্রজাদের সম্মত হয়।

রাজা শ্রীচন্দ্রদেব যাজ্ঞিক পীতবাস গুপ্তশর্মাকে ভূমিদান করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন,

অতো ভবদ্ভিঃ সর্বৈরনুমন্তব্যম্

অতএব ইহা আপনাদের অনুমত হউক।[২০]

রাজা বিজয় সেন (বারাকপুর তাম্রশাসন) উদয় কর দেবশর্মাকে ভূমিদান করিয়া প্রজাদের জানাইতেছেন—

তদ্ভবদ্ভিঃ সর্বৈরে বানুমন্তব্যম্

বল্লাল সেন (নৈহাটী তাম্রশাসন) প্রীত্ত বাসুদেব শর্মাকে ভূমিদান করিয়া বলিতেছেন ঐ কথাই।

আনুলিয়া তাম্রশাসনে, গোবিন্দপুর তাম্রশাসনে, তর্পণ দীঘির তাম্রশাসনে,

মাধাইনগর তাম্রশাসনে এবং সুন্দরবন তাম্রশাসনে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন ঐ একই কথা প্রত্যেকবার এক ভাবেই বলিয়াছেন।

ইদিলপুর তাম্রশাসনে মহারাজ কেশব সেন, মদন পাড়া তাম্রশাসনে, ঢাকা নগরের কাছে প্রাপ্ত সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত তাম্রশাসনে মহারাজ বিশ্বরূপ সেন ঐ কথাটি প্রত্যেকবার উল্লেখ না করিয়া পারেন নাই। রামগঞ্জ তাম্রশাসনেও ঈশ্বর ঘোষ এই কথাই বলিয়াছেন।

দ্বিতীয় গোপালদেবের[২১] তাম্রশাসনেও বিদিতমস্তু ভবতাম বলিয়া আরম্ভ করিয়া অতো ভবদ্ভিঃ সর্বৈরে বাসুমন্তব্যম্ বলা হইয়াছে। এখানেও যথাযোগ্য ভাবে মেদ, অন্ধ, চণ্ডাল পর্যন্ত সকলকে মানাইয়া বুঝাইয়া বলা হইয়াছে।

সুন্দরবন রাক্ষসখালী দ্বীপে প্রাপ্ত ১১৯৬ খ্রীষ্টাব্দের শ্রীমদ্ ডোম্মনপালের তাম্রশাসনে দেখা যায় বামহিঠা গ্রামখানি বাসুদেব শর্মাকে রাজা মিত্রভাবে (মিত্র দানেন) দান করিতেছেন। তাহা

যুষ্মাভিঃ সর্বৈরেব······অনুমোদ্যন্ত পালনীয়ম্ ॥

সকলের অনুমোদনীয় ও পালনীয় হউক।

প্রমাণ-পঞ্জী

১ ধর্মপাল দেবের খালিমপুর তাম্রশাসন
২ দেবেন্দ্র বর্মার গঞ্জাম চিকাকোল শাসন, পঙক্তি ৯, ১০
৩ ধ্রুবসেনের (খ্রীঃ ৫২৬-৫২৭) গণেশগড় (বড়োদা) শাসন, পঙক্তি ১২
৪ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ৪র্থ খণ্ড
৫ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৯২
৬ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ২১১
৭ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ২৩৭
৮ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ১৪৪
৯ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ১৯১
১০ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ২০০
১১ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ১২৯
১২ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ৫ম খণ্ড, পৃ ১৯৫

১৩ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ৮ম খণ্ড, পৃ ২৪০
১৪ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৮৭
১৫ পঙক্তি ৪৪, ৪৫
১৬ জর্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি, ৬১ খণ্ড
১৭ ইণ্ডিয়ান এন্টিকোয়ারি, ১৫ খণ্ড, পৃ ৩১৫
১৮ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ২য় খণ্ড
১৯ জর্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯০০
২০ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ১২ খণ্ড, পৃ ১৪০
২১ নাল্ডিলপাড়া লিপি, ভারতবর্ষ, ১৩৪৪ শ্রাবণ

সঙ্গীতশাস্ত্র

ভারতীয় সঙ্গীতে বাংলার দান কম নহে। বাঙ্গালী কবি জয়দেবের গান ভারতের সর্বদিকে। কাশ্মীর হইতে কুমারী এবং সিন্ধু প্রদেশ হইতে মণিপুর এমন কি ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত মন্দিরে মন্দিরে গীতগোবিন্দের গানের সমাদর। জয়দেব কবি বিদ্যমান ছিলেন লক্ষ্মণ সেনের সময়ে। লক্ষ্মণাব্দ মিথিলাতে এখনও চলে তাহার আরম্ভ বীমসএর মতে ১১০৭ খ্রীষ্টাব্দে[১] এবং কিলহর্ণের মতে ১১১৮-১১১৯ সালে[২]। ১১১৬ সালের লেখা একটি লক্ষ্মণ সেনের শাসন পাওয়া গিয়াছে।[৩]

বাঙ্গালী কবির গান সেই হইতেই সারা ভারতে জুড়িয়া রহিয়াছে। সেই সম্বন্ধই এখনকার যুগে আরও ভাল করিয়া পূর্ণ করিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার গান ও কবিতার সমাদর হইল সারা জগতে।

জয়দেবের গান যখন সারা ভারতে সমাদৃত হইল তখন বুঝা যায় সেই যুগে বাংলা দেশে গীতবিদ্যার যথেষ্ট পসার ছিল।

সঙ্গীতের অন্তিমকালের সঙ্গীত শাস্ত্রের শেষভাগের গ্রন্থ, সঙ্গীততরঙ্গও বাঙ্গালী আচার্য রাধামোহন সেন রচিত। রাধামোহনের লেখা সঙ্গীততরঙ্গ ও সঙ্গীত রত্ন এই দুইখানি পুঁথির পরিচয় দিয়াছেন টি সি কৃষ্ণস্বামী আয়ার।[৪]

ইংরাজদের যুগেও সঙ্গীত শাস্ত্রের আদ্য লেখকদের মধ্যে প্রধান রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। বাংলা ভাষাতে লিখিত হইলেও গীতসূত্রসার সর্বভারতে সম্মানিত। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পুস্তকখানি সঙ্গীত শাস্ত্রের ক্লাসিকাল সমস্ত অঙ্গের পরিচয় দিয়াছে।

সঙ্গীত শাস্ত্রের কথার সঙ্গেই ছন্দশাস্ত্রেরও কথা একটুখানি দেওয়া যাইতে পারে। বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা গ্রন্থমালাতে প্রাকৃতপৈঙ্গল নামে একখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে উদ্ধৃত উদাহরণগুলি অর্বাচীন অপভ্রংশ ভাষায় রচিত। মনে হয় গ্রন্থখানি চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত। ইহার কোনো কোনো উদাহরণ শ্লোক হিন্দী ঘেঁষা। কোনো কোনো উদাহরণ শ্লোক প্রাচীন বাংলা বা বাংলা ভাষার পূর্ববর্তী অপভ্রংশ। এইগুলির সম্বন্ধে কিছু বিচার শ্রীসুকুমার সেন তাঁহার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে করিয়াছেন।

বাংলাদেশে যদিও সঙ্গীত শাস্ত্র বা ব্যাকরণ, প্রাচীনকালে বড় একটা রচিত হয় নাই তবুও সংস্কৃতে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের রচয়িতা বাঙ্গালী কবি জয়দেব। এই বিষয়টি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গোচরে আনিলে তিনি বলেন, "বাঙ্গালীর ধর্মই হইল সৃষ্টি করা। সঙ্গীতের ব্যাকরণ রচনার চেয়ে সঙ্গীতের রচনাই মহত্তর।" কিন্তু এদিকে আবার দেখা যাইবে বাংলায় রচিত কবিতা-সংগ্রহ পুস্তক রচনায় বাঙ্গালী সর্বপ্রথম হাত দিয়াছে। তাহার পর বহুলোক সেই পথ অনুসরণ করিয়াছেন। কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয় ও সদুক্তি-কর্ণামৃত সমস্ত পৃথিবীকে নূতন পথ দেখাইয়াছে।

কৃষ্ণ মিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় বোধহয় রূপক সাহিত্য রচনায় আদিম পথপ্রদর্শক। তারপরে কত যে উত্তম উত্তম নূতন রূপক সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। এই পথের প্রথম প্রবর্তক ছিলেন রাঢ়ের সন্তান শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র। বাংলার প্রতিভা হইল সৃষ্টিকর্মে, ব্যাকরণশাস্ত্র রচনায় নহে।

প্রমাণ-পঞ্জী

১ ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল কোয়ার্টার্লি, চতুর্থ খণ্ড

২ রাখাল দাস—বাংলার ইতিহাস, পৃ ২৯৯

৩ স্যাংস্কৃট লিটারেচার—ওয়েবার, পৃ ২১০

৪ সঙ্গীত মকরন্দ, পরিশিষ্ট, পৃ ৫৯

ধর্মের উদারতা

সারা ভারতবর্ষই ধর্মবিষয়ে চিরদিন উদার। তাহার উপর জৈন, বৌদ্ধ, নাথপন্থ, যোগীদের মত ও বৈদিক ধর্ম এইরূপ নানা মতবাদের প্রচার একে একে বাংলাদেশে হওয়ায় বাংলার সাধনার আকাশ নানাভাবে আরও উদার হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমান যুগেও রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম আর্যসমাজের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত। পরমহংস রামকৃষ্ণের উদার সন্ন্যাসধর্ম সকল ভারতের হৃদয় জয় করিয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই বাংলাদেশ উদার মতাবলম্বী।

মীমাংসা দর্শনের দুইটি শাখা। কুমারিল হইলেন রক্ষণশীল, প্রভাকর হইলেন উদার। বাঙ্গালী শালিকনাথ যে উদার মতের প্রভাকরের অনুবর্তী সে কথা স্থানান্তরে বলা হইয়াছে। প্রভাকরের উদার মত সমর্থন করিয়া মীমাংসা দর্শনেও বাঙ্গালী আপন উদার বুদ্ধির পরিচয় দিল।

পূর্বেই বাংলায় বেদচর্চা প্রসঙ্গে পূর্ববঙ্গের অধিপতি শ্রীচন্দ্রদেবের নাম করা হইয়াছে। তিনি সৌগত অর্থাৎ বুদ্ধভক্ত হইয়াও ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি ভক্তিমান ছিলেন। বুদ্ধভক্তিও তাঁহার কম ছিল না। ঢাকা ম্যুজিয়ামে ধল্লায় প্রাপ্ত রাজা শ্রীচন্দ্রদেবের একটি তাম্রশাসন আছে। তিনি বুদ্ধভট্টারকের নামে কাণ্ব-শাখাধ্যায়ী ব্যাসগঙ্গশর্মাকে চতুর্হোমানুষ্ঠানের অদ্ভুত শান্তিক্রিয়া সম্পন্ন করায় ভূমিদান করিতেছেন। বুদ্ধের নামে বৈদিক অনুষ্ঠানে দান![1] এইরূপ আচরণ কি আর কোথাও পরিদৃষ্ট হয়?

রামপাল তাম্রশাসনে শ্রীচন্দ্রশান্তি বারিক পীতবাস রামগুপ্ত শর্মাকে ভূমিদান করিতেছেন।[2]

লক্ষ্মণ সেন তাঁহার সব তাম্রশাসনে নমো নারায়ণায় বলিয়া আরম্ভ করিয়া তাঁহার তর্পণদীঘি শাসনে ঈশ্বর দেবশর্মাকে যে ভূমি তিনি দান করিয়াছেন তাহার পূর্বসীমাতে একটি বুদ্ধমন্দিরের প্রাচার—পূর্বে বুদ্ধবিহারী দেবতা নিষ্কর দেওয়া ম্মণভূম্যাঢাপ পূর্বালিঃ সীমা[3]।

পাহাড়পুর স্তূপে ৪৭৮-৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত অনুশাসনে জানা যায় ব্রাহ্মণনাথ শর্মা ও তাঁহার পত্নী রামী নিজেদের বাসস্থান বটগোহালী গ্রামে নির্গ্রন্থদের অধিষ্ঠিত বিহারে ভগবান অর্হংদের উদ্দেশে ভূমিদান করিয়াছেন[4]।

জয়দেব ও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বুদ্ধদেবকেও নারায়ণের অবতার বলিয়া মান্য করিয়াছেন।

রাজা ধর্মপালদেবের রাজ্যাব্দের ২৬শ বৎসরে ভাদ্র কৃষ্ণাপঞ্চমীতে শনিবারে উজ্জ্বলভাস্করের পুত্র কেশব বুদ্ধগয়াতে একটি চতুর্মুখ মহাদেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মল্লস্নাতকদের কল্যাণার্থ অতি সুগভীর পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়াছিলেন।[৫]

পরমসৌগত নারায়ণ পালদেব তাঁহার রাজত্বের ১৭শ বর্ষে, ৯ই বৈশাখ তারিখে কলসপোত গ্রামে তাঁহার নিজের কৃত সহস্রায়তন শিবালয়ের জন্য ও পাশুপত আচার্যদের জন্য ভূমিদান করিতেছেন।[৬]

গৌড়াধিপ মহীপাল কাশীধামে ঈশান চিত্র-ঘণ্টাদি শত কীর্তিরত্ন নির্মাণ করাইয়া পরে ধর্মরাজিকার ও সাঙ্গ ধর্মচক্রের জীর্ণ-সংস্কার ও ভগবান বুদ্ধদেবের বাসমন্দির গন্ধকুটী নির্মাণকার্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।[৭]

পরমসৌগত রাজা বিগ্রহপালদেব (আমগাছি লিপি) কোটিবর্ষ বিষয়ে ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিতে গিয়া নিজ পরিচয়ে জানাইতেছেন যে তিনি স্মররিপোঃ পূজানুরক্তঃ সদা, অর্থাৎ মহাদেবের পূজানুরক্ত এবং তিনি চাতুর্বণ্য সমাশ্রয়ঃ।[৮]

মহারাজ বৈদ্যদেব আপনাকে পরম শৈব ও পরম বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন—পরম মাহেশ্বরঃ পরম বৈষ্ণবঃ।[৯]

সৌগত মদনপালদেব তাঁহার মনহলি লিপিতে নমোবুদ্ধায় বলিয়া আরম্ভ করিয়া কোটিবর্ষ বিষয়ে ভূমিদান করিতেছেন। মহারাণী চিত্রমতিকা দেবীকে বটেশ্বর স্বামিশর্মা মহাভারত শুনাইয়াছিলেন বলিয়া বুদ্ধ ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া দক্ষিণারূপে এই দান।[১০]

সৌগত রাজা ধর্মপালদেব তাঁহার খালিমপুর তাম্রশাসনে ভগবন্নম্ব নারায়ণ দেবের পূজার্চনার জন্য হট্টিকা ও তলপাটক সমেত চারিটি গ্রাম দান করিতেছেন।[১১]

মালদহে প্রাপ্ত জাজিলপাড়ালিপি নামে খ্যাত দ্বিতীয় গোপালদেবের তাম্রশাসনে দেখি পরমসৌগত রাজা গোপালদেব বুদ্ধস্তুতির দ্বারা লিপিখানি আরম্ভ করিয়া পরে ভগবান বুদ্ধভট্টারকের উদ্দেশে রাজসনেয় সব্রহ্মচারী সামবেদ ত্রিপাঠিপাঠক যাজ্ঞিক শ্রীধর শর্মাকে উত্তর সংক্রান্তিতে স্নান করিয়া ভূমিদান করিতেছেন।[১২]

দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধরাজা জয়পাল দেব ব্রাহ্মণকে দক্ষিণ রাঢ়ের একটি গ্রাম দান করেন[১৩] পালরাজারা বৌদ্ধ হইলেও এইরূপ ভাবে বহু দান করিতেন। দানের প্রথমে ধর্মচক্রমুদ্রা ও বুদ্ধস্তব থাকিত। এই দানশাসনে শিবপ্রণতিও আছে।

১৯২৮ সালে কুমিল্লা জেলার গুনাইঘর গ্রামে একটি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। এই শাসনখানি অতি প্রাচীন। ৫০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখের দান। ত্রিপুরা জয়স্কন্ধাবার হইতে মহাদেব পদানুধ্যাত মহারাজা শ্রীবিনয় গুপ্ত, তাঁহার অধীন মহারাজা রুদ্রদত্তের অনুরোধে নিজ ও পিতামাতার পুণ্যের জন্য মহাযান বৈবর্তিক মতের উপানন্দ আচার্য শান্তিদেবের স্থাপিত অবলোকিতেশ্বরের বিহারের জন্য ভূমিদান করিতেছেন।[১৪]

বরেন্দ্রভূমিতে ধুরাইল নামক স্থানে ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে একটি সেতু রচিত হয়। পাঠান রাজাদেরই রচিত সেই সেতু। তাহাতে যে লেখ আছে তাহা সংস্কৃতে লেখা।

ত্রিবেণীতে যে জাফর খাঁ গাজীর সমাধিস্থান আছে তাহাতে রামায়ণ ও মহাভারতের চিত্রাবলীর সঙ্গে যে লেখ আছে তাহা বঙ্গাক্ষরে।

পাণ্ডুয়া মসজিদে রক্ষিত শেখ শুভোদয়া গ্রন্থখানি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। বইখানি ছাপা হইয়াছে।

রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতির উদারতার কথা অনেকেই জানেন। একজন পণ্ডিতের কথা অনেকেরই জানা নাই, তিনিও বাঙ্গালী। ইংরাজেরা যখন এদেশে আসেন তখন ভারতীয় পণ্ডিতেরা কেহই তাঁহাদের সংস্কৃত পড়াইবেন না। আজ যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের পাণ্ডিত্যের এত বড় শুভযোগ তাহার আদি গুরুদের মধ্যে স্যার উইলিয়ম জোন্‌স একজন মহা তপস্বী। তাঁহাকে যখন কেহই সংস্কৃত শিখাইতে রাজি হইলেন না তখন সালকিয়াবাসী রামলোচন কবিভূষণ এই ভার লইলেন। তিনি বঙ্গদেশীয় বৈদ্য ছিলেন।[১৫]

কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে রাল্‌ফ ফিস নামে একজন য়ুরোপীয় ভ্রমণকারী কোচবিহারে যাইয়া দেখেন, সেখানে ছাগল, ভেড়া, কুকুর বিড়াল প্রভৃতি নানাজীবের আরোগ্যশালা রহিয়াছে।[১৬]

কাশীতে অসিঘাটের জলকলের পাম্পিং ষ্টেসনের পাশে লোলার্ককুণ্ড নামে একটি পবিত্র স্থান আছে। ভাদ্র শুক্লা সপ্তমীতে সেখানে একটি মেলা হয়। সেই কুণ্ডের গাত্রে পাষাণে একটি উৎকীর্ণ শ্লোক আছে তাহা বাংলা ও নাগরী

উভয়বিধ অক্ষরে লেখা। তাহাতে দেখা যায়, রাজা শিবের পৌত্র রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ এই কুণ্ডের সংস্কার করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী বিহারপতি হরেন্দ্রাত্মজ শ্রীশিবেন্দ্র পুনরায় ইহার সংস্কার করেন। ইতি সম্বৎ ১৯০০, বাংলা সাল ১২৫০।[১৭]

আবার রিসার্চ সোসাইটির জার্নালে শ্রীযুত জে. সি. ঘোষ লেখেন লোলার্ক-কুণ্ডের শিলালেখটি কোচবিহারাধিপতি রাজা প্রাণনারায়ণের।

প্রমাণ-পঞ্জী

১ পঙক্তি ৩৩-৩৬, পৃ ১৬৬
২ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, দ্বাদশ, পৃ ১৩৬ (পঙক্তি ২৮, পৃ ৫)
৩ তর্পণদীঘি শাসন, এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, পৃ ৯
৪ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা নং ৫, পৃ ১৩৯-১৫২
৫ জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি, বেঙ্গল—নিউ সিরিজ, পৃ ১০১
৬ নারায়ণ পাল দেবের ভাগলপুর তাম্রশাসন, ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারি পৃ ৩০৪
৭ ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারি, খণ্ড ১৪, পৃ ১৩৯
৮ ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারি, খণ্ড ২১, পৃ ১০১
৯ কর্মৌলিলিপি এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, দ্বিতীয় খণ্ড
১০ জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি, বেঙ্গল, ১৯০০
১১ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ৪র্থ খণ্ড
১২ ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৪৪
১৩ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ২৪ খণ্ড
১৪ ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টার্লি, ১৯৩০
১৫ ভারতবর্ষ, ১৩৩০ পৌষ, পৃ ১৪৪
১৬ আর্লি ট্রাভেলস্ ইন ইণ্ডিয়া, ১৫৮৩—১৬১৯—র‍্যালফ ফিস
১৭ ইণ্ডিয়ান কালচার, জুলাই ১৯৩৫, পৃ ১৪৩

হিমালয় প্রদেশে বাঙ্গালী

বাংলার এইসব স্বাধীন মতবাদ ধর্মে, রাজনীতিতে, সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে ও নানাবিধ ক্ষেত্রেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং তাহা বাঙ্গালীদের দ্বারা নানা প্রদেশে নীত হইয়াছে। আজিকার দিনে ঘরমুখো বলিয়া বাঙ্গালীর কুখ্যাতি থাকিলেও বাঙ্গালী এক সময় সর্বপ্রকার ভৌগোলিক সীমা অস্বীকার করিয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি পাল ও সেন রাজগণের বংশধরেরা অনেকে স্বদেশে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া হিমালয়ে গিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। তাই কাংড়ার চিত্রশিল্পের মধ্যে বাংলার সাদৃশ্য দেখা যায়।

সেই সময় এবং তাহার পূর্বে পরে বহু বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ দেশ ছাড়িয়া হিমালয় প্রদেশে বাস করেন। ১৯০৬-১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে হিমালয়ের নানা স্থান পরিভ্রমণ-কালে আমি ইহার বহু পরিচয় পাই। খাঁটি বাংলা শব্দ, আচার ব্যবহার ব্রত-পূজাপদ্ধতি সেই দেশে দেখিয়া আমি চমৎকৃত হই। বাংলাদেশের তান্ত্রিক মন্ত্র ও যন্ত্র স্থণ্ডিলাদির ব্যবহার সেখানে প্রচলিত। তখন চম্বারাজ্যের ব্রহ্মপুর বাসী বৃদ্ধ পণ্ডিত প্রভাকর বভুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি আমাকে অনেক খবর দেন। তাঁহার কাছেই জানি ঐসব প্রদেশে বহু ব্রাহ্মণ বাংলা হইতে যান। তাঁহার লিখিত কোনো প্রমাণ না থাকায় এতকাল কিছু বলা সম্ভব হয় নাই। সম্প্রতি পণ্ডিত হরিকৃষ্ণ, বতুড়ী, টিহরী, গঢ়বাল হইতে তাঁহার "গঢ়বালকা ইতিহাস" বাহির করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় সেখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ সরোলা ব্রাহ্মণদের মধ্যে তেরটি শাখাই বাঙ্গালী।

সরোলা ব্রাহ্মণদের মধ্যে ঢংগান, পল্যাল, মংজখোলা, গজল্ডী, চাংদপুরী, বৌসোলা এই ছয় শাখার ব্রাহ্মণ নৌটিয়াল (এইসব শাখার নাম উপনিবেশের গ্রাম নামানুসারে।) ইহারা ৯৩৫ সম্বতে রাজা কনকপালের সঙ্গে সে দেশে যান। ইহারা রাজগুরু। ইহারা গৌড়।

মৈটর্বাণীরা ৯৪৫ সম্বতে "গৌড়দেশ বংগাল" হইতে যান। ইহাদের মূল পুরুষ রূপচন্দ্র।

সেমলটীয়া ৯৬৫ সম্বতে "বীরভূম বংগাল" হইতে যান, ইহাদের মূল পুরুষ গণপতি।

থপল্যালরা ৯৮০ সম্বতে "গৌড়দেশ" হইতে ঐ দেশে যান। মূল পুরুষ জয়চন্দ্র।

থংভূড়ীরা ৯৪৫ সম্বতে "বীরভূম" হইতে যান। মূল পুরুষ সার্ঙ্গধর মহেশ্বর। বতুড়ীবা ৯৮০ সম্বতে "গৌড়দেশ" হইতে যান। সোমরালরা ঐ সময়েই "বীরভূম" হইতে যান। মূল পুরুষ প্রভাকর।

লাখেড়ারা ১১১৭ সম্বতে "বীরভূম" হইতে যান। গংগাড়ী ব্রাহ্মণদের মধ্যে নয়টি শাখা বাঙ্গালী। বুধাণারা "গৌড়বংগাল" হইতে ৯৮০ সম্বতে যান। ইহাদের মূল পুরুষ কৃষ্ণানন্দ।

খিলভ্যালরা ১১০০ সম্বতে "গৌড়দেশ" হইতে যান।

কিমোটীরা ১৬১৭ সম্বতে "গৌড়বংগাল" দেশ হইতে যান।

কোঠারীরা ১৭৯১ সম্বতে "গৌড়বংগাল" দেশ হইতে যান। ইহাদের মূল পুরুষ কুমারদেব।

বডোনীরা ১৫০০ সম্বতে "গৌড়বংগাল" দেশ হইতে যান।

কোটনালারা ১৭২৫ সম্বতে "গৌড়বংগাল" হইতে যান।

কুড়িয়ালরা ১৬০০ সম্বতে "গৌড় বংগাল" হইতে যান।

মূসড়ারা "গৌড় বংগাল" হইতে আগত।

ব্রৌরাঈরা গৌড় ব্রাহ্মণ বটেন, ১৫০০ সম্বতে আসিয়াছেন। মূল স্থানের উল্লেখ নাই।

গাঢ়রালী রাজপুতদের মধ্যেও একদল দেখা যায় বংগারী বারত (রাউত)। তাঁহারা ১৬৬২ সম্বতে আসেন। ইতিহাসকার মনে করেন তাঁহারা "বাংগর" (অর্থাৎ নদীতে না ডুবিবার মত উচ্চভূমি) হইতে আগত। বরিন্দ বা বরেন্দ্রও তাহাই।

ইণ্ডিয়ান কালচার পত্রের ১৯৩৬, এপ্রিল সংখ্যায় শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন পাঞ্জাব-হিমালয় প্রদেশে ফুল্লু বিভাগে বঙ্গাল নামে এক জাতির বাস। ইহারাই বঙ্গদেশের পূর্ব ভাগকে দশম শতাব্দীতে আক্রমণ করে। ইতিহাস যদি লেখা হয় তবে আরও বহু স্থান হইতে এরূপ খবর মিলিবে।

নেপালে বিস্তর বাংলা গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায়। সেখানে বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা নেরার রাজাদের গুরু ছিলেন ও সর্বত্র চিরদিন সমাদৃত হইয়াছেন। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে গোর্খাদের আক্রমণে নেরার রাজ্যের পতন হয়। তখন গোর্খা রাজাদের গুরু কূর্মক্ষেত্রের ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি হয়। পূর্বে বাঙ্গালী গুরুরা বাংলাদেশে

বিবাহ করিতেন পরে তাঁহারা ঐশ্বর্যহীন হইয়া ঐ দেশেই বিবাহ করিয়া ঐ দেশী বনিয়া গিয়াছেন। তবু তাঁহাদের ভাণ্ডার খুঁজিয়াই বাংলার বহু সম্পদ মিলিয়াছে। তন্ত্র, ব্যাকরণ, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ ছাড়া বাংলার যাত্রা, নাটক, গান নেপালে গিয়াছে। নেপালী যাত্রা প্রভৃতি বাংলারই আদর্শে রচিত। আমাদের পণ্ডিতেরা এখন তাহার অনেক পরিচয় দিয়াছেন। বাংলা সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নেপালে বাংলা নাটক বইখানি পড়িলে এই বিষয়ে বহু তথ্য জানা যাইবে।

মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা জয়ন্তকৃত ন্যায়কলিকার ভূমিকা লিখিয়াছেন। ন্যায়মঞ্জরীও জয়ন্তের লেখা। গঙ্গেশের সময়ও তিনি জরন্নৈয়ায়িক অর্থাৎ অতি প্রাচীন বলিয়া সম্মানিত হইতেন। তিনি ভরদ্বাজ গোত্রজ গৌড় হইতে কাশ্মীরে উপনিবিষ্ট শক্তির বংশজ। তাঁহার পিতামহ কল্যাণস্বামী মহাযজ্ঞ করিয়া গৌড়মূলক গ্রাম লাভ করেন। মঞ্জরীর লেখা দেখিয়া বুঝা যায় তখন বঙ্গদেশে বেদের বিলক্ষণ চর্চা ছিল। তিনি শৈব হইলেও কাশ্মীরের ত্রিক মত মানিতেন না। তিনি নৈয়ায়িক বেদানুরক্ত এবং শৈব ছিলেন। সম্ভবত তিনি নবম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

গুজরাত বাঙ্গলা যোগ

১৯৩২ সালের মার্চ মাসে ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারি পত্রিকায় অধ্যাপক ডি. আর. ভাণ্ডারকর মহাশয় এক প্রবন্ধ লেখেন। তাহাতে তিনি দেখান বাংলার কায়স্থ ও গুজরাতের নাগর ব্রাহ্মণরা মূলতঃ এক। বহু প্রাচীন লেখা হইতে তিনি তাঁহার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের তাম্রশাসনে দেখা যায়, শ্রীহট্টে এমন সব লোক আসিয়াছিলেন যাঁহাদের উপাধি নাগর ব্রাহ্মণও কায়স্থদের মধ্যে প্রচলিত। তাঁহাদের উপাস্য শিব হাটকেশ্বর যাহা হইতে শ্রীহট্ট নাম। এই হাটকেশ্বর নাগর ব্রাহ্মণদের পূজিত।[১] এককালে গুজরাতের সঙ্গে বাংলার যে নানা ভাবে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল তাহা কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিলেই বুঝা যায়। গুজরাতের লোকের আকৃতি, বেশভূষা এমন কি তাহাদের ভাষা ও আহার-বিহারেও বার বার এই যোগের কথাই মনে আসে।

দক্ষিণ দেশে বাঙ্গালী

দশম ও একাদশ শতাব্দীতে রাঢ়দেশ হইতে বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ত্রিকলিঙ্গ দেশে গিয়া বাস করেন। তাঁহারা রাজসভাতে সান্ধি বিগ্রহিক প্রভৃতি উচ্চপদে

প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের উপাধি দত্ত, ঘোষ ও নাগ।[২] অতি প্রাচীন মৌর্যযুগে কর্ণাটক নান্নান নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময় পূর্ববঙ্গের কোষার নামে এক যোদ্ধা জাতি সেই দেশে গিয়া বাস করে।[৩]

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস বলেন পণ্ডিচেরীর পত্তন করেন একজন বাঙ্গালী ভট্টাচার্য। তিনি সেতুবন্ধ যাত্রায় আসিয়া বেঙ্কটপুরে বাস করেন ও পাণ্ডার কাজ করিতে থাকেন। পাণ্ডা ও ভট্টাচার্য জড়াইয়া তাঁহার নাম হয় পাণ্ডাচার্য। তাঁহার বসতিস্থান হইল পণ্ডিচেরী।[৪]

মান্দ্রাজ তিরুপতি তীর্থে মহাপ্রভুর সহচর ভক্ত দুর্লভচন্দ্র সেনের সমাধি। তিনি সকলের সেবাপরায়ণ অকিঞ্চন বৈরাগী ছিলেন।[৫]

দক্ষিণ বোম্বাই

গোয়া ও তাহার আশেপাশে বহু ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা বাংলাদেশ হইতে গিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। এই দেশ হইতে তাঁহারা দুর্গা প্রভৃতি দেবীকে সে দেশে লইয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীর মতই এখনও তাঁহারা মৎস্য মাংস খান। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে তান্ত্রিক আচারী এবং সেই সকল আচার শুধু বাংলাতেই আছে। তাঁহাদের পূর্ব পুরুষের নাম অনুসারে ৯৬টি শাখা। তাঁহাদের বেশভূষা, আহার, আচার বিচার সবই বাঙ্গালীদের মত।[৬]

গৌড়সারস্বত ব্রাহ্মণ পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, কাঠিয়াবাড় প্রভৃতি দেশেও আছেন। কবিকঙ্কণের মধ্যে গুজরাতে উপনিবেশের কথা পাওয়া যায়। ভাস্কর বর্মার তাম্রশাসনেও ইহার প্রমাণ মেলে।[৭]

শেনবী বা গৌড় সারস্বতদের মধ্যে নাকি "গাঙ্গুলী" উপাধি আছে।[৮]

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় লিখিয়াছেন, কিছু বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ মধ্যপ্রদেশে বিলকুল মহারাষ্ট্রীয় বনিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পূর্বপুরুষ সেই দেশে গিয়া মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিবাহসূত্রে যুক্ত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা পূর্বে বাংলা জানিতেন এখন পরবর্তী পুরুষেরা বাংলা ভুলিয়া গিয়াছেন।

শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীতে একসময়ে একটি ছাত্র পড়িতে আসেন। তাঁর নাম মোহন দত্ত। তাঁহারা মহারাষ্ট্র দেশের দক্ষিণে কারবার জেলায় সশীতল গ্রামবাসী। তাই তাঁহার নাম এখন মোহন দত্ত সশীতল কর। এই গ্রামটি কারবার নগর হইতেও ৮০ মাইল দক্ষিণে এবং ভাটকল নামে নূতন বন্দরের ৫ মাইল পূর্বে।

"দত্ত" নাম শুনিয়া আমার মনে খটকা লাগে। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি যে তাঁহার প্রপিতামহ দেশে আপন পৌরজনের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া অবিবাহিত অবস্থাতেই স্বদেশ ছাড়িয়া ঐ দূর প্রদেশে গিয়া বসবাস করেন। পশ্চিমবঙ্গের কোনো গ্রামে তাঁহার বাড়ী ছিল। সেই দেশে গিয়া তিনি ব্যবসাতে রত হন এবং সেখানে সারস্বত ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিবাহাদি করিয়া বসবাস করিতে থাকেন। এখন তাঁহারা তিন চারিটি পরিবারে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সশীতল গ্রামের দত্ত পরিবারের লোকসংখ্যা চল্লিশ পঞ্চাশ জন হইবে।

মোহন দত্তের পিতার নাম সদাশিব দত্ত। পিতামহের নাম কেশব দত্ত। প্রপিতামহের নাম ইনি বলিতে পারিলেন না। ইঁহাদের গোত্র নাকি বাৎস্য, বচ্চ গোত্র।

ইঁহাদের পারিবারিক ভাষা মহারাষ্ট্র ও সারস্বতদের ভাষা হইতেও একটু বিভিন্ন। এক বচনে "আমি", "তুমি" ব্যবহার করেন। সারস্বতেরা মাছ মাংস খান, মুরগীর ডিম খান। ইঁহারা মাছ খাইলেও মাছের ডিম খান না। সে দেশের থালা খুব বড়, কলাই করা পিতলের। কিন্তু ইঁহারা কাঁসার ছোট থালায় খান। তাহাকে "তাট" বলে। পূর্ব বাংলায় পূজার থালাকে "টাট" এখনও বলে। বিশেষতঃ তামার টাট। সে দেশে নারীরা সাধারণতঃ বহুরঙ্গী শাড়ী পরেন। সধবা অবস্থাতেও এই পরিবারের মেয়েরা ঘোমটা দেন, ঐ দেশে বিধবা না হইলে মেয়েরা ঘোমটা দেন না।

সে দেশে কালীপূজা নাই। দেওয়ালীতে কালীপূজা হয় না, অন্য নানা রকম উৎসব হয়। ইঁহাদের পরিবারে কালীপূজাই প্রধান উৎসব। দেওয়ালীর সময় কালীপূজায় নবরাত্রি ও দশহরা হয়। ধাতুময়ী কালীমূর্তির পূজা হয়।

আমার এক ছাত্র শ্রীমান চিন্তামণি আপ্তে সেই দেশের চিৎপাবন ব্রাহ্মণ। তিনি বলেন তাঁহাদের মধ্যে মজুমদার, চৌধুরী ও ভট্টাচার্য উপাধিধারী ব্রাহ্মণ আছেন। তাঁহাদের বিষয়ে তিনি আর কিছু বলিতে পারেন না। সারস্বত ব্রাহ্মণদের মধ্যে গাঙ্গুলী ও মিত্র আছেন। বোম্বাইর মনোরঞ্জন পত্রিকা খুব প্রাচীন ও সুপ্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্র। ইঁহার সম্পাদক ছিলেন এক মিত্র।

নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ

দক্ষিণ মালাবারের অন্তর্গত বালাঘাটবাসী বৃদ্ধ পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণগণের পুরোহিত লক্ষ্মণ শাস্ত্রীর সহিত স্মৃতিশাস্ত্র ও কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে আলাপ করিতে গিয়া

কথায় কথায় জানিলাম, তাঁহারা সকলেই মনে করেন মালাবারের নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণেরা বাংলাদেশ হইতে সমাগত। পরশুরাম তাঁহাদের ঐ দেশে নিয়া স্থাপন করেন। বাঙ্গালীদের সঙ্গেই নাম্বুদ্রীদের বহু আচার বিচার মেলে। বাঙ্গালীদের মত নাম্বুদ্রীরা শৌচান্তে স্নানের দ্বারা আত্মশুদ্ধি সাধন করেন। অমাবস্যা ও পিতৃপক্ষের সময় নাম্বুদ্রীদের মধ্যে বাঙ্গালীর মতই শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি বিহিত। গীত-গোবিন্দের গান ঘরে ঘরে, নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণের কন্যারা গীতগোবিন্দের গান না শিখিলে শিক্ষা অপূর্ণ থাকে।

দক্ষিণ ভারতে শৈবধর্মের বিশেষ প্রভাব। সেই ক্ষেত্রেই গৌড়ীয় শৈবগণ কম কাজ করেন নাই। দক্ষিণ ভারতে বিশ্বেশ্বর শিবাচার্যের কথা বাংলার বাহিরে বঙ্গীয় বেদাচার্যদের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। সেখানে শৈবাচার্যদের কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে তাহা আর একটু ভাল করিয়া আলোচিত হইবে।

দক্ষিণ ভারত একটি বিরাট ভূখণ্ড। সেখানে নানা স্থানে ভিন্ন ভিন্ন যুগে গৌড় হইতে কত কত যে শৈবাচার্য গিয়াছেন, তাহা সন্ধান করা ও বলা সহজ নহে। পদুকোটাই রাজ্যের ইতিহাসজ্ঞ শ্রী কে, আর বেঙ্কটরামন এই বিষয়ে যে আলোচনা করিয়া কিছু আলোকপাত করিয়াছেন, তাহা হইতে সামান্য কিছু খবর দেওয়া যাউক। এইটুকু নমুনা হইতেই তখনকার দিনের গৌড়ীয় শৈবাচার্যদের সঙ্গে তামিল দেশের যোগ কতক পরিমাণে বুঝা যাইবে।

তামিল দেশ চিরদিনই শিবভক্ত। তাহাতে উত্তর ভারতের ও পশ্চিম ভারতের নানা দেশের শৈবাচার্যগণ আসিয়া নূতন নূতন শাস্ত্র ও জ্ঞান প্রচার করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কাশ্মীরের লকুলীশ মতের আচার্যগণ, মধ্য-দেশের এবং গৌড়ের আচার্যগণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঞ্জোরের রাজ-রাজেশ্বর মন্দিরে প্রাপ্ত একখানি শাসনে দেখা যায় শৈবাচার্য সর্বশিব পণ্ডিত ও তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যকে ভূমিদান করা হইতেছে।

প্রথম রাজেন্দ্র চোলের রাজ্যকালের ১৯ বৎসর ২৪২তম দিনে তাহা সম্পাদিত। সেই শৈব পণ্ডিতগণ আর্যদেশ, মধ্যদেশ ও গৌড়দেশবাসী।

পরবর্তীকালের চোল সম্রাটদের গুরুগণের সংজ্ঞা ছিল "স্বামীদেবর"। একটি লেখে দেখা যায় এই রাজগুরুরা গৌড়দেশের রাঢ় ভূভাগের আমর্দকমঠ বা আমর্দাশ্রম হইতে আগত।

তিরুব্বিড়ৈমরুদুর লেখটি পরকেশরী বিক্রম চোলের চতুর্থ বৎসরে (১১২২

খ্রীঃ) সম্পাদিত। রাজার পুণ্যার্থ স্বামীদেবর শ্রীকণ্ঠশিব মঙ্গলরকুড়িগ্রামে কুলোত্তুঙ্গ চোলীশ্বরম উদয় মহাদেব বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই লেখানুসারে দেখা যায় তদর্থে রাজার আদেশে বিগ্রহের সেবায় দেবদানরূপে ভূসম্পত্তি দেওয়া হইয়াছিল। শ্রীকণ্ঠশিব গৌড়দেশ হইতে চিদম্বরে যান এবং কুলোত্তুঙ্গ প্রথম চোলের এবং বিক্রম চোলের গুরুপদে বৃত হয়েন। আরপাক্কম শাসনে দেখা যায় জ্ঞানশিব দেব ছিলেন গৌড়দেশের দক্ষিণ রাঢ় (লাট) বাসী। জ্ঞান শিবের আর এক নাম উমাপতি দেব। পর কেশরী দ্বিতীয় রাজাধিরাজের পঞ্চম বৎসরে (১১৬৮ খ্রীঃ) শাসনখানি সম্পাদিত। উমাপতি দেবের শিবারাধনার বলে সিংহল হইতে আগত সৈন্যদল সেই রাজার বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারে নাই। রাজা তাই তাঁহাকে দক্ষিণাস্বরূপে আরপাক্কম গ্রামটি দান করেন।

অচ্যুতঃমঙ্গলম্ লেখানুসারে দেখা যায় ১১৮২ খ্রীষ্টাব্দে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় স্বামী-দেবর শ্রীকণ্ঠশম্ভু সোমনাথ দেব মন্দিরে দেবপ্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীকণ্ঠশম্ভুর ভাইর নাম ছিল গোস্বামী মিশ্র। তাঁহারা দক্ষিণ রাঢ় (লাট) বাসী।

শ্রীকণ্ঠের পুত্র সোমেশ্বর ছিলেন অষ্টাদশ বিদ্যা ও শৈব দর্শনে মহানিষ্ণাত। শৈব উপনিষদে ইনি ছিলেন অদ্বিতীয় গুরু। ইঁহারই আর এক নাম ঈশ্বর শিব। ইনি সিদ্ধান্তরত্নাকর গ্রন্থ রচনা করেন। বেঙ্কয্য বলেন, সিদ্ধান্ত সার প্রণেতা ঈশানশিবও ইনিই। কাজেই সিদ্ধান্তসারও ইঁহারই রচনা। ইনি তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গের গুরু ছিলেন ও সেই সম্রাটের স্থাপিত ত্রিভুবন মন্দিরে ইনিই বিগ্রহ স্থাপনা করেন। চোল সম্রাটদের উপর এই গুরুদের দুর্দম প্রতাপ ছিল। একবার রাজাজ্ঞায় দুইজন শৈব আচার্য নিযুক্ত হইয়াছিল। স্বামীদেবর অর্থাৎ রাজগুরু আপন অনুশাসন বলে তাহা নাকচ করিয়া দেন।*

গুরুর আজ্ঞানুসারে আর দুইজন শৈব আচার্য নির্বাচিত হইয়া বংশপরম্পরা সেই অধিকার ভোগ করেন।

বেঙ্কয্য বলেন ঈশান শিব আর একজন গুরু ছিলেন। তিনি তুলা ক্রিয়াক্রম দ্যোতিকা নামে[১০] এক গ্রন্থ লেখেন। তিনি আমর্দক মঠের। কাজেই সিদ্ধান্তসার প্রণেতা ঈশানশিব হইতে ইনি ভিন্ন ব্যক্তি।

তৃতীয় বাণরাজের রাজ্যকালে স্বামীদেবর বা রামগুরু ছিলেন শাণ্ডিল্য গোত্রীয় সোমনাথ দেব। চিদম্বরম দান শাসন অনুসারে দেখা যায় ইনি ছিলেন উত্তর পাঠের উত্তর রাষ্ট্রের উত্তরাগ্রহার বাসী। রাষ্ট্রসংসদ হইতে প্রাপ্ত আপন

ভূমি হইতে ইনি দেবালয়ের পুষ্পোদ্যান রচনার্থ ভূমিদান করিয়াছেন। তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গদেবের গুরু সোমেশ্বর ও ইনি হয়তো অভিন্ন।

তারামঙ্গলম্ শাসনে দেখা যায় গৌড়চূড়ামণি ও বিদ্যাসমুদ্র উপাধিধারী শ্রীকণ্ঠ দেবের পিতাকে স্থানীয় ছয়জন বেল্লাল ভূমি দান করিয়াছেন। পুরাতন দপ্তরে তাহাদের একজনের নাম পাওয়া যায়। তিনি জটাবর্মণ সুন্দরপাণ্ড্য (প্রথম) রাজার সমকালীন (১২৫১ খ্রীঃ)। কাজেই ১৩শ শতাব্দীর প্রথমভাগে শ্রীকণ্ঠ-জীবিত ছিলেন।

রামনদ জেলার তিরুপ্পত্তুর শাসনে দেখা যায় ১২১৬ সালে তিরুঞান সম্বন্ধ মঠের আচার্য শ্রীকণ্ঠশিবকে ভূমি বিক্রয় করা হইতেছে। ইনি খুব সম্ভব অন্য ব্যক্তি।

অনেকের মতে এই গৌড়ীয় শিবাচার্য রাজগুরু শ্রীকণ্ঠই ব্রহ্মমীমাংসা ভাষ্যের প্রসিদ্ধ টীকাকার।[১১]

সূর্য নারায়ণ শাস্ত্রীর মতে ব্রহ্মমীমাংসা ভাষ্যকার শ্রীকণ্ঠ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মানুষ। তখন সন্তান আচার্যেরা শৈবসিদ্ধান্ত গড়িয়া তুলিতেছিলেন।

১২৬৬ খ্রীষ্টাব্দে পাণ্ড্য জটাবর্মণ সুন্দরের পঞ্চদশ রাজ্যাব্দের কাগজপত্রে তাঁহার নাম পাওয়া যায়।[১২]

রাজগুরু শ্রীকণ্ঠের শিষ্য তৎপুরুষ শিবাচার্যের জন্য তিরুবানইক্ কোবিলে মন্দির স্থান হয়সল রাজা বীর রামনাথ এক মঠ নির্মাণ করিয়া দেন। তাঁহার প্রশিষ্য গৌতম রাবলয় এই মঠের জন্য মন্দিরাধ্যক্ষদের কাছে ভূমিক্রয় করেন।

এই পরম্পরাতে আর দুইজন স্বামীদেবর বা রাজগুরুর নাম উল্লিখিত দেখি। তাঁহাদের একজন নায়নার (প্রভু) মহাগণপতি বামদেব। তেনকাশীর ১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দের শাসনে দেখা যায় যে উত্তর পাঠের গঙ্গার উত্তরতীরের গৌড়-রাষ্ট্রের বরেন্দ্রগ্রামের আমর্দাশ্রমাচার্য হইলেন দান-গ্রহীতা এবং রাজা জটাবর্মণ ত্রিভুবন চক্রবর্তী কুলোত্তুঙ্গ পাণ্ড্যদেব হইলেন দাতা। এই পাণ্ড্যরাজ্যটি ছিল বর্তমান তামিল নাদের তিন্নেভেল্লি জেলায়।

এই পরম্পরার দ্বিতীয় জন হইলেন স্বামীদেবর বা রাজগুরু মহাগণপতি ভট্ট। তিনিও রাঢ়-বরেন্দ্র গ্রামের আমর্দাশ্রমের আচার্যগুদ্ধ সন্তান। ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা জটাবর্মণ ত্রিভুবন চক্রবর্তী কোনেরিন সেই কোণ্ডান অভিরাম পরাক্রম পাণ্ড্যদেব কুন্তালম শাসনে তাঁহাকে দান করেন। দেখা যাইতেছে আমর্দাশ্রম রাঢ়-বরেন্দ্রে অবস্থিত। হয়তো একই মঠের দুই শাখা রাঢ়ে ও বরেন্দ্রে ছিল

অথবা বিদেশে রাঢ়-বরেন্দ্র দুইপ্রদেশ যুক্ত হইত। যেমন কাশীতে এখনও বাকলা-বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণদের একসমাজ বলিয়া ধরা হয়।

পর পর সাতজন গৌড় আচার্যের নাম করা যায়। তাঁহারা সবাই আমর্দক মঠের শুদ্ধ সন্তান এবং তাঁহারা একাদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী চোল এবং পাণ্ড্য রাজাদের গুরু।

১। রাজা কুলোতুঙ্গ প্রথম চোল এবং বিক্রম চোল রাজার গুরু শ্রীকণ্ঠশিব।

২। রাজা দ্বিতীয় রাজেন্দ্র রাজের গুরু উমাপতিদেব। উমাপতির আর এক নাম জ্ঞানশিব।

৩। রাজা তৃতীয় কুলোতুঙ্গদেবের গুরু শ্রীকণ্ঠশম্ভু (অন্তত ১১৮২ খ্রীঃ)।

৪। রাজা তৃতীয় কুলোতুঙ্গদেব এবং তৃতীয় রাজ রাজদেবের গুরু সোমেশ্বর (সোমনাথ বা ঈশ্বরশিব নামেও তিনি প্রচলিত) সময় ১১৯৩ এবং ১২২০ খ্রীষ্টাব্দ।

৫। রাজা জটাবর্মণ সুন্দর প্রথম পাণ্ড্যদেবের গুরু (সময় ১২৫৭, ১২৬৪, ১২৬৬ খ্রীঃ) শ্রীকণ্ঠদেব।

৬। রাজা জটাবর্মণ ত্রিভুবন চক্রবর্তী কুলোতুঙ্গ পাণ্ড্যদেবের (১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দ) গুরু মহাগণপতি বামদেব।

৭। রাজা জটাবর্মণ ত্রিভুবন চক্রবর্তী অভিরাম পরাক্রম পাণ্ড্যদেবের (১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দ) গুরু মহাগণপতি ভট্ট।

লক্ষাধ্যায়ী গোলকি সন্তানের পরম্পরায় আদি স্থান হইল মধ্যভারতের চেদি জনপদের দাহল ভূভাগে। এই সন্তানের একজন আচার্য ছিলেন প্রসিদ্ধ বৈদিক আচার্য বিশ্বেশ্বর। ইনি গৌড়ের অন্তর্গত রাঢ়েস্থিত পূর্বগ্রামবাসী। তিনি ছিলেন কাকতীয় গণপতির গুরু। ইঁহার কথা পূর্বেও বলা হইয়াছে। মালকপুর শাসনে[১৩] দেখা যায় যে ১১৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজা গণপতির কন্যা রুদ্র দেবী এই গুরুকে কৃষ্ণবেণীনদীকূলস্থ মন্দর গ্রামটি দান করিতেছেন। গুরু এই গ্রামের নাম রাখিলেন বিশ্বেশ্বর গোলকি। সেখানে মঠ-মন্দির, সদাব্রত ও ব্রাহ্মণদের জন্য অগ্রহার স্থাপন করিলেন। এই অগ্রহারে তামিল ব্রাহ্মণদেরও বাসস্থান ছিল। এখানে তাঁহার চেষ্টায় প্রসূতিশালা প্রতিষ্ঠিত হইল। এখানে যে সব ব্রাহ্মণ দানপ্রাপ্ত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেন তাঁহাদের মধ্যে ৩০ জন হইলেন গৌড়দেশের দক্ষিণরাঢ়ের পূর্বগ্রামবাসী। তাঁহারা সামবেদী এবং শ্রীবৎস গোত্রীয়। এই শাসনে আচার্য বিশ্বেশ্বর প্রতিষ্ঠিত বহু মঠ মন্দিরের নাম পাওয়া যায়। ত্রিচিনপল্লীর

নিকটে তিরুবাণীক্কেবিলে অখিলাগুনায়কী তীরুমতম্ নামক স্থানে যাইয়া এই গুরু ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দে কুমারমঙ্গলম্ নামে গ্রাম দানপ্রাপ্ত হন[১৪]।

ইঁহার চেষ্টায় সারা তামিল দেশে গোলকি সম্প্রদায়ের এই শাখামঠ স্থাপিত হয়। এই মঠের শিষ্যেরা দক্ষিণ ভারতের বহু মন্দিরের কার্য পরিচালনায় সহায়তা করিয়াছেন। এই গুরুর তিনটি সন্তানের নাম পাওয়া যায় (১) পরিপূর্ণ শিব, (২) শান্তশিব বা শান্তশম্ভু, (৩) উত্তমশিব। ইঁহারা সবাই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তামিল দেশের শৈব মঠে গৌড়ীয় আচার্যগণের দান অতিশয় গৌরবময়। ইঁহাদের সাধনা এবং তামিল রাজাদের সশ্রদ্ধ আনুগত্য দেখিলে মনে হয়, ভারতের নানাপ্রদেশের মধ্যে ঐক্যস্থাপনার কাজে শৈবাচার্যদের সাধনা উপেক্ষণীয় নহে।

দক্ষিণ ভারতে বাঙ্গালী মুসলমান

হিন্দু বাঙ্গালীর ন্যায় মুসলমান বাঙ্গালীও বহু প্রাচীনকাল হইতে দক্ষিণ ভারতে নানা ভাবে যাতায়াত করিয়া আসিয়াছেন। আহম্মদনগরের প্রতিষ্ঠা হয় ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। তাহার পূর্বে সেই দেশে বাঙ্গলা দেশের এক মুসলমান ফকীর আসিয়া বাস করেন। বাবা বাঙ্গালী বলিয়া তাঁহাকে সকলে জানিত। এখনো তাঁহার সমাধি স্থানে জুন মাসে একটি মেলা হয় ও বহু ফকীর ও ভিক্ষুকের সমাগম হয়। সেই মেলার নাম এখনও বাবা বাঙ্গালীর মেলা।[১৫]

দক্ষিণ ভারতে আজও বাঙ্গালী মুসলমানদের গতিবিধি আছে। মালাবারে অনেক সমুদ্রপোতের নাবিক চাটগাঁয়ের মুসলমান।[১৬]

মক্কা, বগদাদ এবং ভারতের আজমীর প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালী মুসলমানের উপনিবেশ আছে।

মালদ্বীপের বিষয় লিখিতে গিয়া ইব্‌ন্ বতুতা বলেন সেখানে রাজত্ব চলিতেছিল এক নারীর। তাঁর নাম খদিজা। তাঁহার পিতামহ ছিলেন সলাহুদ্দীন, তিনি ছিলেন বাঙ্গালী। তাঁর পিতা ছিলেন জালালুদ্দীন উমর। তাঁর পতির নাম জমাল উদ্দীন। ইব্‌ন্ বতুতার ভ্রমণ কাহিনী ইংরাজীতে অনুবাদ করা হইয়াছে। বইখানির ২৪৪ পৃষ্ঠার অনুবাদে খদিজার পিতামহের নাম ও তিনি যে বাঙ্গালী ছিলেন তাহা লেখা নাই। শুধু আছে খদিজা তাঁর রাজ্য পান পিতামহ ও পিতা হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে। খদিজার ভাই সাহাবুদ্দীন রাজা হইলেন। কিন্তু

তাঁর বয়স ছিল অল্প ও তাঁহাকে মারিয়া ফেলা হয়। পরে পুরুষ আর কেহ রাজ্যাধিকারী না থাকায় খদিজা রাজ্যলাভ করেন।

মূল গ্রন্থে আছে খদিজার পিতামহের নাম এবং তিনি যে বাঙ্গালী ছিলেন তাহার উল্লেখ।[১৭] মূলের বক্তব্যকে খুবই সংক্ষেপে অনুবাদ করা হইয়াছে। মূলের ছয় খণ্ডকে তাই একখণ্ডে পরিণত করা গিয়াছে। তাই মূলে যে সব খুঁটিনাটি কথা আছে অনুবাদে সব সময় তা মেলে না।

প্রমাণ-পঞ্জী

১ যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ—ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টার্লি ৬ খণ্ড।

২ বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী—এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ৯ম খণ্ড

৩ কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার—দি বিগিনিংস অব সাউথ ইণ্ডিয়ান হিস্টরি

৪ বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৩০৫

৫ বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী

৬ বেলগাঁও গেজেটিয়ার, পৃ ৯১

৭ ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টালি, ১৯৩০

৮ ভাণ্ডারকর-উদ্ধৃত অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সেনের প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, ১৩৪৮

৯ তিরুক্কাভাইয়ুর ইনস্‌ক্রিপশান

১০ হুলট্‌জ, রিপোর্ট অন স্যাংস্কৃট ম্যানাস্‌ক্রিপ্ট

১১ শ্রীকার ভাষ্য, হায়াবদান রস, প্রথম খণ্ড

১২ চিদম্বরম্, ১৩।২৭৪

১৩ A. R. E., 1917, pp. 123, 126-7

১৪ P. S. I., 196

১৫ আহম্মদনগর গেজেটিরর, পৃ ৬৯২

১৬ মাদ্রাজ সেন্সাস রিপোর্ট, ১৯১১

১৭ আজাইবাৎ আসফার সোসাইটি এশিয়াটিক, প্যারিস

উৎকলে বাঙ্গালী

উৎকলের সঙ্গে প্রাচীনকাল হইতেই বাংলার ঘনিষ্ঠ যোগ। উড়িষ্যায় বহু দেবমন্দির ও সরোবর। তাহার মধ্যে কোনো কোনোটির রচয়িতা বাঙ্গালী। ইনস্ক্রপসন অব বেঙ্গল গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে শ্রীযুত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত একটি শিলালেখের পরিচয় দিয়াছেন। লেখটি ভুবনেশ্বরে অনন্তবাসুদেব মন্দিরে লগ্ন ছিল। ১৮১০ সালে জেনারাল স্টিউয়ার্ট সাহেব তাহা বিচ্ছিন্ন করিয়া কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিতে আনেন। পরে পাণ্ডাদের আপত্তিতে তাহা পুনরায় ফিরাইয়া দিতে হয়। কিন্তু তাহা মন্দিরের অপরদিকে গাঁথা হয়। ইহাতে দেখা যায় রাঢ় দেশের সিদ্ধল গ্রামে ছিল ভট্ট ভবদেবের নিবাস। অনেকে মনে করেন বর্ধমান জেলার অজয় নদের তীরে গঙ্গারাম গ্রামের কাছে সিদ্ধল গ্রাম ছিল। কেহ কেহ মনে করেন বীরভুম জেলার লাভপুরের সিধল গ্রামই প্রাচীন সিদ্ধল। এইখানে সাবর্ণ বংশীয়দের প্রাচীন স্থান। ভবদেবের কথা বাংলার বেদবিদ্যা প্রসঙ্গে কতকটা বলা হইয়াছে, এখানে তাঁহার বিষয়ে আরও কিছু বলা যাউক। ভোজবর্মদেবের বেলাব তাম্রশাসনে জানা যায় সিদ্ধল গ্রামে বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বাস ছিল। সাবর্ণকুলেই ভবদেবের জন্ম। গৌড়রাজ তাঁহাকে হস্তিনাভিট্ট গ্রাম দান করেন। তাঁহার কুলে আদিদো ছিলেন বঙ্গরাজের সন্ধিবিগ্রহী সচিব। তাঁহার পুত্র গোবর্ধনের পত্নী ছিলেন বন্দ্যঘটীয় বংশের কন্যা। তাঁহার পুত্র ভবদেবই এই প্রশস্তির উদ্দিষ্ট নায়ক। এই ভবদেব ব্রহ্মাদ্বৈত দর্শনেও পণ্ডিত ছিলেন। ভট্ট কুমারিলের গ্রন্থের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল। সিদ্ধান্ত-তন্ত্র-গণিতে সুপণ্ডিত ভবদেব ফল সংহিতায় ও হোরা শাস্ত্র রচনায় দ্বিতীয় বরাহ তুল্য ছিলেন। অর্থশাস্ত্রে আয়ুর্বেদে অস্ত্রবেদ প্রভৃতিতে নিপুণ ভবদেব স্মৃতি ও মীমাংসা শাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। (এখন দেখা যাইতেছে যে ভুবনেশ্বরে অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরে ভবদেবের কোনো সম্পর্ক ছিল না। ভুলক্রমে ঐ শাসন ওখানে আসিয়া পড়ে এবং তাই ননীগোপাল বাবু এই ভুল সিদ্ধান্ত করেন-ক্ষিঃ)

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইল লক্ষ্মণ সেনের কাল। তাঁহারই সময়ে জয়দেব ছিলেন মহাকবি। পরে জগন্নাথে তিনি তাঁহার জীবন যাপন করেন। ভক্তমালে, হরিভক্তি প্রকাশিকা প্রভৃতি হিন্দী ভক্তচরিতে তাঁহার জীবনীর পরিচয় পাই। কাশ্মীর হইতে কুমারিকায় এবং দ্বারকা হইতে কামরূপে সর্বত্র তাঁর গীতগোবিন্দের

আদর। গ্রন্থসাহেবেও তাঁহার গান উদ্ধৃত। কিন্তু সে গান গীতগোবিন্দের গান হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। সেই জয়দেব হইলেন রামানন্দ, কবীর, নানক প্রভৃতির আদি গুরু। সেই ভাবেই গ্রন্থসাহেবে তাঁহার পদ গৃহীত হইয়াছে।

কাজেই মহাপ্রভুর বহু পূর্বেই অনেক বাঙ্গালী মনীষী জগন্নাথধামে গিয়া বাস করিতেছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ষষ্ঠ খণ্ডে তাঁহাদের কিছু খবর পাই। এখানে আমরা দেখি সার্বভৌম বাসুদেব ভট্টাচার্যকে। বাসুদেব হইলেন নদীয়া নিবাসী বিশারদের পুত্র। গোপীনাথ আচার্য তাঁহার ভগ্নীপতি।

আচার্য ভগিনীপতি শ্যালক ভট্টাচার্য

গোপীনাথ আচার্য, সার্বভৌম ভট্টাচার্যেরও আত্মীয় এবং তিনি মহাপ্রভুরও মহত্ত্ব জানেন। তাই দেখি তিনি সার্বভৌমকে সর্বভাবে মহাপ্রভুর মহত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেছেন।

সাধারণতঃ লোকের মধ্যে এইরূপ কথা চলিত আছে যে সার্বভৌম ছিলেন পূর্বে নবদ্বীপে মহাপ্রভুর গুরু। কিন্তু এখানে সেই কথাবার্তায় তো তাহা মনে হয় না। তিনি মহাপ্রভুকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, জগন্নাথ মন্দিরে তাঁহাকে ভাবদশাগ্রস্ত দেখিয়া সরাইয়া লইয়া আসিয়া সেবা করিলেন তবু তাঁহাকে তো চিনিলেন না।

গোপীনাথ আচার্যেরে কহে সার্বভৌম।
গোসাঞির জানিতে চাহি কাহাঁ পূর্বাশ্রম ॥
গোপীনাথ আচার্য কহে নবদ্বীপে ঘর।
জগন্নাথ নাম পদবী মিশ্র পুরংদর ॥
বিশ্বম্ভর নাম ইহাঁর তাঁহার ইহোঁ পুত্র।
নীলাম্বর চক্রবর্তীর হয়েন দৌহিত্র ॥
সার্বভৌম কহে নীলাম্বর চক্রবর্তী।
বিশারদের সমাধ্যায়ী এই তাঁর খ্যাতি ॥
মিশ্র পুরংদর তাঁর মান্য হেন জানি।
পিতার সম্বন্ধে চক্রবর্তীর পূজ্য করি মানি ॥
নদীয়া সম্বন্ধে সার্বভৌম হৃষ্ট হৈলা।
প্রীতি হৈঞা গোঁসাঞিরে কহিতে লাগিলা ॥

সার্বভৌম মহাপ্রভুকে তাঁহার কুলপরিচয় দ্বারা মাত্র কোনো মতে চিনিতে পারিলেন। নিজের ছাত্র হইলে কখনও এইরূপ হইত না। এখনকার কালে বরং কলেজের অধ্যাপকরা ছাত্রদের না চিনিতে পারেন কারণ ছাত্রদের সঙ্গে তাঁদের "রোলকল" করার বেশি সম্বন্ধ সব ক্ষেত্রে হইবার সুযোগ ঘটে না। কিন্তু সেকালে গুরুশিষ্য সম্বন্ধ ছিল পিতা-পুত্রের মত।

তবে বাসুদেব সার্বভৌম বাঙ্গালী ছিলেন। মহাপণ্ডিত বলিয়া তিনি পুরী রাজার সভাপণ্ডিতের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার ভবনেই পুরীর গঙ্গামঠ প্রতিষ্ঠিত। এই মঠের স্থাপয়িত্রী ছিলেন নবদ্বীপ বাসিনী এক ভক্ত নারী। সার্বভৌম প্রথমে মহাপ্রভুকে বেদান্ত শিখাইতে গিয়াছিলেন। পরে মহাপ্রভুর জ্ঞানের গভীরতা ও ভক্তির মাহাত্ম্য দেখিয়া তিনি মহাপ্রভুর সর্বপ্রধান ভক্ত হইয়া উঠিলেন।

মহাপ্রভুর পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্র পূর্বে যাজপুর বাসী ছিলেন। সেখানেও তাঁহারা বাংলা দেশ হইতেই আসেন পরে আবার শ্রীহট্টে যান। মহাপ্রভু ভক্তির বন্যায় আবার আসিলেন সেই উৎকলতীর্থ পুরীধামে। মহাপ্রভুর পরিবার বহু শতাব্দীর যাতায়াতে উৎকল ও বঙ্গদেশকে প্রেমসূত্রে দৃঢ়ভাবে গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। সেই বন্ধন এখন আমরা ছেদন করিতে উদ্যত।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস বলেন, পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সুরেশ্বর সর্বাধিকারী মহাশয় উড়িষ্যার শাসক পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়া রঘুনাথপুরে জমীদারী স্থাপন করেন। পুরী মন্দিরের বহু উন্নতি তাঁহার হাতে হয়। ইঁহারই বংশে ডাক্তার সুরেশ সর্বাধিকারীর জন্ম।

জীবের শেষলীলা দিয়া মহাপ্রভু পুরীকে ধন্য করিলেন। মহাপ্রভুর আকর্ষণে অবধূত নিত্যানন্দ, দাস রঘুনাথ, ভক্ত হরিদাস প্রভৃতি বহু বাঙ্গালী সাধু পুরীতে আসেন। কিন্তু মহাপ্রভুর অনুরোধে প্রেমধর্ম প্রচারার্থ নিত্যানন্দ প্রভৃতি কেহ কেহ বাংলায় ফিরিয়া যান।

১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভুর তিরোভাব হয়। তাহার পরেই বাঙ্গালী ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল পুরীতে যান। ইঁহার পুত্র বিখ্যাত শ্যামানন্দ। তিনি ও তাঁহার শিষ্য রসিকমুরারি উৎকলে মহাপ্রভুর মত প্রচার করেন। তাহার ফলেই পুরীর রাজা, ময়ূরভঞ্জের রাজা প্রভৃতি বড় বড় দেশপতি মহাপ্রভুর ধর্ম গ্রহণ করেন। শ্যামানন্দকে হিন্দী ভক্তরা ঠিক পরিচয়ই দিয়াছেন,

বঙ্গোৎকল শ্যামানন্দ প্রভু প্রেমরস মাতা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্র রায় কিছুকাল কটকে ও পুরীতে বাস করেন।

অদ্বৈতবংশাবতংস গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার শেষজীবন পুরীতে অতিবাহিত করেন। নরেন্দ্র সরোবরতীরে তাঁহার মঠ সকলে জটিয়া বাবার মঠ বলিয়া জানে।

বালেশ্বর জেলায় বহু বাঙ্গালী বসবাস করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে জমিদার।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে

বিহার মিথিলা ও বাঙ্গলার মধ্যে এতটা ভেদ নাই যে তাহার উল্লেখ করার প্রয়োজন হয়। বিহারের সর্বত্র বহু বাঙ্গালী উপনিবিষ্ট আছেন। তাঁহারা উত্তর রাঢ়ী সম্প্রদায়ের, তাঁহাদের কথা এখানে সবাই জানেন বলিয়া আর পৃথক উল্লেখ করিতেছি না।

উত্তর-পশ্চিমের মধ্যে কাশী চিরদিনই বৃহত্তর বাংলা দেশের একটি প্রধান ক্ষেত্র। কতকাল হইতে যে কাশীতে বাঙ্গালীদের যাতায়াত তাহা বলা সহজ নহে। তবু কাশীর কথা বলিবার পূর্বে আর দু'একটি স্থানের নাম করা যাউক। রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত মুরাদাবাদ জেলায় সেন্সস রিপোর্ট অনুসারে জানা যায় যে প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্বে সম্বল নগরে, এবং সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্বে আমরোহা নগরে একদল বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বসবাস করেন।

আইন আকবরীতে দেখা যায় যে তখনকার দিনে ভাল রণতরী প্রস্তুতের জন্য বাংলা দেশ হইতে সুদক্ষ সব কারিগর আনাইয়া রাজাজ্ঞায় এলাহাবাদ ও লাহোরে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল।

ছয়শত বৎসর পূর্বে বাদশা বলবনের পুত্র নাসিরুদ্দীন কয়েকজন গৌড় কায়স্থকে এলাহাবাদ সুবার অন্তর্গত নিজামাবাদ, ভাদোই, কোলি প্রভৃতি স্থানে কানুনগোর পদে নিযুক্ত করেন। সেই দেশে বসবাস করিয়া তাঁহারা নিজামাবাদী নামে অভিহিত হন।[১৮]

হিন্দী সাহিত্যে বাঙ্গালীদের রুচি সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা পুরাতন সাহিত্যেও পাওয়া যায়।

১৫৮০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি গাজীপুর জেলায় শেখ হুসনের গৃহে কবি উসমানের জন্ম। ১৬১৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ চিত্রাবলী লেখা হয়। এই গ্রন্থের "কুমার অন্বেষণ"খণ্ডে (কুঁরর-ঢুঁঢন খণ্ড) দেখা যায়, সবাই মানেন

পঞ্চামৃত। কিন্তু বাঙ্গালীদের সপ্তামৃত। তাঁহাদের সপ্ত অমৃত হইল—কলা, আমানি, পান, রস, শাক, মাছ, ভাত।”

সব কঁহ অমিরিত পাঁচ হৈ বংগালী কঁহ সাত
কেলা কাঁজী পান রস সাগ মাছরী ভাত ॥[১৯]

ইহাতেই বুঝা যায় তখনকার দিনে উত্তর পশ্চিমে বাঙ্গালীর রুচি বিলক্ষণ পরিচিত ছিল।

প্রশস্ত পাদের বৈশেষিক ভাষ্যের কিরণাবলী টীকা উদয়নের অতি প্রৌঢ় রচনা। তাই পদ্মনাভ কিরণাবলীভাস্কর রচনা করেন। পদ্মনাভের নামের শেষে মিশ্র বা ভট্টাচার্য দেখা যায়। মিশ্র বাংলাতেও আছে। মহাভারত টীকাকার অর্জুন মিশ্র বাঙ্গালী, প্রবোধ চন্দ্রোদয় রচয়িতা কৃষ্ণমিশ্র রাঢ়াপুরী অর্থাৎ রাঢ়ের ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রামবাসী[২০]। আর তখন ভট্টাচার্য পদবী বাংলা দেশেই চলিত ছিল[২১]। ইনি বাংলা দেশ ছাড়িয়া বুন্দেলখণ্ডে বাঘেল বংশীয় নরপতিদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রেৱার রাজা রামচন্দ্র দেবের পুত্র বীরভদ্র ছিলেন তাঁহার আশ্রয়দাতা। বীরবর বীরভদ্রের (১৫৬৯-১৫৯২) উৎসাহেই তিনি এই বীরবরীয় টীকা লেখেন (১৫৭৮)। স্বর্গীয় সুরেন্দ্রলাল গোস্বামী তাঁহার তর্কভাষার ভূমিকাতে বীরবরীয় টীকা বুন্দীর রাজা বীরসিংহের (১৩৪১-১৪১৯) উৎসাহে রচিত বলিয়াছেন। পদ্মনাভের রচিত বহু গ্রন্থের নাম কিরণাবলী ভাস্কর ভূমিকায় গোপীনাথ কবিরাজ দিয়াছেন। এই বিবরণও সেখান হইতে গৃহীত।

প্রমাণ-পঞ্জী

১৮ বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী

১৯ কথিকা কৌমুদী, পহলা ভাগ, পৃ ৩২২

২০ প্রবোধ চন্দ্রোদয়

২১ বেদান্ত কল্পলতিকা, এস. বি. টি.—তৃতীয় খণ্ড, ভূমিকা

কাশী

মহাপ্রভুর পূর্বেও কাশীতে বহু বাঙ্গালী পণ্ডিত গিয়া বাস করিয়াছেন। বরেন্দ্র দেশবাসী কুল্লুক ভট্ট মনুসংহিতার যে টীকা লেখেন তাহা আজও বিখ্যাত। তাঁহার আত্মপরিচয়ে তিনিই লিখিয়াছেন যে গৌড় বরেন্দ্রে তাঁর জন্ম।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজনিগ্রহে মহেশ্বর বিশারদ কাশীতে চলিয়া যান। ইনি বিখ্যাত বাসুদেব সার্বভৌমের পিতা।

পূর্বে বলা হইয়াছে তন্ত্রবিশারদ সাধক সর্বানন্দ ১৪২৫ খ্রীস্টাব্দে সিদ্ধিলাভ করিয়া নানা স্থান ঘুরিয়া কাশীতে গিয়া বাস করেন।

চৈতন্য মহাপ্রভুও কাশীতে গিয়া কয়েকজন পণ্ডিত বাঙ্গালীর সঙ্গ পাইয়াছেন।

তপন মিশ্রের বন্ধু বৈদ্য চন্দ্রশেখর সেখানে পুঁথি লিখনের কাজ করিতেন। তাঁহার বন্ধু ছিলেন কীর্তনিয়া পরমানন্দ। বাঙ্গালী কীর্তনিয়া থাকাতে মনে হয় সেখানে তখন অনেক বাঙ্গালার বাস ছিল। নহিলে কীর্তন করা পোষাইত কেমন করিয়া? মহাপ্রভু কাশীতে দুই মাস ছিলেন। সেখানে মহাপণ্ডিত প্রকাশানন্দকে নিজ মতে আনেন। কিন্তু তিনিই কি বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলী রচয়িতা? নানা কারণে তাহাতে সংশয় মনে হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে মহাপণ্ডিত শ্রীমধুসূদন সরস্বতী কাশীতে গিয়া বাস করেন। কথিত আছে যখন ভক্ত তুলসীদাস কাশীতে নানা কারণে ও শত্রুপক্ষের উৎপীড়নে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতেছিলেন, তখন মধুসূদন তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান "আনন্দকানন কাশীতে তো বৃক্ষ নাই যে সন্তপ্ত হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করি। এখানে তুমিই একমাত্র তরু হে তুলসী। ভাগ্যক্রমে তুমি জঙ্গম।"

আনন্দ কাননে কাশ্যায়াং তুলসী জঙ্গমস্তরুঃ।
কবিতা-মঞ্জরী যস্য রামভ্রমরভূষিতা॥

কাশীর মহারাজা স্বর্গগত ঈশ্বরী প্রসাদ সিংহ এই শ্লোকটির অনুবাদ করেন।

তুলসী জংগম তরু লসৈ আনংদ কানন খেত।
কবিতা জাকী মঞ্জরী রাম ভ্রমর রস লেত॥

এই মধুসূদনের বাড়ী ছিল ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালীপাড়ার উনসিয়া গ্রামে।

তাঁহার রচিত অদ্বৈতসিদ্ধি, গূঢ়ার্থদীপিকা, অদ্বৈত-রত্নরক্ষণ, সিদ্ধান্তবিন্দু, সংক্ষেপ শারীরক ব্যাখ্যা, বেদান্ত কল্পলতিকা, প্রস্থান ভেদ, ভক্তিরসায়ন প্রভৃতি গ্রন্থ সমস্ত ভারতে অত্যন্ত সমাদৃত।

বৈদান্তিক হইলেও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ইঁহার চমৎকার সব শ্লোক আছে। শিব মহিমা স্তবেরও একটি টীকা তাঁহার লেখা।

মধুসূদন সরস্বতীর রচিত বেদান্তকল্পলতিকা গ্রন্থের সুলিখিত ভূমিকায় বামাজ্ঞা পাণ্ডে অনেক খবর দিয়াছেন। মধুসূদনের পূর্বপুরুষ রামমিশ্র ছিলেন ফরিদপুর কোটালীপাড়াবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণ।

মধুসূদনের পিতার নাম ছিল প্রমোদন পুরন্দরাচার্য। তাঁহার চারি পুত্র শ্রীনাথ চূড়ামণি, যাদবানন্দ ন্যায়াচার্য, কমলজনয়ন, বাগীশ গোস্বামী। কমলজনয়নই মধুসূদন। তিনি নবদ্বীপে হরিরাম তর্কবাগীশের ছাত্র হন এবং গদাধর চক্রবর্তী ছিলেন তাঁহার সতীর্থ।

নবদ্বীপে সমায়াতে মধুসূদন বাক্‌পতৌ।
চকম্পে তর্কবাগীশ কাতরোঽভূদ্ গদাধরঃ॥

কমলজনয়ন প্রথমাশ্রমেই সংসার ত্যাগ করেন। গুরু বিশ্বেশ্বর সরস্বতী তাঁহাকে মধুসূদন সরস্বতী নাম দেন। সিদ্ধান্ততত্ত্ববিন্দু টীকাকার পুরুষোত্তম সরস্বতী সিদ্ধান্তরহস্য টীকাকার শেষগোবিন্দও তাঁহার ছাত্র। কাশী চৌষট্টি ঘাটে গোপাল মঠে মধুসূদন বাস করিতেন। মধুসূদনের মেজদাদা যাদবানন্দ প্রতাপাদিত্যের সভাচূড়ামণি ছিলেন।

প্রতাপাদিত্য, আকবর, গদাধর ভট্টাচার্য, তুলসীদাস, নৃসিংহাশ্রমের সমকালীন হওয়ায় মধুসূদন ১৫৪০—১৬২৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন বলা যায়। মধুসূদন বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

তুলসী দাসের লেখার সঙ্গে আর একটি বাঙ্গালী সাধকের যোগের কথা এখানে বলা উচিত।

শ্রীযুত রামনরেশ ত্রিপাঠী মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত রামচরিত মানস গ্রন্থের ভূমিকাতে ১৩৭ পৃষ্ঠা হইতে ১৬০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখাইয়াছেন কোন কোন গ্রন্থের নিকট গোস্বামী তুলসী দাস তাঁহার বিখ্যাত রামায়ণ রচনার জন্য ঋণী। তাহাতে

দেখিতে পাই তুলসীদাসজী কবিকর্ণপুর কৃত আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ গ্রন্থ হইতেও কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে বলা উচিত কবিকর্ণপুর তুলসী দাসের সমসাময়িক মহাপুরুষ। তুলসীদাস তাঁহার রামায়ণের বালকাণ্ডে লিখিয়াছেন,

সংবত সোরহ্ সৈ ইকতীসা।
কঁরৌ কথা হরিপদ ধরি সীসা॥

কবিকর্ণপুর অর্থাৎ পরমানন্দ প্রায় এই সময়েই কি সামান্য কিছু পূর্বেই তাঁহার আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ লেখেন। ইহাতে বুঝা যায় তখনকার দিনেও এক প্রদেশের ভক্তের গ্রন্থ কত দ্রুত অন্য প্রদেশের ভক্তদের কাছে পৌছিত। যদিও তখনকার দিনে ছাপাখানা, ডাকঘর, রেলগাড়ী প্রভৃতি হয় নাই।

বাংলায় বঙ্গসেনকৃত গ্রন্থ ঠিক তেমন করিয়াই দক্ষিণ দেশে যাদব রাজা রামচন্দ্রের সমকালীন হেমাদ্রির নিকট পৌছিয়াছিল। এই প্রসঙ্গ যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

ন্যায়সিদ্ধান্তমালা রচয়িতা জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতির গূঢ়ার্থ বিদ্যোয়তন টীকায় বলিয়াছেন যে তিনি ন্যায় রহস্যকার রসভদ্রের শিষ্য। গোপীনাথ কবিরাজ মনে করেন এই রামভদ্র হইলেন জগদীশ তর্কালঙ্কার শিষ্য রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ।

কাশীতে ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এক ব্যবস্থাপত্রে জয়রামের এক স্বাক্ষর পাওয়া যায়।[২২] কাজেই ১৬০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি তাঁর জন্ম। কাব্যপ্রকাশ-তিলক নামে মম্মটের এক টীকা তাঁহার রচিত। তাঁহার রচিত সাতখানি গ্রন্থ ও ১৯ খানি পুস্তিকার তালিকা মঙ্গলদেব শাস্ত্রী ন্যায়সিদ্ধান্তমালারভূমিকায় দিয়াছেন। এই বিবরণও ঐ ভূমিকা হইতে গৃহীত।

প্রায় তিনশত সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্বে রাঘবেন্দ্রের পুত্র চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৫ সালে ইঁহার রচিত কাব্যবিলাস সরস্বতীভবন গ্রন্থাবলীর মধ্যে গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের সম্পাদনায় বটুকনাথ শর্মা মহোদয় প্রকাশ করেন। তাহাতে চিরঞ্জীবের জীবনীও ছিল। তদনুসারে বুঝা যায় চিরঞ্জীবের আসল নাম ছিল রামদেব বা বামদেব। রাঢ়াপুরবাসী দক্ষের পুত্র কাশীনাথ ছিলেন সামুদ্রকাচার্য। তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় হইলেন রাঘবেন্দ্র। বাল্যকালেই রাঘবেন্দ্র সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হন। তাঁহার গুরু ছিলেন

তত্ত্বচিন্তামণি দীধিতি প্রকাশিকার রচয়িতা ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ। শতাবধান বলিয়া রাঘবেন্দ্রের খ্যাতি ছিল। তিনি মন্ত্রার্থদীপ ও রামপ্রকাশ রচনা করিয়া বৃদ্ধবয়সে কাশীতে দেহত্যাগ করেন।

ইহারই পুত্র রামদেব বা চিরঞ্জীব। পিতার কাছেই তিনি ন্যায় ও অন্যান্য শাস্ত্র পড়েন। কাব্য বিলাসের প্রথমাভঙ্গির অন্তভাগে তিনি স্বীয় গুরু রঘুনাথ ভট্টাচার্যের নাম করিয়াছেন। এইখানে তিনি শতাবধান নিজ পিতার কথা বলিয়াছেন। ভট্টাচার্য শতাবধান ইতি যো গৌডোদ্ভবোহভূৎ কবিঃ।

কাব্য বিলাসে প্রথমা ভঙ্গীতেই তিনি আশ্রয়দাতা "গৌড়শ্রী যশোবন্তসিংহ নৃপতি"র কথা বলিয়াছেন। রাঘবেন্দ্র জাহাঙ্গীর-সাজাহানের সময়কার কৃপারামের শ্রদ্ধালাভ করিয়াছিলেন। কাব্য বিলাসের পুঁথিখানি চরখরীতে মান কবির পুঁথিশালায় ছিল।

কাব্যবিলাস ছাড়া চিরঞ্জীব মাধবচম্পূ, বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী, শৃঙ্গারতটিনী ও বৃত্তরত্নাকর এই চারিখানি পুঁথির কথা অফ্রেক্টের পুঁথির তালিকায় পাই। কাব্যবিলাসে তাঁহার রচিত কল্পলতা ও শিবস্তোত্রের নামও পাওয়া যায়। চিরঞ্জীব নৈয়ায়িক হইলেও তাঁহার রচিত ন্যায়শাস্ত্রের কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই।

তাঁহার আশ্রয়দাতা "গৌড়শ্রী যশোবন্তসিংহ নৃপতি"টি কে? গৌড় শব্দ নামের সঙ্গে থাকায় শ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মন করিলেন তিনি নবাব সুজাউদ্দীনের অধীনস্থ ঢাকার নায়েব দেওয়ান যশোবন্ত সিংহ (১৭২৭-৩৯)।

শ্রীযুত দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে নানা কারণে ইহা সঙ্গত মনে হয় না। ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কাব্য বিলাস পুঁথি খানির লেখন কাল দেখা যায়। চিরঞ্জীবের পিতা ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপে পড়িতেন। চিরঞ্জীবের গুরু রঘুদেব কাশীতে ১৬৫০ সালের কাছাকাছি জীবিত ছিলেন। ১৬৫৭ সালে কাশীতে একটি দলিলে তাঁহার হস্তাক্ষরও আছে।[২৩]

১৬৩২-১৬৫৯ সালে লেখা রঘুদেবের দুইখানি ছোট পুস্তিকা বেনারস সংস্কৃত কলেজে সরস্বতী ভবন লাইব্রেরীতে আছে। কাজেই মনে হয় চিরঞ্জীব তাঁহার কাছে ১৬২৫-১৬৫০ মধ্যে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তাজিক-রত্ননামে একখানি জ্যোতিষ গ্রন্থের রচয়িতা বোধ হয় এই চিরঞ্জীব হইবেন। তাজিক ও রমল হইল মুসলমানদের জ্যোতিষ শাস্ত্র।

চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যদের আদি নিবাস হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া গ্রামে। গ্রামের প্রসিদ্ধি অনুসারে দেখা যায় ঐ গ্রামেরই মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার তাঁহার কনিষ্ঠ ছিলেন। মথুরেশ ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার শ্যামাকল্পলতা লেখেন। চিরঞ্জীবের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৮৯৫ সালেও জীবিত ছিলেন।[২৪]

মাধব চম্পূর পুষ্পিকায় চিরঞ্জীব লিখিয়াছেন, নবদ্বীপে তাঁহার জন্ম, অনেক দিবস বারাণসীতে তাঁহার বাসসৌভাগ্য ঘটিয়াছে; বিদ্যাসাগর নামে কাশীবাসী গুরুর তিনি ছাত্র।

> বাগ্‌দেবী বন্দনাদি রচনা—বিন্যাস দ্বীব্যন্নব-
> দ্বীপ প্রাপ্ত জনে রনেক দিবসং বারাণসী বাসিনঃ।
> বিদ্যাসাগর জাগরোন্নত মতের্ভাব্যামমৈষা কৃতি
> র্বিদ্বদ্ভিঃ কৃপয়া কয়াপি সহসা মাৎসর্য মুৎসৃজ্যতৈঃ॥

পিতার কাশীপ্রাপ্তির পর কাশীতে চিরঞ্জীব প্রখ্যাত অধ্যাপক রূপে নানা শাস্ত্রের অধ্যাপনাও করিয়াছেন।

> সোঽহংপুরা সমধিগত্য পিতুঃ প্রসাদং
> ব্রহ্মৈকতাং গতবতঃ শিবরাজধান্যাং।
> যত্নাদধীত মনষীত মখাপি শাস্ত্রম্
> অধ্যাপয়ামি নিভৃতং নিপুণং বিচার্য্য॥[২৫]

চিরঞ্জীব তাঁহার বৃত্তরত্নাকরে বলিয়াছেন গৌড়শ্রী যশোবন্ত সিংহ হইলেন গোবর্ধনভূপনন্দন, কৃপারামৈকবংশধ্বজ[২৬]। কাম্যবিলাসে তিনি জয়সিংহ-ক্ষিতি-পতির কথা বলিয়াছেন। খুব সম্ভব কাশীতে জয়সিংহের স্থাপিত সংস্কৃত বিদ্যালয়ের সঙ্গে চিরঞ্জীব যুক্ত ছিলেন।[২৭]

কাজেই এই জয়সিংহ ঢাকার জয়সিংহ হইতে পারেন না। যশোবন্তের পিতা কৃপারাম লিখিত রামপ্রকাশ গ্রন্থ মধ্যে কিছু পরিচয় মেলে। ইহার দুইখানি পুঁথি লণ্ডন ইণ্ডিয়া আফিসে ছিল, একখানি নবদ্বীপে এডোয়ার্ড লাইব্রেরীতে আছে। ১৬৪৭ সালে পুঁথিখানি লিখিত। পুঁথির পাশে নানা স্থানে আছে অনুনীত শ্রীশতাবধান ভট্টাচার্য। পুঁথিখানি নাগরাক্ষরে লেখা তবে এক জায়গায় বঙ্গাক্ষরে আছে শ্রীআনন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্যস্য পুস্তকমিদং শাং গুপ্তপাড়া ভির ভাঙ্গা। "গ্রন্থ সমাপ্তঃ ইতুরখী নাম নগরে"। গ্রন্থে আরও

আছে অগস্ত্যোদয় প্রকরণে অর্গলা নগরের মতই রুপারামের রাজধানী লাহাইর মধ্যে প্রায় সমকালীন উদয়। অর্গলা তো আগরা। লাহার ও ইন্দুরখী এখন গোয়ালিয়র রাজ্যে।

দীনেশ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন "গৌড়" শব্দ দ্বারা বুঝিতে হইবে গোংড। কিন্তু রাজপুতানার ইতিহাস দেখিলে জানা যায় রাজপুতানার নানা স্থানে গৌড় রাজপুতগণের বাস ছিল। হয়তো তাঁহারা গৌড়দেশ হইতে আগত। তবে গোংড গোড়ও বহু ছিলেন। মাংদলা প্রভৃতি স্থানের রাজারা গোংড রাজাই ছিলেন।

রাজপুতানার ইতিহাসলেখক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর ওঝাজী বলেন গৌড়দেশ হইতেই গৌড়ব্রাহ্মণ, গৌড়রাজপুত, গৌড়কায়স্থ প্রভৃতি নাম[২৮]। তাঁহার মতে গৌড় রাজপুতেরা অযোধ্যার। কারণ পশ্চিমবঙ্গ হইতে অযোধ্যা পর্যন্ত সবই গৌড়দেশ। তবে কেন যে তাঁহারা বাংলার নহেন তাহা তিনি বলেন নাই।

রাজপুতানাতে গৌড় রাজপুতেরা অতি প্রাচীন কালে আগত। যোধপুরে গোড়বাড়ে গৌড় রাজপুতদেরই প্রাধান্য ছিল। আজমেরে গৌড় অধিকার বহু বিস্তৃত ছিল, এখন মাত্র রাজগড় গৌড়দের অধিকারে আছে। গৌড় রাজপুত বৎস রাজ ও বামন চৌহান পৃথ্বীরাজের সময় রাজপুতানায় আসেন। এক সময় জুনিয়া, সারর, দেরলিয়া, শ্রীনগর এই সবই ছিল গৌড়দের অধিকৃত। এখন মাত্র শ্রীনগর গৌড়দের অধিকারে আছে। জাহাঙ্গীরের সময় রাজা গোপালদাস গৌড় আমেরের দুর্গপতি ছিলেন। গোপালদাসের পুত্র বিক্রমও বড় যোদ্ধা ছিলেন। পিতা পুত্র উভয়ে ইঁহারা বাদশাহের জন্য বহু লড়িয়াছেন। দ্বিতীয় পুত্র বিঠলদাসকে সাহজাহান দশহাজারের মনসবদারী দেন। তারপর এই বংশে বহু গৌড় যোদ্ধা বাদশাহী দরবারে সম্মান পাইয়াছেন। যোধপুরের মারোঠের নিকটবর্তী প্রদেশের নাম গৌড়াটী বা গৌড়বাটী। রাজপুতানার বাহিরে আগরা অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানেও গৌড়দের ভূস্বামিত্ব আছে। কৃপারাম যশোবন্ত প্রভৃতি ঐ গৌড় নৃপতি বংশ হওয়াই সম্ভব।

চিরঞ্জীবের পিতা রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য (শতাবধান), চিরঞ্জীবের গুরু বিদ্যাসাগর এবং স্বয়ং চিরঞ্জীব ইঁহারা সবাই দীর্ঘকাল কাশীতে অধ্যাপনা কার্যে ব্রতী ছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ জীবগোস্বামী কাশীতে মধুসূদনের কাছে অধ্যয়ন করেন। এগার সিন্ধুর বাসী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ রূপনারায়ণও কাশীতে বাঙ্গালী গুরুর ছাত্র। কাজেই কাশীতে বাঙ্গালী গুরুদের অধ্যাপনা বহুদিনকার।

পুরাতন কথাই আলোচনা করিতেছি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে এই যুগের বাঙ্গালীদের কিছু কথাও আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। পুরাতন সময় হইতে আজ পর্যন্ত কাশীতে বাঙ্গালী পণ্ডিতদের বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা চলিয়া আসিয়াছে। বিশেষতঃ নব্যন্যায়ে বাঙ্গালী পণ্ডিতদের আসনের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। গৌরীকান্ত শিরোমণি, চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন, দেবনারায়ণ বাচস্পতি, কৈলাস শিরোমণি, জয়নারায়ণ তর্করত্ন, কালীপ্রসাদ শিরোমণি, রাখালদাস, বামাচরণ, অন্নদাচরণ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বাঙ্গালীর আসন অটল রাখিয়াছেন। চন্দ্রনারায়ণ আসেন পূর্ববঙ্গ হইতে। ইঁহার সময় হইতে চারিপুরুষ পর্যন্ত ইঁহারই ঘরের লোক কাশীতে ন্যায় শাস্ত্রের অগ্রণী ছিলেন। বামাচরণ আমার সতীর্থ, তাঁহার কাছে আমাদের বহু আশা ছিল। এত বড় প্রতিভা যে এমন করিয়া আমরা হারাইব তাহা কখনও মনে হয় নাই।

আজও কাশীতে বহু বাঙ্গালী পণ্ডিত বাংলার নাম রক্ষা করিতেছেন।

প্রায় সওয়া শত বৎসর পূর্বে কাশীতে হঠীবিদ্যালঙ্কার নামে এক বিদুষী মহিলা ন্যায় শাস্ত্রের যথারীতি অধ্যাপনা করিতেন। পণ্ডিত সমাজে তাহার বিলক্ষণ সম্মান ছিল।

১৩৩২ সালের চৈত্রের প্রবাসীতে পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য "কাশীর কতিপয় বাঙ্গালী পণ্ডিত" নামে এক মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ১৭৯১ সালে যখন ইংরাজেরা কাশীতে প্রথম কলেজ করেন তখন তাহার অধ্যক্ষ ছিলেন কাশীনাথ ভট্টাচার্য। ইনি সার উইলিয়ম জোন্সের জন্য শব্দসন্দর্ভসিন্ধু রচনা করেন। বিদ্যালয় তাঁহার হাতে ভাল চলে নাই। অধ্যক্ষ ছাড়া যে সব অধ্যাপক নিযুক্ত হন তাঁহাদের মধ্যে রামপ্রসাদ তর্কালঙ্কারের নাম পাই। ১৮১৩ সালে তাঁহার ১০৩ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তখন তাঁহাকে পেন্সন দেওয়া হয়। তখন পর্যন্ত তিনি নিষ্ঠার সহিত কাজ করিতেন। তাঁহার পরেই নিযুক্ত হন বিক্রমপুর ধামুকা গ্রামের কৃষ্ণাত্রেয় বংশীয় পণ্ডিত চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন। ১৮২৫ সালে কাপ্তেন থরেসবি লেখেন যে ইঁহার তুল্য নৈয়ায়িক ভারতে আর নাই। ১৮৩৩ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে প্রথমে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি ও পরে কনিষ্ঠ পুত্র রাধাকান্ত শিরোমণি ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে ১৮৪৭ সালে চন্দ্রনারায়ণের জামাতা কালীপ্রসাদ শিরোমণি অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৮০ সালে তাঁহার মৃত্যুর পর মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি ন্যায়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। চন্দ্রনারায়ণকে লোকে তখন বলিত কাশীর বিশ্বেশ্বর

এবং রামকিশোর তর্কালঙ্কার ছিলেন কেদার। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের পরেই কেদারেশ্বরের স্থান। রামকিশোর ছিলেন পূর্ববঙ্গের মেহারের সর্ববিদ্যাবংশীয়। তিনি একজন সাধকও ছিলেন। তাঁহার কলাপপঞ্জীর টীকা পূর্ববঙ্গে প্রচলিত। তাঁহার মুদ্রাপ্রকাশ ও দীক্ষাতত্ত্বপ্রকাশ কাশীতে ছাপা হয়। ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় তাঁহার মৌলিকগ্রন্থ শব্দবোধপ্রকাশিকা বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। চন্দ্রনারায়ণের সময় বাঙ্গালী ছাত্রেরা ন্যায় পড়িবার জন্য নবদ্বীপ না গিয়া আসিতেন কাশীতে। তাঁহাদের মধ্যে কালীশঙ্কর সিদ্ধান্তবাগীশের নাম সবাই জানেন বিখ্যাত কালীশঙ্করী পত্রিকার জন্য। চন্দ্রনারায়ণ রচিত ন্যায়ের টীকা ও টিপ্পনী, কুসুমাঞ্জলির টীকা ও ন্যায়সূত্রবৃত্তির কথা উল্লেখ করা উচিত। ন্যায়ের টীকা চান্দ্রী পাতড়া নামে বঙ্গীয় নৈয়ায়িক মহলে প্রখ্যাত। কালীশঙ্করের পৌত্র স্বর্গীয় রজনী তর্করত্ন তাঁহার সারমঞ্জরী টীকায় এই সব বিষয়ে অনেক সংবাদ দিয়াছেন। চন্দ্রনারায়ণের ছাত্র রামশঙ্কর তর্কপঞ্চানন কাশীতেই টোল করেন। ১৮৬৭ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন। নেপালের মহারাজ কুমার ছিলেন তাঁহার শিষ্য। রামশঙ্করের ভ্রাতুষ্পুত্র নৈয়ায়িক আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন কাশীর বিশিষ্ট অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৮৭ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।[২৯]

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রদেশান্তর হইতে আগত কাশীবাসীদের অনেকে ওয়ারেন হেষ্টিংসকে দুইখানি সংস্কৃত অভিনন্দন পত্র পাঠাইয়া দেন তাহাতে ওয়ারেন হেষ্টিংস যে গঙ্গাপুত্র পাণ্ডাদের অত্যাচার নিবারণ করিয়াছেন এবং তীর্থযাত্রীদের নানা দুঃখ দূর করিয়াছেন তাহার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন আছে। হেষ্টিংসের ব্যবস্থায় নবাব আলী ইব্রাহিম খাঁ যে কাশীর সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করেন, আলাপ ব্যবহারে সকলকে যে তৃপ্ত করেন, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে তোরণে নৌবতখানার যে ব্যবস্থা করেন, তাহারও উল্লেখ আছে। এই অভিনন্দন পত্রের একখানিতে ১৭৮ জন বোম্বাই প্রদেশের, মহারাষ্ট্রীয় ও গুজরাতি পণ্ডিতের নাম লেখা। অভিনন্দন পত্রখানা দেবনাগরী অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। আর একখানি অভিনন্দন পত্র সংস্কৃত ভাষায় বঙ্গীয় অক্ষরে রচিত তাহাতে ১১২ জন বাঙ্গালী ও মৈথিলী পণ্ডিতের নাম আছে। মিথিলাতেও বাঙ্গালা অক্ষরই চলে। কাজেই মৈথিল পণ্ডিতগণ বাঙ্গালীদের সঙ্গেই অভিনন্দন পত্র দিয়াছেন। অভিনন্দন পত্রের ভাষা সংস্কৃতই।

বঙ্গাক্ষরে লিখিত অভিনন্দনে প্রাপ্ত নামগুলি এই, কৃপারাম তর্কসিদ্ধান্ত, গোবিন্দরাম ন্যায়াচার্য, রামরাম সিদ্ধান্ত, কাশীরাম চট্টোপাধ্যায়, প্রাণকৃষ্ণ শর্মা,

শ্যাম বিদ্যাবাগীশ, কৃষ্ণমঙ্গল শর্মা, কৃষ্ণচন্দ্র সার্বভৌম, যুগলকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামলোচন মুখো, দুলাল ন্যায়ালঙ্কার, বলরাম বাচস্পতি, সদানন্দ তর্কবাগীশ, শিবনাথ তর্কভূষণ, আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য, রামচরণ বিদ্যাবাগীশ, কাশীনাথ মৈথিল, গঙ্গারাম ব্যাস, রামপ্রসাদ বন্দ্যো, রামসুন্দর রায়, বগলেশ্বর পহান, কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, গঙ্গাধর বিদ্যাবাগীশ, কৃষ্ণানন্দ বিদ্যালঙ্কার, রামচরণ চক্রবর্তী, হরিদেব তর্কভূষণ, রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বকসী, বলরাম ভট্টাচার্য, রুদ্ররাম সরকার, ভবানীচরণ সরকার, রামশঙ্কর বন্দ্যো, শিবপ্রসাদ বাচস্পতি, কালীপ্রসাদ সিদ্ধান্ত, শিবনারায়ণ বন্দ্যো, দর্পনারায়ণ ভট্টাচার্য, গোকুলকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, রামকান্ত বিদ্যালঙ্কার, রামনাথ শর্মা, রামজীবন গঙ্গোপাধ্যায়, কালীপ্রসাদ শর্মা, জগন্মোহন মুখো, শোভানাথ শর্মা, রামদাস শর্মা, কৃষ্ণদাস সার্বভৌম, জয়কৃষ্ণ শর্মা, জয়শঙ্কর শর্মা, প্রেমানন্দ গঙ্গো, জ্ঞানানন্দ শর্মা, শম্ভুনাথ বন্দ্যো, জয়নারায়ণ ঘোষাল, ভবানীশঙ্কর ঘোষাল, গঙ্গাহরি বন্দ্যো, রাম-সন্তোষ চট্টো, বিশ্বনাথ চট্টো, রামরাম সিদ্ধান্ত, জগন্নাথ রায়, মাণিকচন্দ্র শর্মা, গঙ্গাধর বিদ্যাবাগীশ, রামমোহন ভট্টাচার্য, রামচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার, জয়দেব শর্মা, জগন্নাথ শর্মা, কাশীনাথ শর্মা, দেবনারায়ণ শর্মা, গোপালশঙ্কর পাহান, লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়বাগীশ, কৃষ্ণদেব চট্টো, যুগলমোহন শর্মা, বিশ্বনাথ ঘোষ, রঘুনাথ পালিত, কালীপ্রসাদ সরকার, বিহারীচরণ শীল, সংত সিংহ, রামনারায়ণ শীল, রামসুন্দর সাঁই, রামমোহন পালিত, প্রাণকৃষ্ণ পালিত, কৃষ্ণমোহন দাস, রামশঙ্কর বোস, রামহরি দাস, রামনিধি দাস, হরিচরণ মল্লিক, ব্রজকিশোর ঘোষ, কালীপ্রসাদ শর্মা, কালীশঙ্কর শর্মা, কালীপ্রসাদ শর্মা, কেবলরাম শর্মা, কেবলরাম ভট্টাচার্য, প্রাণনাথ ঠাকুর, রামচন্দ্র বন্দ্যো, নীলমণি ঠাকুর, চৈতন্যচরণ ঠাকুর, হরিকৃষ্ণ বেদ, বিষ্ণুশঙ্কর বিঝাট, মন্নু বিঝাট, রামনাথ বিঝাট, বিশ্বনাথ মিত্র, বৈদ্যনাথ নারায়ণ মিশ্র, অবসান মিশ্র, কালিদাস সিদ্ধান্ত। নামগুলির মধ্যে জয়নারায়ণ ঘোষালের নাম চাপা পড়িয়া আছে। তিনি তখন কাশীতে বাঙ্গালীদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। মৈথিল নামও কয়েকটি দেখিতেছি। কারণ তখনও তাঁহাদিগকে বাঙ্গালীদের সঙ্গেই ধরিত। তাঁহাদের খাওয়া দাওয়া ও অক্ষরাদি সবই বাঙ্গালীর সঙ্গে মেলে।

এই নামের দ্বারা কাশীবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যা যেন কেহ অনুমান না করেন। ইহারা জনকয়েক মুখ্য মুখ্য কাশীবাসী। কারণ ১৮২৮-২৯ সালে দেখা যায় প্রিনসেপের মতে কাশীতে অন্যূন ১১৩১১ জন মহারাষ্ট্রীয়, ৩০০০ বাঙ্গালী এবং

১২৩১ জন নাগর-কাশীবাসী ছিলেন। তাহা ছাড়া অসংখ্য তীর্থযাত্রী সর্বদাই আসা যাওয়া করিতেন এবং যোগাদি উপলক্ষে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যাইত। এই সব তীর্থাদির জন্য হাজারখানেক গঙ্গাপুত্র পাণ্ডা ছিল। তাহাদের অত্যাচারে হেষ্টিংসের পুর্বে যাত্রী সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল। হেষ্টিংস তাহার প্রতিকার করেন। আর একবার এই সব পাণ্ডার ও গুণ্ডার অত্যাচার হইলে নড়াইলের রতনবাবু বহু বাঙ্গালা লাঠিয়াল লইয়া সাময়িক একটা প্রতিকার করিয়াছিলেন। তবু আমাদের বাল্যকালে পাণ্ডাদের অতিশয় অত্যাচার দেখিয়াছি। এখনও হয়তো তাহা নিঃশেষে দূরীভূত হয় নাই, তবে তাহা এখন ততটা প্রকাশ্যভাবে চলে না।

এই অভিনন্দন পত্র দুইখানির বিষয়ে শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সেন একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।[৩০]

কাশীতে বহু বাঙ্গালীর দেবালয় প্রতিষ্ঠিত। বহু বাঙ্গালী এখানে আসিয়া দানে ধ্যানে পণ্ডিত সমাজকে সহায়তা করেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত অন্নসত্রে অনেক শিক্ষার্থীর আশ্রয়। বৃন্দাবনের যাহা আয় তাহার বার আনাই বোধ হয় বাঙ্গালীর দান।

কাশী এক সময় পণ্ডিতহীন হওয়ায় নিস্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। তখন দক্ষিণের অহল্যাবাঈ ও বাংলার রাণী ভবানী এই দুই পুণ্যবতী মহিলা কাশীকে পুনঃ সঞ্জীবিত করেন। রাণী ভবানী প্রতিদিন একখানি করিয়া বাড়ী দান করিয়া ৩৬০ জন অধ্যাপককে কাশীতে প্রতিষ্ঠিত করেন ও তাঁহাদের ছাত্রদের খাইবার ও থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। কাশীর বহু ব্রহ্মপুরী রাণী ভবানী ও অহল্যাবাঈর কীর্তি।

কাশীর কুইন্স কলেজ স্থাপিত হয় ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে। তাহার পরেই কাশীর প্রখ্যাত বিদ্যায়তন জয়নারায়ণ কলেজ। ইহার গাত্রসংলগ্ন শিলালেখ দেখিলে বুঝা যায় ১৮১৮ সালে ভূকৈলাসের বিখ্যাত মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল এই বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। অন্য কোনো যোগ্য চালক না পাওয়ায় মিশনারীদের হাতে এই বিদ্যালয়ের ভার দিতে হয়। তবে ইহার সংস্কৃত কলেজ বিভাগ অল্পকাল পূর্বেও স্বর্গীয় পণ্ডিত হরিভট্ট শাস্ত্রী মাণেকারের চালনায় বহুকাল যাবৎ খুব সুনাম অর্জন করিয়াছিল। জয়নারায়ণ ছিলেন গুরুভক্ত। দুর্গাবাড়ীর পথে বিখ্যাত মহাজন লালা কাশ্মীর মলের ভূ-সম্পত্তি খরিদ করিয়া তিনি তাঁহার গুরুধাম স্থাপন করেন। জয়নারায়ণের পুত্র কালীশঙ্কর ঘোষাল মহাশয়ও কাশীর

একজন গণ্যমান্য শিক্ষানুরাগী মহাপুরুষ ছিলেন। ১৮২২ সালে গবর্ণমেণ্টের তালিকায় কাশীর গণ্য লোকদের মধ্যে কালীশঙ্কর উল্লিখিত।

কাশীর চৌখাম্বার মিত্র পরিবার চিরদিনই কাশীর বাঙ্গালীদের গৌরবস্বরূপ ছিলেন। বহু বৈভব সহ কলিকাতার জমিদার আনন্দ মিত্র মহাশয় বৃদ্ধকালে কাশীতে বাস করিতে আসেন। তাঁহার পুত্র রাজেন্দ্র মিত্র মহাশয় চৌখাম্বা পরিবারের গণ্য পুরুষরূপে ঐ ১৮২২ সালের তালিকায় উল্লিখিত। এই চৌখাম্বার স্বর্গীয় প্রমদা দাস মিত্র মহাশয় বহু সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনায় আপনার অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। চৌখাম্বা সংস্কৃত গ্রন্থাবলী কাশীর একটি গৌরবের ধন। এই বাড়ীর দুর্গাপূজা ও কালীপূজার সময়কার মিছিল কাশীতে উল্লেখযোগ্য বস্তু ছিল। এখন তাহা আছে কি না জানি না। এই বংশেরই মোক্ষদা দাস মিত্র ও দৌহিত্র উপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি এক সময়ে কাশীতে সম্মানিত পুরুষ ছিলেন।

পীতাম্বর মিত্র ছিলেন ভাগলপুরের দেওয়ান। সার ফ্রেডরিক তাঁহাকে আনিয়া কাশীতে সেরেস্তাদার করেন। যে বৎসর (১৮১৮) মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল তাঁহার কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন সেই বৎসর পর্যন্ত তিনি আপন কাজে বাহাল ছিলেন।

গণেশ মহাল্লায় নড়াইলের সাত মহলা বাড়ী খুব বিখ্যাত। নড়াইলের কালীশঙ্কর রায় ছিলেন নাটোরের রাণী ভবানীর পুত্র মহারাজা রামকৃষ্ণের সদর মোক্তার। অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কাশীতে ঐ সাতমহলা বাড়ী তৈয়ার করাইয়া বাস করেন। কাশীতে তখন গুণ্ডার বড় উপদ্রব। কালীশঙ্করের পৌত্র রামরতন রায় বা রতনবাবু গুণ্ডাদের দমন করিয়া দেন।

নাটোরের রাণীভবানী তো কাশীকে একরকম পুনর্জীবন দিয়াছেন। তাঁহার গোপাল বাড়ী, তাঁহার ছত্র কাশীতে এক সময় বিখ্যাত ছিল। পুঠিয়ার ছত্রও কাশীতে বিখ্যাত। মুক্তাগাছার মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্যের পিতামহী বিমলা দেব্যার বাড়ী দেবনাথপুরাতে, রাজা রাজবল্লভের বাড়ী, পুষ্পদন্তেশ্বরে জপসার রামানন্দ সরকারের বাড়ী পাতালেশ্বরে এক সময় প্রখ্যাত ছিল। ময়মনসিংহ আমবারিয়ার ছত্র, কাকিনার ছত্রও খ্যাত ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে কাকিনার ছত্রের সব শেষ হইয়া গিয়াছে। দীঘাপতিয়ার রাজারা মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ঢোং-ঢুপন্থের বাড়ী খরিদ করিয়া গঙ্গাতীরে একটি কীর্তি রাখিয়াছেন। তাহারই কাছে চৌষট্টিঘাটে এককালে বিখ্যাত রসিকলাল দত্ত বাস করিয়া গিয়াছেন। তিনি

কলিকাতার ধনী মদন দত্তের পুত্র। তাঁহার নামও সরকারী তালিকায় আমরা পাই। সরকারী তালিকায় কালীশঙ্কর ঘোষালের নামের পরেই দেখা যায় মদনমোহন মুখোপাধ্যায়ের নাম। তিনি মণিকর্ণিকার কাছে বাস করিতেন। মদনপুরায় বাস করিতেন দেওয়ান বলরাম সরকার। জায়গীরদার জগচ্চন্দ্র পণ্ডিত দেবনাথপুরায় থাকিতেন, কাশীর দক্ষিণে কণোয়ার নিকট তাঁহার একটি সরকারী জায়গীর ছিল। নদিয়ার রাজাদের ছত্রের নামেই কাশীর নদিয়ার ছত্র। এখন নাম আছে কিন্তু বস্তু নাই। ভুবনেশ্বরী ছত্র, রাজরাজেশ্বরী ছত্রও কাশীতে বাঙ্গালীরই কীর্তি।

বাঙ্গালী হিন্দুরা তো কাশীতে বাস করিবেনই কিন্তু বাঙ্গালী দুই একটি প্রখ্যাত মুসলমান পরিবারও কাশীতে আসিয়া বাস করেন। ছোট লাইনের বেনারস সিটি ষ্টেশনের নিকটে আদমপুরা মহল্লায় নবাব কাশীম আলি খাঁর পুত্রগণ দুর্ভাগ্যের দিনে আসিয়া বাস করেন। সৈয়দ আবদুল্লা, গোলাম আলি খাঁ, গোলাম হোসেন খাঁ, আবদুল আলী এই চারি ভাই আদমপুরায় আসিয়া নির্বাসিত জীবন অতি কষ্টে কোম্পানী দত্ত তেরহাজার টাকা মাসিক বৃত্তিতে নির্বাহ করিতেন। মীরকাশিমের জামাতা ছিলেন নাসির মহম্মদ খাঁ। কাশীর রেসিডেণ্ট জোনাথান ডানকান তাঁহাকে দেওয়ানী আদালতের জজের পদ দেওয়াইয়া কাশীতে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বাস করিতেন মূলাই টোলায়। অযোধ্যার নবাবেরা তাঁহাকে লক্ষ্ণৌর বিচারপতির পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে মতের ঐক্য না হওয়ায় নাসির মহম্মদ কাশীতেই চলিয়া আসেন।

মীরকাশীমের মন্ত্রী আলী ইব্রাহিম খাঁকে ওয়ারেন হেষ্টিংস পাঁচশত টাকা বেতনে কাশীর বিচারপতি করেন। তাঁহারও চারি পুত্র ছিল। কিন্তু তাঁহারা তেমন যোগ্যতা বা খ্যাতি প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। ইব্রাহিম খাঁ চেৎসিংহের নির্বাসনের পর বার বৎসর কাশীর আদালতে বিচারপতি ছিলেন।

ভূকৈলাসের মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল কাশীপরিক্রমা নামে কাশীর সুন্দর একখানি বিবরণ গ্রন্থ রচনা করেন। বৃন্দাবনের এইরূপ বর্ণনা নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকরে মেলে। কাশীতে চিন্তামণি বাপুলী, মহেশ বাবু প্রভৃতি সঙ্গীত কলাবতেরা বাংলার মুখরক্ষা করিয়াছেন।

কাশীতে যে নূতন যুগের হিন্দী লেখকগণের উদয় তাহার মূলেও একটু বাংলার হাত আছে। কবি হরিশ্চন্দ্র ও রাজা শিবপ্রসাদ উভয়েই মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠ গোষ্ঠীয়। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শেঠ পরিবার ব্যবসা সূত্রে মুর্শিদাবাদে আসিয়া বাস করেন। ইহারা শ্বেতাম্বর জৈন। হীরানন্দের সাত পুত্র। তার মধ্যে মাণিক চাঁদ

গিয়া ঢাকায় বাস করেন। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানী ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদ উঠিয়া আসে। তখন মাণিক চাঁদের পরিবারও মুর্শিদাবাদ আসেন। ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে নবাব ইঁহাদিগকে জগৎশেঠ উপাধি দেন।[৩১]

নবাবের সহিত মতভেদ হওয়ায় শেঠ ভালচাঁদ কাশীতে আসেন। তাঁহার পৌত্রই রাজা শিবপ্রসাদ। শিবপ্রসাদের পিতামহী ছিলেন বিবি রতনকুমারী যিনি ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে "প্রেমরত্ন" গ্রন্থ লেখেন। এই পরিবারে পূর্বে বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট আদর ছিল এবং সকলে বাংলা জানিতেন। কারণ বহু পুরুষ বাংলাতে বাস করায় তাঁহাদের পূর্বপুরুষ বাঙ্গালী বনিয়া গিয়াছিলেন।

এই কবি হরিশ্চন্দ্র হিন্দী সাহিত্যের আদি প্রাণ-শক্তি সঞ্চার করেন। বড়ই অকালে তাঁহার মৃত্যু। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজা রাজেন্দ্র লাল ও বহু বাঙ্গালী মনীষীর বন্ধু ছিলেন। তিনি নিজেও বাংলা সাহিত্যের রসিক ছিলেন। বাংলাতে তিনি যে কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারি বিয়োগী হরি লিখিত ব্রজমাধুরী সারের ৬৪৯ পৃষ্ঠায়। তাঁহার প্রধান বন্ধু ও সাহিত্য সহচর রাধাচরণ গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের একজন মুখ্য পুরুষ ছিলেন। বাংলা হিন্দী উভয় ভাষাতেই তাঁহার ছিল সমান অধিকার। অল্প বয়সে তিনি মারা যান। তার মধ্যেই তিনি এত গ্রন্থ লেখেন যে রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র আদর করিয়া তাঁহাকে বলিতেন "রাইটিং মেসিন"।

নির্বাসিত ভরতপুরের মহারাজা ও আমার পূজ্যপাদ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী ও কবি হরিশ্চন্দ্র এই তিন বন্ধু একত্র হইয়া দেশীয় সংস্কৃতির জন্য দিবারাত্রি সাধনা করিয়া গিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদীর নামেরও একটি ইতিহাস আছে। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে যেদিন তাঁর জন্ম, সেই দিনই তারামোহন মিত্র সম্পাদিত কাশীরই হিন্দী কাগজ "সুধাকর" তাঁহাদের বাড়ী প্রথম আসে।[৩২]

তখন তাঁহার পিতৃব্যকে বাড়ীর একজন বলিলেন, "সুধাকর আসিয়াছে।' ঠিক তখনই সুধাকরেরও জন্ম হইয়াছে। তাই তাঁহার পিতা বলিলেন, "ভালই. এই তো আমার সুধাকর আসিয়াছে।"

পঞ্চনদ

পাঞ্জাবের পার্বত্য প্রদেশে অর্থাৎ সুকেত, মাণ্ডী, কুল্লু, কাঙড়া, কেউন্থাল, নাহান প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালী উপনিবেশের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। সেই

সময় কাশ্মীর পর্যন্ত বাংলা পণ্ডিতদের যাতায়াত ছিল। বিক্রমপুরের পয়সা গ্রামবাসী পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ, একবার বাংলার পণ্ডিত সমাজের সঙ্গে কাশ্মীর আসেন এবং সর্বস্থানের পণ্ডিতদলের সঙ্গে তর্কে দিগ্বিজয়ী হন।

গুরু নানক বাংলা দেশ দিয়া কামরূপ ও পুরী গিয়াছেন। তারপর যখন গুরু তেগ বাহাদুর বাংলাতে আসেন তখন পাটনা ও মালদহে তিনি গুরুদ্বার পান নাই, কোনো শিখ ভক্তের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। কিন্তু ঢাকা আসিয়া শিখদের মন্দির ও ধর্মশালা দেখিতে পান। সেখানেই তিনি আতিথ্য লাভ করেন। ঢাকায় শিখদের মণ্ডলী দেখিয়া গুরু বলিলেন, "ঢাকাতে দেখি শিখদের ধর্ম ভাণ্ডার জমিয়া উঠিয়াছে।" সুথরাসহ হইলেন গুরু হরগোবিন্দের শিষ্য। তাঁহার দল সুথরাসাহী। ঢাকাতে বহু সুথরাসাহী আছেন।

ঢাকার মসলিন জগদ্বিখ্যাত। ঢাকার মসন্দী অর্থাৎ শিখ কর্মকর্তা বুলাকী-দাসের মাতা গুরুকে একথান মসলিন দিলেন।

গুরু গোবিন্দের জন্ম পাটনায়। যখন তিনি বড় হইয়া দেশে যাইতে প্রস্তুত হইলেন তখন তাঁহার পালকীর সোণার কাজ আসিল ঢাকা হইতে। পাঞ্জাবে ঢাকার সোণারূপার সূক্ষ্ম কাজের জন্য নাম তখনকার দিনেও ছিল। ভক্তদের গ্রন্থ হইতে তাহার পরিচয় পাই। তন্ত্র ও যাদুটোলার জন্যও বাংলার নাম ছিল। বাংলার সংস্কৃতির খবর জানিতেন বলিয়া গুরু গোবিন্দ ও তেগ বাহাদুর বাংলা দেশটিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া গিয়াছেন।

গুরুর আসনে বসিয়া গুরু গোবিন্দ দেখিলেন সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা পাপ ঢুকিয়াছে। ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সারা ভারতের শিখ প্রতিনিধিদের ডাকাইলেন। ঢাকা হইতে বুলাকীর পুত্র ছায়া ও মায়া এই দুইজন গেলেন। সঙ্গে আরও অনেক শিখ ভক্ত আছেন। তাঁহারা গুরুকে মসলিন দিলেন। সকলেই চমৎকৃত, এমন জিনিষ তো তাঁহারা আর দেখেন নাই। ভক্তেরা তো প্রতি-বৎসরই পাঠান কিন্তু লোভী "মসন্দী" রাই সব কবলিত করেন। ইহাতে মসন্দী ছায়া ও মায়া লজ্জিত হইলেন।

মসন্দীদের দুর্নীতির আর অন্ত নাই। অথচ তাহা বলা যায় কেমন করিয়া? গুরুর বিনোদের জন্য ঢাকার মিসিলের মত একটি মিসিল সাজান হইল। তাহাতে মসন্দীদের সব লীলা দেখান হইল। গুরু মুখে হাসিলেন বটে কিন্তু মনে মনে উদ্বিগ্ন হইলেন। ইহার পরেই গুরু মসন্দী প্রথা তুলিয়া দিলেন। খালসা প্রতিষ্ঠিত হইল। অর্থাৎ গুরুর ক্ষমতা সকল মণ্ডলীর মধ্যে ছড়াইয়া দিয়া

মণ্ডলীকেই সব দায়িত্ব দেওয়া হইল। এত বড় একটি ব্যাপারে বাংলা দেশেরও একটু হাত ছিল।

লাহোরে ও এলাহাবাদে এক সময় পাতসাহের আজ্ঞায় যে বহু বাঙ্গালী কারিগরকে বসবাস করান হইয়াছিল তাহা আইন আকবরীতে দেখা যায়।

প্রমাণ-পঞ্জী

২২ বৈতাল ভট্ট প্রকরণ—আর. এস. পিম্পুটকর, ১৯২৬
২৩ বৈতাল ভট্ট প্রকরণ—আর. এস. পিম্পুটকর
২৪ ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টার্লি, মার্চ, ১৯৪১
২৫ বিশ্বন্মোদ তরঙ্গিণী ১, ২১
২৬ বৃত্তরত্নাকর, শ্রীরামপুর, পৃ ৩
২৭ ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টার্লি ১৯৪১
২৮ রাজপুতানেকা ইতিহাস, পৃ ২৪০
২৯ প্রবাসী, ১৩৩২, চৈত্র
৩০ জর্নাল অব গঙ্গানাথ ঝা—রিসার্চ ইনস্টিটিউট, নভেম্বর ১৯৪৩
৩১ মুর্শিদাবাদ গেজেটিয়র
৩২ হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস, রামচন্দ্র শুক্লকৃত, পৃ ৫০৪

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত

পাহাড়পুরের আবিষ্কারে দেখা গেল বাংলার কৃষ্ণভক্তি অন্ততঃ দেড়হাজার বৎসরের পুরাতন। বাংলা দেশে তাহা একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। সেই প্রাকৃত বাংলার কৃষ্ণভক্তির কতকটা পাই প্রভু নিত্যানন্দের মধ্যে। জয়দেবের ও চণ্ডীদাসের মতামত মাধ্বমতবিরোধী। রাস পঞ্চাধ্যায় মাধ্ব মতে চলে না। অথচ এই সবই মহাপ্রভুর উপজীব্য।

মাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতির ভাবোচ্ছ্বাস প্রধান ধর্মের সহিত ভাগবতাদি শাস্ত্রও দেশে ছিল। মহাপ্রভু অপূর্ব মনীষাবলে বাংলার প্রাকৃত বৈষ্ণব ধর্মকে নানা মতের ভক্তিসিদ্ধান্তের সঙ্গে যুক্ত করিয়া আপন প্রতিভাদ্বারা একটি অভিনব সৃষ্টি করিলেন। রামানন্দ মত, অদ্বৈতাচার্য সাধনা, নিত্যানন্দ ভাব সব তিনি আপন মাহাত্ম্যের দ্বারা যোগযুক্ত করিলেন।

মহাপ্রভুর এই মতকে অনেকে মাধ্বমত মনে করেন। অন্ততঃ সম্প্রদায় ব্যবস্থার দিক দিয়া এই ভাবেই সকলে এমন কি মহাপ্রভুর মতানুবর্তীরাও গৌড়ীয় মতকে মাধ্ব মত মনে করেন, কিন্তু তাহাই কি ঠিক? নিম্বার্ক মতবাদ বাংলায় আছে, পূর্বেও ছিল।

মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের কিছু কিছু মত হয়তো মাধ্বদের মতের সঙ্গে মেলে তবু গোটা গৌড়ীয় মতকেই কি মাধ্বমত বলা চলে? মাধ্বদের মতে এক ভগবানই আরাধ্য, চৈতন্য মতে তিনি প্রকৃতি সহ যুগলরূপে আরাধনীয়। মাধ্ব মতে ব্রাহ্মণই সাধনার অধিকারী, চৈতন্য মতে সাধনার অধিকার সবারই। ইহাতে জাতি পঙক্তির ভেদ নাই। মাধ্ব মতে ভক্তির সঙ্গে আচরণাদি যুক্ত থাকা চাই, চৈতন্য মতে শুদ্ধাভক্তিই যথেষ্ট। তাঁহার অচিন্ত্যভেদাভেদ ও নিত্য বৃন্দাবনলীলা তাঁহার আপন জিনিষ। মহাপ্রভুর মতের আচার বিচার ও উপাসনা প্রণালী, মাধ্বমত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

মাধ্বমতের প্রভাব নাই তাহা বলি না কিন্তু নিম্বার্ক ও বিষ্ণুস্বামী মতের প্রভাবও তাঁহার মতামতের উপর কম নহে। তাঁহার অতি প্রিয় কৃষ্ণকর্ণামৃত যেই লীলাশুকের, কাহারও কাহারও মতে তিনি বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের। জীব গোস্বামীর গ্রন্থেও অনেক রামানুজীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

ভক্তিরত্নাকরে যদিও মহাপ্রভুর মতকে মাধ্ব বলা হইয়াছে, কিন্তু ভক্তি-রত্নাকরের নরহরি চক্রবর্তী হইলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য। তাঁহার রচিত বহু গ্রন্থ, তাঁহার নরোত্তমবিলাসে খেতুড়ীর উৎসবের যে বিবরণ তাহা ১৬২৬ খ্রীস্টাব্দের।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে মহাপ্রভুর দক্ষিণ দেশ যাত্রাটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে দেখিতে পাই মহাপ্রভু যাত্রা প্রসঙ্গে মধ্বাচার্যের স্থানে আসিয়া উড়ুপ কৃষ্ণ দান করিলেন। সেখানকার লোকেরা প্রথমে মহাপ্রভুকে আদর করেন নাই।

প্রথম দর্শনে প্রভুর না কৈল সম্ভাষণে॥
পাছে প্রেমাবেশ দেখি হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণব জ্ঞানেতে বহু করিল সৎকার॥

এখানে চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহাদের নিজগণ হইলে প্রথমেই অভ্যর্থিত হইতেন এবং পরে প্রেমাবেশ দেখিয়া মাত্র বৈষ্ণবভাবে অভ্যর্থিত হইতেন না।

তারপর সেখানকার তত্ত্ববাদী আচার্যের সঙ্গে তাঁহার সাধ্য সাধন সম্বন্ধে একটু তর্ক হইল। বর্ণাশ্রম, কর্ম, জ্ঞান, মুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহাদের মত মহাপ্রভুর মনঃপূত হইল না।

মহাপ্রভু স্পষ্টই বলিলেন,

কর্মত্যাগ কর্মনিন্দা সর্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম হইতে কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি কভু নহে॥
কর্মমুক্তি দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থান তুমি সাধ্য সাধন॥
এই ত বৈষ্ণবের নহে সাধ্য সাধন।
সন্ন্যাসী দেখিয়া আমা করহ বঞ্চন॥

ইহার কিছু পরে,

প্রভু কহে—কর্মী জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায় দেখি সেই দুই চিহ্ন॥
সবে একগুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়।
সত্য বিগ্রহ করি ঈশ্বরে করহ নিশ্চয়॥

এই মত তার ঘরে গর্ব চূর্ণ করি।
ফল্গুতীর্থে তবে চলি আইলা গৌরহরি ॥[১]

এইখানে মতে মতে পার্থক্য তো স্পষ্ট। তাহা ছাড়া মহাপ্রভু সেখানকার মতকে বলিলেন "স্থাপ তুমি?" তাঁহাদের সম্প্রদায়কে বারবার বলিলেন, "তোমার সম্প্রদায়।" কবিরাজ গোস্বামীও তাঁহাদের ভিন্ন মানিয়া লিখিলেন "তার ঘরে" (তাঁহাদের)। নিজ সম্প্রদায় হইলে "তুমি" "তোমার" ও "তাঁহাদের" বলিয়া বলা চলিত না।

ইহার অপেক্ষাও আর একটি স্থানে কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝানো হইয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেখি মহাপ্রভুকে দেখিয়া বাসুদেব সার্বভৌমের বিশেষ প্রীতি হইয়াছে,

প্রকৃতি বিনীত সন্ন্যাসী দেখিতে সুন্দর।
আমার বহুত প্রীতি বাড়ে ইহার উপর ॥

তারপর সার্বভৌম জানিতে চাহিলেন,

কোন সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস করেছেন গ্রহণ।
কিবা নাম ইহার শুনিতে হয় মন ॥

তখন উত্তর যাহা পাইলেন তাহা এই,

গোপীনাথ কহেন নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
গুরু ইহাঁর কেশব ভারতী মহাধন্য ॥

তখন

সার্বভৌম বলে ইহাঁর নাম সর্বোত্তম।
ভারতী সম্প্রদায় এই হয়েন মধ্যম ॥

ইহার উত্তরে

গোপীনাথ কহে ইহাঁর নাহি বাহ্যপেক্ষা।
অতএব বড় সম্প্রদায়েতে উপেক্ষা ॥

যদি বলিবার হইত তবে এইখানেই গোপীনাথ মাধ্ব সম্প্রদায়ের কথাও বলিয়া দিতে পারিতেন।

কেহ কেহ বলেন মহাপ্রভুর গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ছিলেন মাধ্ব সম্প্রদায়ের,

সেই সূত্রে মহাপ্রভুকেও মাধ্ব বলা চলে। কিন্তু মাধ্বদের তীর্থে গিয়া মহাপ্রভু স্বয়ং নিজের সেই পরিচয় দেন নাই। কবিরাজ গোস্বামীও তাহা বলেন নাই। এই মাধ্ব সম্প্রদায়ের কথা প্রথম উল্লেখ করিলেন বলদেব বিদ্যাভূষণ। বলদেবের সময়ে মহাপ্রভুর সম্প্রদায় বৈষ্ণব চারি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহে বলিয়া "পঙ্গতে" অর্থাৎ পঙক্তিতে অধিকার পাইত না। গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে অর্বাচীন বলিয়া পঙক্তিতে বসিবার অধিকার না দেওয়ায় বলদেব নাকি ইহার প্রতিকারের জন্য ইহাকে মাধ্ব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া ঘোষণা করেন। জয়পুরের মহারাজা দ্বিতীয় জয়সিংহের সময়ে এই বিষয়ে বিচার ও বিস্তর আলোচনা চলে। অবশেষে গৌড়ীয় মতের প্রতিপক্ষগণ গৌড়ীয় মতের স্থাপনা কোন্ ভাষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ইহা জিজ্ঞাসা করায় বলদেব এক মাসের মধ্যে গোবিন্দের কৃপায় নূতন ভাষ্য রচনা করেন। গোবিন্দের কৃপায় প্রাপ্ত বলিয়া সেই ভাষ্যের নাম হইল "গোবিন্দ ভাষ্য"। এই সব ঘটনা ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ মহাপ্রভুর বহু পরে।

প্রমেয়-রত্নাবলীতেও গোবিন্দ ভাষ্যের মুখবন্ধে বিদ্যাভূষণ বলদেব একটি মাধ্ব পীঢ়ীও দিয়াছেন। অর্থাৎ মধ্বাচার্য হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ঈশ্বরপুরী হইয়া মহাপ্রভু পর্যন্ত একটি গুরুপরম্পরা বা "পীঢ়ী" দিয়াছেন। কবিকর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়ও এই একই পীঢ়ী অনুসৃত। কিন্তু এই পীঢ়ী ইতিহাসের বিচারে মোটেই টিকে না। এই পীঢ়ী এইরূপ (১) নারায়ণ, (২) ব্রহ্মা, (৩) নারদ, (৪) ব্যাস, (৫) শুকদেব, এবং মধ্বাচার্য (৬) মধ্ব হইতে নরহরি, (৭) মাধব, (৮) অক্ষোভ্য, (৯) জয়তীর্থ, (১০) জ্ঞানসিন্ধু, (১১) মহানিধি, (১২) বিদ্যানিধি, (১৩) রাজেন্দ্র, (১৪) জয়ধর্ম, (১৫) বিষ্ণুপুরী ও পুরুষোত্তম, (১৬) পুরুষোত্তম হইতে ব্রহ্মণ্য, (১৭) ব্যাসতীর্থ, (১৮) লক্ষ্মীপতি, (১৯) মাধবেন্দ্রপুরী, (২০) ঈশ্বরপুরী, (২১) মহাপ্রভু।

কিন্তু মাধ্ব সম্প্রদায়ের পীঢ়ীর সঙ্গে এই পীঢ়ীর মোটেই মিল নাই। তার পর এই পীঢ়ীতে ১ম নম্বর পর্যন্ত বিষ্ণুপুরী ছাড়া আর কারও পুরী উপাধি নাই। শঙ্কর প্রবর্তিত দশনামীদের মধ্যে দেখা যায়—

তীর্থাশ্রম বনারণ্য গিরি পর্বত সাগরাঃ।
সরস্বতী ভারতী চ পুরীতি দশ কীর্তিতাঃ॥

বৃহচ্ছঙ্কর বিজয়ে বিদ্যারণ্য স্বামী

১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসের ইণ্ডিয়ান কালচারএ শ্রীযুত বি. এন. কৃষ্ণমূর্তি শর্মা একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন তাঁহার মত মাধ্ব মত হইতে উদ্ভূত হওয়া অসম্ভব। নানা দিক দিয়া ইহাতে যে অশেষবিধ অসঙ্গতি রহিয়াছে, তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। ডাঃ এস. কে. দে এবং শ্রীযুত অমরনাথ রায়ও এই বিষয়ে পূর্বেই লিখিয়াছেন।

কৃষ্ণমূর্তি শর্মা মহাশয় বলেন, রূপ গোস্বামীর লঘুভাগবতামৃতে মাধ্ব প্রভাব দেখা যায়। বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত বিষয়ে তিনি বহুবার মাধ্বমত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবু তাঁহাকে পুরাপুরি মাধ্বমতের বলা চলে না। শ্রীধর স্বামীর প্রতিও তাঁহার ভক্তি কম নহে। মাধ্ব ও শ্রীধর উভয়ের প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর তুল্য আস্থা ছিল। শ্রীজীব গোস্বামী মাধ্বকে সম্মান করিলেও শঙ্কর রামানুজকেও কম শ্রদ্ধা করেন নাই, যদিও শঙ্করের মায়াবাদ গৌড়ীয় গোস্বামিগণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

কাজেই দেখা যায় জীব গোস্বামীর সময় পর্যন্ত বঙ্গীয় বৈষ্ণবমত একেবারে মাধ্ব ভাবাপন্ন হইয়া যাইতে পারে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাধা দামোদর ও তাঁহার শিষ্য বলদেব এই মাধ্বভাবে ভরপুর হইয়া উঠেন। বলদেবের জন্মভূমি বালেশ্বর। তাঁহার উৎকলিকাবল্লরী খ্রীষ্টীয় ১৭৬৫ সালে লেখা। সন্ন্যাসী হইয়া তিনি বৃন্দাবনে জীবন যাপন করেন।

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী, শ্রীকেশব ভারতী, শ্রীঈশ্বর পুরী প্রভৃতির কাছে যে ধর্মের পরিচয় মহাপ্রভু পাইলেন তাহা ঠিক মাধ্ব তো নয়। আবার সেই ধর্মকেও তিনি অবধূত নিত্যানন্দ আচরিত বাংলার প্রাকৃত তান্ত্রিক গোছের বৈষ্ণব মতের সহিত যুক্ত করিয়া আপনার অন্তরের ভাবসম্পদ ও অপূর্ব ভক্তিরস দিয়া যে এক অভিনব বস্তু রচনা করিলেন তাহাকে মহাপ্রভুর ধর্ম ছাড়া আর কোনো নাম দেওয়া সম্ভব নহে। পুরাতন চরিতলেখকগণও তাহা করেন নাই।

চৈতন্য মত ভারতের অন্যান্য স্থানের বৈষ্ণব মতকে প্রভাবিত করে। হিত হরিবংশ প্রবর্তিত রাধাবল্লভী সম্প্রদায়, টাট্টী সম্প্রদায় প্রভৃতির উপর তাহার প্রভাব সর্বজনবিদিত।

বল্লভাচার্যের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হয়। বল্লভ শ্রীধরস্বামীর টীকাকে উপেক্ষা করায় মহাপ্রভু তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেন। গৌড়ীয় ভক্তদের দর্শনে বল্লভাচার্য আপনাকে ধন্য মনে করিলেন।[২]

শ্রীমন্মাধবেন্দ্র শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী প্রভৃতিও সেইরূপ শঙ্কর-সম্প্রদায়ী হইয়াও

ভাবভক্তির সাধনায় ভরপুর ছিলেন। মাধবেন্দ্রপুরীর কথায় বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—"মেঘদরশন মাত্র হয় অচেতন।"

জীব গোস্বামীর সর্বসংবাদিনী গ্রন্থে ও তত্ত্বসন্দর্ভে নানা বাদ ও মতের পরিচয় দিয়াছেন। রূপ গোস্বামী তাঁহার লঘুভাগবতামৃতে ও সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৈষ্ণবতোষিণী টীকায় মাধ্বভাষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু কোথাও মাধ্ব মত যে মহাপ্রভুর মত তাহা বলেন নাই।

গৌড়ীয় মতের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ আমরা পাই ভাগবত টীকাকার শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্তীর লেখায়।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

ভগবান কৃষ্ণই আরাধ্য, তাঁহার ধাম শ্রীবৃন্দাবন, ব্রজবধূদের গৃহীত উপাসনা পদ্ধতিই ভাল, ভাগবতই শাস্ত্র, প্রেমই সাধনার কাম্য অর্থ, এই হইল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত, আমাদেরও তাহাতেই পরম শ্রদ্ধা।

"পুরী" "ভারতী" প্রভৃতি উপাধির দ্বারা বুঝা যায় শ্রীমন্মাধবেন্দ্র আসলে শঙ্কর প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত। তবে তাঁহারা কেন সগুণ উপাসনা ভক্তিবাদ প্রচার করিলেন? ভক্তদের মধ্যে কোথাও কোথাও শঙ্করকে শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য বলিয়াই ধরা হয়। শঙ্করাচার্যের নামেও তো বহু সগুণ স্তোত্রাদি দেখা যায়। সেগুলি যথার্থ শঙ্করের হউক বা না হউক এই কথা ঠিক যে ক্রমে অদ্বৈতবাদের সঙ্গে সগুণ উপাসনা ভক্তিবাদ প্রভৃতি জড়াইয়া পড়িতেছিল। শঙ্করের প্রধান শিষ্য পদ্মপাদ ছিলেন নৃসিংহ উপাসক। ভাষ্যকার শ্রীধর স্বামীও তাহাই। তাঁহার গীতা ও ভাগবতের টীকায় অদ্বৈত মতের সঙ্গে ভক্তিতত্ত্বের মাখামাখি ভাব দেখা যায়। এই বিরোধটি জীব গোস্বামীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি তত্ত্বসন্দর্ভে বুঝাইয়াছেন যে শ্রীধর এই মিশ্রণের দ্বারা অদ্বৈতবাদীদের ভক্তিপথে আনিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু এই জন্যই বল্লভভট্ট শ্রীধরকে প্রামাণ্য বলিয়া মানিতে চাহেন নাই এবং তাই মহাপ্রভু তাঁহাকে লজ্জা দেন।

মাধ্ব সম্প্রদায়ের আচার্যের উপাধি তীর্থ। তাঁহারা অব্যক্ত লিঙ্গাচার নহেন, শিখাসূত্রাদি তাঁহারা বিসর্জন করেন না।

শঙ্কর সম্প্রদায়ীরা শিখাসূত্র রাখেন না। মাধবেন্দ্রপুরী শিখাসূত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

কাটোয়ায় মহাপ্রভুও শিখাসূত্র ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই জন্যই মহাপ্রভু বার বার নিজেকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় দিয়া নিজের ভাবদৈন্য দেখাইতে চাহিয়াছেন।

এই বিষয়ে যাঁহারা উৎসাহী তাঁহাদিগকে মাসিক বসুমতী, ১৩৪২, পৌষ সংখ্যায় ৪৫৩-৪৬৩ পৃষ্ঠা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বৈষ্ণব মতবিবেক নামে প্রবন্ধটি পড়িতে অনুরোধ করি। হরপ্রসাদ সংবর্ধন লেখমালা দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীযুত সুশীলকুমার দে লিখিত চৈতন্য সম্প্রদায় ও মাধ্ব সম্প্রদায় একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ।

চৈতন্যচন্দ্রামৃত টীকায় দেখা যায়—"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুঃ স্বয়ং সম্প্রদায় প্রবর্তক স্তৎ পার্ষদা এব সাম্প্রদায়িক গুরবো নান্যে।" অর্থাৎ স্বয়ং "মহাপ্রভুই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক এবং তাঁর পার্ষদ গণই শুধু পন্থগুরু।"

তাঁহার মত তাঁহার নিজের বলাই সঙ্গত। মতামত ও আচার ব্যবহার লইয়া স্বীয় অনুচরদের সঙ্গে অনেক সময় মহাপ্রভুর অনৈক্য হইত। কখনও মহাপ্রভুর কৃচ্ছ্রাচারে জগদানন্দ দুঃখী হইতেন (চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ)। কখন মহাপ্রভুর অকৃচ্ছ্রাচারে স্বরূপ দামোদর রুষ্ট হইতেন (চৈতন্যচরিতামৃত, আন্ত্য, ৩য় পরিচ্ছেদ)। তাঁহার পথ তাঁহার নিজের। ছোট হরিদাসকে তিনি মাধবী বৈষ্ণবীর কাছে ভিক্ষা গ্রহণ অপরাধে চিরকালের জন্য বর্জন করিলেন অথচ রায় রামানন্দকে তাঁর বিশ্বাসের আর অন্ত ছিল না।

শ্রীআচার্য অদ্বৈত পূর্ব হইতেই মহাপ্রভুর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছিলেন। ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার তিরোভাব। তাঁহার পরিচয় আর এখানে কি দিব?

গুটি আটেক শ্লোক ছাড়া তাঁহার রচিত কোনো পুস্তক নাই। কিন্তু তাঁহার মতামত বুঝি তাঁহার উপদেশে। প্রয়াগে রূপ গোস্বামীকে ও কাশীতে সনাতন গোস্বামীকে যে অপূর্ব উপদেশ তিনি দেন, তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি ভক্ত লেখকেরা চমৎকার ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রায় রামানন্দের সঙ্গে তাঁহার আলাপও অতুলনীয়।

অবশ্য তাহার মধ্যে মহাপ্রভুর নিজ মতের সঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় যদি কিছু বস্তু মিশাল দিয়া থাকেন তবে আলাদা কথা। তবে কবিরাজ গোস্বামী খুব প্রাচীন ও সত্যনিষ্ঠ ইহাই যা ভরসা।

বাংলা দেশে তিনি আচার্য গোস্বামী অদ্বৈতকে শান্তিপুরে, অবধূত গোস্বামী নিত্যানন্দকে খড়দহে, গোস্বামী নরহরি সরকারকে শ্রীখণ্ডে থাকিয়া বাংলায় প্রচার করিবার ভার দিলেন।

বাংলা দেশ প্লাবিত করিয়া বাংলার বাহিরে এই ধর্ম প্রচার করিবার ভার নিলেন মহাপ্রভু স্বয়ং। উৎকল, গোদাবরী, কৃষ্ণা দেশ বাহিয়া তিনি তীর্থযাত্রা ব্যপদেশে প্রচার করিতে করিতে গেলেন কুমারিকা পর্যন্ত, তারপর মালাবার কর্ণাট মহারাষ্ট্রাদি সকল দক্ষিণ দেশ তিনি প্রেমের বন্যায় ভাসাইলেন।

তাঁহার এই প্রচারে ধনীদরিদ্র বিপ্রশূদ্র পণ্ডিতমূর্খ ভেদবিচার নাই। কাশীর পথে ঝাড়িখণ্ডের কোলভীল সাঁওতাল শ্রেণীর মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া, কাশীর প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মত মহাপণ্ডিত সবাই তাঁহার ধর্মের আস্বাদ পাইলেন।

তাঁহার প্রধান ক্ষেত্রই হইল উৎকল জগন্নাথধামে। সেখানে তাঁহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে ভগবান আনিয়া জুটাইয়া দিলেন পরম ভাগবত শ্যামানন্দকে। শ্যামানন্দ মেদিনীপুরবাসী, জাতিতে সদ্‌গোপ। ইনিই দুঃখী কৃষ্ণদাস। মহাপ্রভুর পর তিনি নিজে, নরোত্তম ও শ্রীনিবাসই প্রচারকার্য চালাইয়াছেন। শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকমুরারি। ময়ূরভঞ্জের রাজারা তাঁহার শিষ্য। পুরী রাজারাও এতকাল পর্যন্ত গৌড়ীয় গোস্বামীদেরই শিষ্য ছিলেন। এখন এই রাজা সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করিলেন। রসিকমুরারির জীবনীলেখক উৎকলবাসী, গোপীবল্লভ দাস। তাঁহার লেখা চমৎকার বাংলা। উৎকলে ঘরে ঘরে গৌরাঙ্গ অর্চিত ও বাংলা কীর্তন গীত হয়।

বৃন্দাবনে এখন বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রায় তিনটি ভাগে বিভক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঠৌরবাসী, কুঞ্জবাসী ও বনবাসী। ঠৌরবাসীরা বৃন্দাবন সহরের মধ্যে মঠে বাস করেন। পুরীতে যাহাকে মঠ বলে, নবদ্বীপে তাহাকে আখড়া বলে, বৃন্দাবনে তাহাকেই বলে ঠৌর। ঠৌরে নারীর প্রবেশ নাই, কাজেই তাঁহাদের আচার ও সাধনা মহাপ্রভুর ভাবে বিশুদ্ধ থাকার কথা। কুঞ্জবাসীরা বৈরাগী হইয়াও গৃহী অর্থাৎ প্রকৃতি সহ বাস করেন, কাজেই তাঁহাদের বলে সংযোগী। বনবাসীরা এইসব ধার ধারেন না। তাঁহারা অতিশয় কৃচ্ছ্রাচারী ও সরল জীবনযাত্রা লইয়া নিরন্তর সাধনায় রত। তাঁহাদের মধ্যে বাংলা দেশের ভাল ভাল ঘরের সব শিক্ষিত ধনী যুবকও আছেন। ইঁহারাই আদর্শকে বিশুদ্ধ রাখিয়াছেন।

কিন্তু কুঞ্জবাসীদের মধ্যে এখন তথাকথিত সহজিয়া ভাবেরই প্রাবল্য।

ঠৌরবাসীদেরও সেই প্রাচীন বিশুদ্ধি দুর্লভ হইয়া আসিতেছে। কাজেই মহাপ্রভুর আপন স্থানেই তাঁহার মতবাদটি ক্রমেই দুর্বল হইয়া আসিতেছে।

বৃন্দাবনের কথায় যে দুঃখ নিবেদন করিলাম, কাশীর বর্তমান কথা বলিতে হইলেও সেই দুঃখই চিত্তকে পীড়িত করে। আজ সেখানে বাঙ্গালীর তপস্যা প্রাচীন উচ্চ আদর্শ হইতে অনেক নীচে নামিয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালীর গৌরবই কেবল বর্ণনা যদি করি আর যেখানে বাঙ্গালীর সাধনাতে বিপদ জমিয়া উঠিতেছে তাহার যদি না উল্লেখ করি তবে আমাদের কাজ অসম্পূর্ণ থাকে।

হৃষীকেশ, হরিদ্বার, নর্মদাতীর্থ প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালী সাধুদের সুনাম এখনও আছে।

প্রমাণ-পঞ্জী

১ চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য, নবম পরিচ্ছেদ
২ চৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাংলার বাহিরে গৌড়ীয় মত

মহাপ্রভুর প্রেমের ধর্ম ব্রহ্মদেশ হইতে ডেরাইসমাইল খাঁ পর্যন্ত সারা ভারতকে প্লাবিত করিল। পূর্ব-আসামে রাজা স্বর্গনারায়ণ (১৪৯৭-১৫৯৩) ও পশ্চিম-আসামে রাজা নরনারায়ণ (১৫২৮-১৫৮৪) এই ধর্মের প্রভাবে বৈষ্ণব হইলেন।

আসামের শঙ্কর দেব মহাপ্রভুর সমসাময়িক। তাঁহার তিরোধান ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ মহাপ্রভুর তিরোধানের ৩৬ বৎসর পরে। তবে তিনি নাকি ১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, তবে তাঁর আয়ু হয় ১২০ বৎসর। কেহ কেহ বলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হইতে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ করিবার চেষ্টায় এইরূপ জন্ম সাল দেওয়া হইয়াছে। আমাদের পক্ষে তাহাতে কিছু যায় আসে না। তিনি নিজেই একজন মহাপুরুষ। তাঁহার পূর্বপুরুষাদি বাংলা দেশেরই মানুষ।[১] তাহা ছাড়া শঙ্কর দেব ১২ বৎসর নবদ্বীপে বাস করিয়া গিয়াছেন। সেই হিসাবেও কাহারও কাহারও মতে গৌড়ীয় প্রভাব তাঁহাতে আছে।

মহাপ্রভু কাশীতে গিয়া প্রায় দুই মাস বাস করেন। সেখানে তাঁহার প্রধান লীলা হইল মহাজ্ঞানী প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে নিজ মতে আনয়ন। মহাপ্রভু যখন কাশীতে ছিলেন তখন তিনি তথায় অনেক বাঙ্গালীকে দেখিতে পান। তপন মিশ্রের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন চন্দ্রশেখর কবিরাজ। তিনি ভক্তিমান ও তীর্থক্ষেত্রবাসী ছিলেন। পুঁথি নকল করিয়া চন্দ্রশেখর কাশীতে জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তখনকার দিনে মুদ্রাযন্ত্র না থাকায় বহুলোক সুন্দর হস্তাক্ষরের দ্বারায় শাস্ত্রাদির প্রচার কার্য অক্ষুন্ন রাখিতেন। তাঁহাদিগকে "আখরিয়া" বলিত। দেখা যায় চন্দ্রশেখরও একজন আখরিয়া ছিলেন।[২] চন্দ্রশেখরের একজন বন্ধু ছিলেন পরমানন্দ। তিনিও বাঙ্গালী এবং কীর্তন গান ছিল তাঁর কাজ। বাঙ্গালী কীর্তনীয়ার দ্বারা বুঝা যায় তখন কাশীতে বাঙ্গালী কীর্তন-শ্রোতা যথেষ্ট সংখ্যায় ছিলেন।

চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় ২০-২৪শ অধ্যায়ে বিষয়বস্তু সনাতনশিক্ষা। মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে যে শিক্ষা দেন তাহা অপূর্ব বস্তু। প্রয়াগে রূপ গোস্বামীকেও মহাপ্রভু যে শিক্ষা দেন তাহাও চমৎকার। ইহাতে দেখা যায় কাশী প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে গিয়াও মহাপ্রভু স্বীয় শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন।

এই সব কারণে তখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে মহাপ্রভুর মতবাদ নানা ভাবে ছড়াইয়া পড়ে। মহাপ্রভুর নিজের সম্প্রদায়ের বাহিরেও তাঁহার মতবাদের প্রভাব প্রসারিত হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বৃন্দাবনে হরিদাসী বা টাট্টি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। ইঁহারা গৌড়ীয় ভাবে প্রভাবান্বিত। এই সম্প্রদায়ে বিঠ্ঠল বিপুল, বিহারিণী দাস, সহচরীশরণ (১৬৬৩) প্রভৃতি বহু প্রখ্যাত ভক্ত জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত কবি শীতলস্বামীরও (১৭২৩) এই টাট্টি সম্প্রদায়েই জন্ম। ইঁহারা ঐ দেশে গৌড়ীয় ভাবকে বিলক্ষণ প্রসারিত করিয়াছেন।

হিত হরিবংশের (জন্ম ১৫০২) রাধাবল্লভী মত অনেকটা তান্ত্রিক বৈষ্ণব মত। বাংলাতে সেইরূপ মতই মহাপ্রভুর পূর্বে ছিল।

দিল্লীতে একটি সুফী সাধনার ধারা আছে। তাহাতে হিন্দু মুসলমান দুই রকম গুরুই আছেন। মুসলমান বংশীয় য়ারী সাহেবের শিষ্য ছিলেন বুল্লা সাহেব। গাজীপুরের অন্তর্গত ভুরকুড়া গ্রামে এখনও বুল্লার স্থান আছে। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি তাঁর জন্ম। তাঁর শব্দসার গ্রন্থ ভক্ত সমাজে খুব আদৃত। চলতি ভাষায় লিখিত তাঁহার বাণীতে পাই, "পূর্ব দেশ থেকে আপনি এলেন একজন ব্রাহ্মণ, তিনি ছিলেন আবার অবধূত! অপার অখণ্ড ব্রহ্ম জানেন সেই ব্রাহ্মণ, তিনি এলেন আমার গৃহাঙ্গনে। পরমতত্ত্ব নিয়ে তিনি আপনি করলেন পূজা, সহজ অসীম তত্ত্বের গান তিনি গাইলেন। রজোগুণ তমোগুণ সত্ত্বগুণ তিনি দিলেন সরিয়ে, তনুমন দুই-ই তিনি বসলেন হারিয়ে, গগনমণ্ডলে তিনি চাখলেন হরিরস, কচিতই কেউ বুঝবে এই রহস্য!"

পূরব দেসকর আপুহিঁ বঁভনা
আপু ভয়ল অবধূতা।
অপরংপার ব্রহ্ম জানৈ বঁভনা
আয়ো হমারে গৃহ অংগনা।
পরমতত্ত্ব লে পূজে আপুহিঁ
সরল গাবৈ অনহদ ততনা॥

রজগুণ, তমগুণ, সতগুণ সারল
হারল তনমন দোউ।
গগন মঁডল মেঁ হরিরস চাখল
বুঝৈ বিরলা কোউ ॥

এই অবধূত ব্রাহ্মণটি কে? কোনো কোনো টীকাকারের মতে তিনি নিত্যানন্দ। আমাদেরও নিত্যানন্দের কথাই মনে হয়। কিন্তু তিনি কি সর্বগুণাতীত ব্রহ্মের গান করিয়াছেন? তবু এই গানটি আপনাদের কাছে উপস্থিত করিলাম।

রাজস্থানে চৈতন্যমত

এই সব কারণেই রাজস্থানে দিন দিন গৌড়ীয় প্রভাব বাড়িয়া চলিল। মানসিংহের দ্বারা যশোরের দেবী ও পূজারী আমেরে নীত হইলে বাংলার দেবী পূজা সেই দেশে গেল। আর দিল্লীর আক্রমণের ভয়ে বৃন্দাবনের বৈষ্ণব বিগ্রহগুলিকেও রাজপুতানার নানা স্থানে আশ্রয় দিতে হইল।

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৃন্দাবনে ছিল সাতটি প্রধান বিগ্রহ। রূপ গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোবিন্দ, সনাতনের মদনমোহন, জীব গোস্বামীর (কাহারও মতে রূপ গোস্বামীর) শ্রীরাধাদামোদর, ভূগর্ভ গোস্বামীর ও মধু পণ্ডিতের শ্রীগোপীনাথ, শ্যামানন্দের শ্রীশ্যামসুন্দর, নরোত্তম ঠাকুরের শ্রীরাধাবিনোদ, লোকনাথ গোস্বামীর ও শ্রীগোকুলানন্দ গোপাল ভট্টের বিগ্রহ হইলেন শ্রীরাধারমণ। শ্রীরাধাবিনোদ ও শ্রীগোকুলানন্দের সেবা হয় একসঙ্গে। প্রাউজ্ প্রভৃতি যুরোপীয়েরা মনে করেন উত্তর-ভারতে হিন্দু শিল্পকলার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা ও সর্বাঙ্গের সামঞ্জস্য গোবিন্দজীর মন্দির।

এই মন্দিরটি রূপসনাতনের তত্ত্বাবধানে ও মূলতানী বণিক কৃষ্ণদাসের আর্থিক সহায়তায়, আকবরের ৩৪শ রাজ্যাব্দে রচিত।

রাজপুতানার শ্রীশ্যামসুন্দরের সেবাইৎ ওড়িয়া, আর সব সেবাইৎ বাঙ্গালী। শেষ পর্যন্ত শ্রীরাধারমণ ছাড়া আর সব বিগ্রহকেই বৃন্দাবন হইতে রাজপুতানায় লইয়া যাওয়া হইল। মদনমোহন গেলেন করৌলিতে আর বাকি সব গেলেন জয়পুরে। রাধারমণের সেবাইৎরা ব্রজবাসী। যে জয়পুরে গৌড়ীয় সব বিগ্রহ গেলেন সেই জয়পুর বাঙ্গালী পণ্ডিত বিদ্যাধরেরই আদর্শে রচিত। বাংলার

সঙ্গে রাজপুতানার এই সম্বন্ধ আজও জীবন্ত। জয়পুর হাইকোর্টের বিচারপতি গীজগড়ের সর্দার খুসহাল সিংহ গৌড়ীয় গোস্বামীর শিষ্য এবং অতিশয় ভক্ত বৈষ্ণব।

বৃন্দাবন শিঙ্গার বটের গোস্বামীরা নিত্যানন্দবংশীয়। বৃন্দাবনের আশে পাশে ও রাজপুতানায় তাঁহাদের বিস্তর শিষ্য আছে।

চৈতন্য-মতাবলম্বী ছাড়াও অন্যান্য বৈষ্ণবগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভক্তিগ্রন্থ রসগ্রন্থ ও সিদ্ধান্তগ্রন্থগুলি অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত পড়িয়া থাকেন। কাজেই বাংলার ভাবধারাকে বাংলার বাহিরে প্রচার করিবার কর্মে এই গ্রন্থগুলি মস্ত সহায়। কাথিয়াবাড়ে ভবনগরে ও সুদামাপুরে (পোরবন্দর) আমি অনেক ভক্ত বৈষ্ণবের মঠে যাইয়া বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ পঠিত হইতে দেখিয়াছি। কোথাও কোথাও বাংলা গ্রন্থও সযত্নে রক্ষিত আছে। গৌড়ীয় কোনো ভক্তকে পাইলে তাঁহারা সেই সব গ্রন্থের তত্ত্ব তাঁহার মুখে শুনিয়া কৃতার্থ হয়েন।

চৈতন্য-মত মহারাষ্ট্র, মধ্যভারত ও মাদ্রাজ প্রদেশে

মহারাষ্ট্র দেশে সপ্তশৃঙ্গতীর্থে বাঙ্গালী সাধু গৌড়স্বামীর কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ভক্ত তুকারামের (জন্ম ১৬০৮) গুরু বাবাজি চৈতন্য। তাঁহার গুরু পর পর রাঘব চৈতন্য ও কেশব চৈতন্য। কেহ কেহ বলেন তাঁহারা চৈতন্যভক্ত ছিলেন। অবশ্য চৈতন্যশব্দ দ্বারা তাহা মনে করা উচিত নহে।

মহাপ্রভুর বড় ভাই বিশ্বরূপ অর্থাৎ শঙ্করারণ্য পাংঢরপুরে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার একজন পরিচারিকা ছিলেন ভক্তনারী শিখরিণী। ভক্ত শিখরিণীর প্রদৌহিত্রী চরণদাসী। তিনি মহারাষ্ট্র হইতে গুজরাত সুরতে গিয়া ধর্মপ্রচার করেন।[৩]

বেরার প্রদেশে চৈতন্যমতাবলম্বী বৈষ্ণব এখনও অনেকে আছেন।

মধ্যভারত ছত্রপুরের মহারাজা বিশ্বনাথ সিংহজী বৃন্দাবনের নীলমণি গোস্বামীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। নীলমণি গোস্বামী মহাশয় অদ্বৈতবংশীয়। বাজীরাওয়ের সময়েই নাকি ধরমপুর প্রদেশে বঙ্গীয় বৈষ্ণবমত ছড়াইয়া পড়ে। ছত্রসিংহ ঠোকে প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই কাজে সহায়তা করেন। মাদ্রাজ প্রদেশের সাতানীরা অনেকের মতে চৈতন্যমতের লোক;[৪] সে দেশের "সংযোগী" প্রভৃতিরাও চৈতন্যমতবর্তী।

গুজরাতে চৈতন্য-মত

গুজরাতের লোকের চিত্তবৃত্তি বৈষ্ণব ভাবের। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বহুদিন পূর্ব হইতেই গুজরাতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীনিবাস আচার্যের সময়েই সুরতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মঠ স্থাপিত হয়। সুরতে দুইটি গৌড়ীয় মঠ। বড়টির অধিকারী ভরতদাস মোহান্ত ও ছোটটির অধিকারী একজন ওড়িয়া মোহান্ত। ওড়িয়া মোহান্তেরা প্রায়ই শ্যামানন্দের শিষ্য।[৫]

পূর্বেই মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠ সহোদর বিশ্বরূপ বা শঙ্করারণ্যের নাম করা হইয়াছে। তাঁহারই শিষ্যা পূর্বোক্তা শিখরিণী। শিখরিণীর কন্যা সুভদ্রা, দৌহিত্রী অনুজা ও প্রদৌহিত্রী চরণদাসী। তিনি সুরতে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। বিশ্বরূপের ধারা হইলেও তাঁহারা মহাপ্রভুর ভাবেই বেশী অনুপ্রাণিত। তাঁহার ভক্তি ও আচরণে বহু ভক্ত আকৃষ্ট হন। তাঁহার সাধনাস্থান এখন মাঈজীর আখড়া বা গৌড়ীয় গদি বলিয়া খ্যাত। এখানে নিত্যসেবার খুব ভাল বন্দোবস্ত আছে।

গুজরাতের গ্রামে গ্রামেও অনেক গৌড়ীয় বৈষ্ণব আছেন। সুরত জেলার নরসারী, বুলসার প্রভৃতি স্থানেই তাঁহাদের অনেকের বাস। নরসারীর নিকটে সিসোদরা, সুপা, অষ্টগ্রাম, চৌবিসিয়া, সরপোর-পারধী প্রভৃতি গ্রামে বাংলা কীর্তন শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছি।

ইঁহাদের গুরু ছিলেন অদ্বৈত বংশীয় নন্দলাল গোস্বামী। বৃন্দাবনে পুরানা সীতানাথ মন্দিরে তাঁহাদের স্থান। নন্দলালের পুত্র ছিলেন গোকুলনাথ। গোকুলনাথের পুত্র বীরেশ্বর গোস্বামী পরলোকগত। তাঁহার মা ও স্ত্রী জীবিত আছেন, কিন্তু পুত্র নাই। কাজেই গুরুর অভাবে গুজরাতের এই সব ভক্তরা ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন।

নরসারীর পাটিদার বা পাটেলেরা এক সময় মুসলমানী মতের পীরাণা পন্থের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতেন। তাহাতে অন্যান্য স্থানের পাটেলেরা তাঁহাদিগের সংসর্গ বর্জন করেন। কিন্তু তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত করে। পরে আর্য সমাজের একটি বড় কেন্দ্র গড়িয়া উঠে নরসারীর অন্তর্গত সুপা গ্রামে। সুপাতে প্রতিষ্ঠিত গুরুকুল ও আর্যসমাজ সেখানে বহু কাজ করিয়াছে।

চৈতন্য-মত সীমান্ত প্রদেশে

পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশ দেরা ইসমাইল খাঁতেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের শিষ্য আছেন। তাঁহারা পূর্বে বাংলা ভাষায় কীর্তন করিতেন, ক্রমে সেই কীর্তনের ভাষা রূপান্তরিত হইয়া দুর্বোধ্য হইয়া পড়িল। মধ্যে একজন সাধু যাইয়া কীর্তনগুলির একটু সংস্কার করিয়াছিলেন। বাংলা দেশ হইতে যোগভ্রষ্ট হওয়ায় এখন ইহাঁরা সংখ্যায় কমিয়া যাইতেছেন। ইহাঁদের যুবকেরা সব লাহোরে গিয়া আর্যসমাজী অথবা ধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়িতেছেন। এই বংশেরই একটি ভক্তিমতী নারীর পুত্র আমাদের শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক মালিক গুরুদয়ালজী। বলা বাহুল্য, দেরা ইসমাইল খাঁতে—বল্লভাচার্যের অনুবর্তী বৈষ্ণবই প্রায় সকলে। তবু সেখানে এত দূরে বাংলার বৈষ্ণবমত কেমন করিয়া পৌঁছিল তাহাই বিস্ময়কর।

বেলুচিস্তান কোয়েটার মধ্যেও কিছু চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। এখন বোধ হয় তাঁহারা লুপ্ত হইয়া গিয়াছেন। সিন্ধু শিকারপুরে এখনও এইরূপ বৈষ্ণব আছেন। এই সব স্থান হইতে ভক্তরা বৃন্দাবন আসেন। কেহ কেহ নবদ্বীপ পর্যন্ত যাত্রা করেন। যোগসূত্র যদি ছিন্ন না হইত তবে এই সব স্থানে বাংলা দেশের ভাবধারা এমন করিয়া ক্ষীণ হইয়া আসিত না। এখনও তাহাদের কীর্তনাদিতে মহা উৎসাহ। ইহাঁদের উৎসবাদিতে হিন্দু-মুসলমান নানা শ্রেণীর লোক মহা উৎসাহে যোগ দিয়া থাকেন। সিন্ধু লারকানাতে সেই দেশীয় এক ভক্তের চমৎকার বাংলা কীর্তন শুনিয়াছি।

বৃন্দাবনে গৌড়ীয় সম্প্রদায়

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী জীবনের শেষ ভাগে বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিলেন। এই দুইজনই অসাধারণ পণ্ডিত। তাঁহারা এত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন যে নাম করিতে গেলে অনেকের ধৈর্যহানি হইবে। তাহার মধ্যে শ্রীসনাতন প্রায় সিদ্ধান্তগ্রন্থ ও শ্রীরূপ প্রায় রসগ্রন্থগুলি রচনা করেন। ইহাঁদের গ্রন্থাগারও বিপুল ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, গ্রন্থগুলি তাঁহাদের সমাধির পাশেই সমাধি দিয়া রাখা হইয়াছে। তাহার নাম "গ্রন্থ"-সমাধি! শ্রীজীব গোস্বামী দীর্ঘজীবী কঠোর তপস্বী ছিলেন—তাঁহারও বহু গ্রন্থ ছিল। সেগুলি সমাহিত হয় নাই সত্য কিন্তু তাহা যে রাধা-দামোদর মন্দিরে ছিল তাহার অধিকারীদের

মধ্যে বিরোধ হওয়ায় বহুকাল তালাবদ্ধ থাকাতে নাকি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থগুলি পোকাতে ও মাটিতে পচিয়া সব অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছে।

সনাতন গোস্বামীর ভাই রূপ ও বল্লভ। বল্লভ সর্ব কনিষ্ঠ। তাঁহার আর এক নাম ছিল অনুপম। বল্লভের পুত্র হইলেন জীব গোস্বামী। তিনি কাশীতে আসিয়া মধুসূদন সরস্বতী মহাশয়ের ছাত্র হন। রূপ গোস্বামীর কাছে দীক্ষা লইয়া জীব গোস্বামী জীবনের শেষ ভাগ কঠোর তপস্যাতে ও প্রগাঢ় শাস্ত্রালোচনায় অতিবাহিত করেন। তাঁহার গ্রন্থাদির কথা বাঙ্গালীর রচিত বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রকরণে বলা হইবে। জীব গোস্বামী জীবনের শেষ ভাগে বৃক্ষের শুষ্ক পত্র ও তীর্থের ধূলা মাত্র খাইতেন। তাহাতে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া যায়। উদরী রোগে তাঁহার মৃত্যু হইল। বৈষ্ণবদের বসাইয়া সমাধি দেওয়া বিধি। কিন্তু উদরী রোগে শরীর ফুলিয়া যাওয়ায় তাঁহাকে বসাইয়া সমাধি দেওয়া গেল না। তাই তাঁহার সমাধি শোয়ান অবস্থায়—দীর্ঘ সমাধি।

জীব গোস্বামীর তেজও বিলক্ষণ ছিল। কথিত আছে, এগার সিন্দুরবাসী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ রূপনারায়ণ কাশী যাইয়া সংস্কৃত পড়েন। তার পর তিনি বেদবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য মহারাষ্ট্র বাঁই নগর প্রভৃতি স্থানে যান। সরস্বতী উপাধি লইয়া তিনি দিগ্বিজয়ে বাহির হন। বৃন্দাবনে রূপ সনাতনকে তিনি শাস্ত্র যুদ্ধে আহ্বান করেন। তাঁহারা বীতরাগ বৈষ্ণব; তাই যুদ্ধ না করিয়াই তাঁহাকে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন। সেই পত্র লইয়া তিনি জীবের নিকট গেলে জীব তাঁহার সহিত ঘোর বিচারে প্রবৃত্ত হন ও তাঁহাকে পরাজিত করেন। রূপনারায়ণ তখন বিনীত হইয়া সনাতনের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বিতণ্ডাবুদ্ধিতে জীব তর্ক করিয়া অবৈষ্ণবের মত কাজ করিয়াছেন বলিয়া রূপ গোস্বামী তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি স্বীয় দম্ভের দ্বারা বৃন্দাবনকে অসম্মানিত করিয়াছ। এই তীর্থের তুমি অযোগ্য।" তাই জীব দীর্ঘকাল বৃন্দাবনের বাহিরে যমুনা-কুটীরে বাস করিতেন। পরে সনাতন গোস্বামী কৃপা করিয়া তাঁহাকে আবার বৃন্দাবনে লইয়া আসেন।

রূপ সনাতনের পাণ্ডিত্যে মহামতি আকবর মুগ্ধ হইয়া বৈষ্ণবদের বৃন্দাবন রচনায় সহায়তা করিয়াছেন। মহারাজা মানসিংহ তাঁহার গোবিন্দজীর মন্দিরের উৎকীর্ণ লিপিতে রূপ ও সনাতনকে তাঁহার গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ লিপিতে একটি কথা দেখা যায় যাহা হিন্দী ভক্তদের লেখার সঙ্গে মেলে না। ভগবান দাস মানসিংহের পিতা নহেন, তিনি পিতৃব্য।

ভক্তিরসবোধিনী-প্রণেতা প্রিয়াদাসজী বলেন, মীরাবাঈ নাকি বৃন্দাবনে গিয়া জীব গোস্বামীর খ্যাতি শুনিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যান। গোস্বামীজী বলিয়া পাঠাইলেন "আমি নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি না।" তাহাতে মীরা বলিয়া পাঠাইলেন "বৃন্দাবনে তো জানি পুরুষ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। আর তো সবাই নারী। শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলে আর একজন পুরুষ বসিয়া আছেন জানিলে তো তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে।" এই কথায় গোস্বামীজী অতিশয় লজ্জিত হইয়া আসিয়া মীরার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

বৃন্দাবন আঈ জীব গুসাঈ সেঁা হিলিমিলি
তিয়ামুখ দেখিবে কো পণলে ছুড়ায়ো হৈ ॥*

জীব গোস্বামীর সম্বন্ধে এমন সব কথা আছে যাহাতে মনে হয় তিনি প্রচলিত লোকাচার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। জীব নাকি একবার যমুনায় স্নানরত ছিলেন, তখন আচারনিষ্ঠ দক্ষিণী এক ব্রাহ্মণ দেখিলেন জীব সন্ধ্যা করেন না। তখন তিনি জীবকে সন্ধ্যা না করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জীব বলিলেন,

সদ্ভক্তির্দুহিতা জাতা মায়া ভার্যা মৃতাধুনা।
অশৌচদ্বয়যুক্তেন ত্যক্তা সন্ধ্যা ময়া সখে ॥

"হে বন্ধু, আমার সদ্ভক্তিরূপা কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, মায়ারূপা ভার্যা পরলোকগতা, এই দুই অশৌচ এক সঙ্গে আসিয়া পড়ায় আমি এখন সন্ধ্যা ছাড়িয়া দিয়াছি।"

আর একবার এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সন্ধ্যা না করার হেতু জিজ্ঞাসা করিলে জীব গোস্বামী নাকি বলিয়াছিলেন,

হৃদাকাশে চিদানন্দঃ সূর্যো ভাতি নিরন্তরম্।
উদয়াস্তং ন পশ্যামি কথং সন্ধ্যামুপাস্মহে ॥

"হৃদয়াকাশে চিদানন্দ সূর্য নিরন্তর দেখিতেছি দীপ্যমান। তাহার উদয়ও নাই অস্ত নাই তাই কেমন করিয়া করি সন্ধ্যা?"

কেহ কেহ বলেন, দিগ্বিজয়ী রূপনারায়ণই জীব গোস্বামীকে দ্বিতীয় প্রশ্নটি করেন।

এই শ্লোক দুইটি মৈত্রেয়োপনিষৎ পুস্তকে একটু ভিন্ন ভাবে পাই—যথা,

মৃতা মোহময়ী মাতা জাতো বোধময়ঃ সুতঃ
সূতকদ্বয় সংপ্রাপ্তৌ কথং সন্ধ্যামুপাস্মহে ॥
হৃদাকাশে চিদাদিত্যঃ সদা ভাসতি ভাসতি।
নাস্তমেতি ন চোদেতি কথং সন্ধ্যামুপাস্মহে ॥'

বৃন্দাবনে শ্রীগোপালভট্ট, আচার্য শ্রীনিবাস, ঠাকুর নরোত্তম ও শ্যামানন্দ যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন। এখানে গোস্বামী রঘুনাথ দাস ও লোকনাথ গোস্বামীর নামও করা উচিত।

এই সব বৃন্দাবনবাসী ভক্তদের লেখা ও সংগৃহীত বহুগ্রন্থ গাড়ী বোঝাই করিয়া বাংলাদেশে পাঠান হইয়াছিল, পথে বনবিষ্ণুপুরে তাহা লুণ্ঠিত হয়। তাহার কিছু কিছু পরে পাওয়া যায়, সব আর পাওয়া যায় নাই। ইহার পরেও বহু বৈষ্ণবগ্রন্থ লেখা হয় তাহার উল্লেখ করার অবকাশ এখানে নাই।

এখানে মহাপণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর নাম না করিলে অন্যায় হয়। তাঁহার রচিত বহু গ্রন্থ। তাঁহার সারার্থদর্শিনী নামে ভাগবতের টীকাই তাঁর চরম গ্রন্থ, ইহা ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখা।

বৃন্দাবনের কুঞ্জ ও মন্দিরগুলি প্রায়ই বাঙ্গালীর। সেখানে দান ও পুণ্যার্থে যে অর্থ নানা দেশ হইতে আসে তাহারও বার আনা বাঙ্গালীর দান, যদিও নিজেদের দলাদলি ও অন্যান্য কারণে এখন পৌরাধিকারে বাঙ্গালীর তেমন হাত নাই। বৃন্দাবন ধাম মহাপ্রভুর ভক্তেরাই গড়িয়া তুলিয়াছেন।

বৃন্দাবনের গৌড়ীয় প্রভাব সমগ্র রাজপুতানায় ছড়াইয়া পড়িল। তাই অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবমতবাদিগণ ইহাতে কিছু দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা সকলে বলিলেন, চৈতন্যমত সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। স্থানান্তরেও বলা হইয়াছে এই লইয়া অম্বরপতি রাজা দ্বিতীয় জয়সিংহের সময়ে অম্বরে এক মহা বিচারসভা বসিল। তাহাতে বলদেব বিদ্যাভূষণ গৌড়ীয় মতকে স্থাপন করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ছিল না। গোবিন্দজীর কৃপায় এক মাসের মধ্যে বলদেব এক অপূর্ব ভাষ্য রচনা করিলেন। তাই তাহার নাম হইল গোবিন্দভাষ্য।

বৃন্দাবনের সেই গ্রন্থরচনার ধারা এখনও চলিয়া আসিতেছে। একশত বৎসর আগেও গোবর্ধনবাসী সিদ্ধ বাবাজী বাংলা গদ্যে একখানি গুটকা গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গের দিনগত লীলার কথা বর্ণিত।

ভক্ত গোস্বামী রাধিকানাথ, ব্রজবিদেহী সন্তদাস, রাজর্ষি বনমালী রায় প্রভৃতি বাঙ্গালী সাধুরা এবং ব্রজমণ্ডলের বনবাসী বাঙ্গালী বাবাজীগণ এখনো বাংলার নাম ধন্য করিয়া রাখিয়াছেন।

বাংলার জয়দেব, মহাপ্রভু, জীব গোস্বামী, লোকনাথ গোস্বামী, রসিক মুরারি, দাস রঘুনাথ, নিত্যানন্দ, রূপ সনাতন প্রভৃতির জীবনী নাভাজীর ভক্তমালে ও প্রিয়াদাসের ভক্তিরসবোধিনীতে পাই। তাহা ছাড়া রাঘব দাস, হরিবর রামানুজ প্রভৃতি হিন্দী ভক্তচরিত লেখকেরাও বহু গৌড়ীয় ভক্তের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

শ্রীনাথ মন্দিরে বাঙ্গালী সেবক

বৃন্দাবনের আশে পাশেও তখন এমন বহু বাঙ্গালী বৈষ্ণব ছিলেন যাঁহারা চৈতন্য মহাপ্রভুর পন্থের বাহিরের ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাজে রত ছিলেন। তাহার সামান্য একটি বিবরণ আমরা গোকুলনাথজী-রচিত "চৌরাশী বৈষ্ণব কী বার্তা" গ্রন্থ হইতে দিতে পারি। এই বিবরণটি বড় সুখকর নহে, কারণ ইহাতে সেই যুগের ভক্তগণের মধ্যেও যে কতটা সঙ্কীর্ণতা ও প্রাদেশিকতা ছিল তাহার পরিচয়ও পাওয়া যায়। তবু যাহা আছে তাহা যথাযথ ভাবে দেওরাই সঙ্গত।

শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য তৈলঙ্গ দেশীয় ব্রাহ্মণবংশে কাশীধামে ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রজধামে গোবর্ধন পর্বতে তিনি শ্রীনাথ নামে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপন করেন। এখন বল্লভাচারী মতবাদ সারা গুজরাত, কাথিয়াবাড়, কচ্ছ, সিন্ধু, পাঞ্জাব, রাজপুতানা প্রভৃতি দেশে ব্যাপ্ত। তাঁহার পুত্র বিঠ্ঠলনাথ গোস্বামীও পরম ভক্ত ছিলেন। বিঠ্ঠলনাথজীর পুত্র গোকুলনাথ ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি তাঁহার বৈষ্ণবচরিত্র গ্রন্থ লিখিতে ব্যস্ত ছিলেন। ভক্তমালে নানা সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের জীবনী, কিন্তু চৌরাশী বার্তাতে বল্লভ পন্থের ভক্তদেরই বিবরণ। সরল স্থানীয় গদ্যভাষাতে পুস্তকখানি লেখা।

বৈষ্ণবগণের কাছে জাতি অপেক্ষা ভক্তিই বড়। তাই মহাপ্রভু বল্লভাচার্য শূদ্রজাতীয় কৃষ্ণদাসজীকে দীক্ষা দেন। কৃষ্ণদাসকে তিনি অতিশয় স্নেহ করিতেন। ক্রমে তিনি শ্রীনাথ মন্দিরের চালনার সকল অধিকার কৃষ্ণদাসজীকে সমর্পণ করেন, তাই অধিকারী নামেই কৃষ্ণদাসজী প্রসিদ্ধ।

এখন চৌরাশী বার্তা হইতে একেবারে মূলানুগত অনুবাদ করিয়া দেওয়া যাউক,

"আর প্রথমে শ্রীনাথজীর সেবা বাঙ্গালীরাই করিতেন (ঔর প্রথম সেবা শ্রীনাথজী কী বাংগালী করতে)। পরে শ্রীআচার্যজী মহাপ্রভু (বল্লভাচার্য) কৃষ্ণদাসকে আজ্ঞা দিলেন যে তুমি গোবর্ধনে থাক, ঠাকুরের সেবা-পরিচর্যা কর। তাই কৃষ্ণদাস অধিকারী হইলেন, অধিকার করিতে থাকিলেন।

"পরে একদিন কৃষ্ণদাস মথুরা যাইতেছিলেন, যখন তিনি অভীংগে গিয়া পৌছিলেন তখন পথে অবধূতদাসের সঙ্গে দেখা হইল। অবধূতদাস ছিলেন মহাপুরুষ। তিনি ব্রজধামে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন। তখন অবধূতদাস কহিলেন, কৃষ্ণদাস তুমি কোথায় চলিয়াছ? কৃষ্ণদাস বলিলেন মথুরা যাইতেছি. একটু কাজ আছে। অবধূতদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রীনাথজীর সেবা কাহারা করেন? কৃষ্ণদাস কহিলেন, বাঙ্গালীরা করেন (তব কৃষ্ণদাস নে কহী জো বংগালী করত হৈঁ)। তখন অবধূতদাস কহিলেন, যখন শ্রীনাথজীর আপন ঐশ্বর্য প্রসারিত করিতে হইবে তখন তোমাকে বাঙ্গালীদের দূর করিয়া দিতে হইবে। (জো শ্রীনাথজীকো অপনৌ বৈভব বঢ়াবনো হৈ তাতে তুম বংগালীন কো দূর ক্যোঁ নাহী করত)'

শ্রীনাথজী (না কি) স্বয়ং অবধূত দাসকে কহিয়াছিলেন যে 'বংগালীরা আমাকে বহু দুঃখ দিতেছে'। (শ্রীনাথজী জীনে কহ্যো জো মোকোঁ বংগালী বহুত দুঃখ দেত হৈঁ)। যখন বাঙ্গালীরা শ্রীনাথজীকে ভোগ নিবেদন করেন তখন বাঙ্গালীদের শিখার মধ্যে যে লুক্কায়িত দেবীর একটি ছোট্ট মূর্তি থাকে তাহাকে সামনে বসাইয়া তাঁহার ভোগ সরান। সেই দেবীমূর্তিকে তাঁহারা সদা আপন শিখার মধ্যে লুকাইয়া রাখেন। এই কথা শ্রীনাথজী অবধূতদাসকে জানাইয়াছিলেন বলিয়াই কৃষ্ণদাসকে বলিলেন, বাঙ্গালীদের দূর কর (বংগালীন কো দূর করৌ)। তখন কৃষ্ণদাস বলিলেন, 'শ্রীগোঁসাঈজীর (বিঠ্‌ঠল নাথজী) আজ্ঞা বিনা তাড়াইয়া দেই কেমনে (শ্রীগুসঈজী কী আজ্ঞা বিনা কৈ সে কাঢ়েঁ)? তখন অবধূতদাস কহিলেন, 'তুমি অডেলে যাইয়া শ্রীগোঁসাঈজীর আজ্ঞা লইয়া আইস। যেমন করিয়া হউক এই বাঙ্গালীদের তাড়াও (জৈসে বনে তৈসে ইন বংগালীন কো কাঢ়ো)।'

তাই কৃষ্ণদাস অভীংগ হইতেই ফিরিলেন। তিনি গোবর্ধন আসিলেন। তিনি বাঙ্গালীদের কহিলেন, 'আমি তো শ্রীগুসঈজীর কাছে অডেলে চলিলাম,

তোমরা সাবধানে শ্রীনাথজীর সেবা করিও।' অন্য সব সেবকগণকেও কৃষ্ণদাস কহিলেন, 'শ্রীগুসাঈজীর কাছে একটু কাজ আছে আমি তাই অডেলে চলিলাম, তোমরা সাবধানে থাকিবে।' তার পর শ্রীনাথজীর কাছে বিদায় লইয়া কৃষ্ণদাসজী অডেলে যাত্রা করিলেন। অডেলে পৌছিলে গোসাঈজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'কৃষ্ণদাস, তুমি কেন আসিয়াছ?' তখন কৃষ্ণদাস বলিলেন যে, 'শ্রীনাথজীর ঐশ্বর্য বিস্তার করিতে হইবে, আর বাঙ্গালীরা বড়ই মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। যাহা কিছু ভেট আসে সব তাহারা লইয়া যায় এবং নিজ গুরুদিগকে দেয়'। (বংগালীন নে বহুত মাথৌ উঠায়ৌ হৈ জো ভেট আৱত হৈ সো লে জাত হৈঁ সো সব আপনে গুরুন কো দেত হৈঁ)

তখন গোসাঈজীও বলিলেন, 'পূর্বদেশ হইতে প্রায় লক্ষ টাকার ভেট দিয়া ঠাকুরের সব সোনার আভূষণ ও দ্রব্যাদি নির্মিত হইয়াছিল, পরে বাঙ্গালীরা বছর খানেকের ভিতরে সব লইয়া গিয়াছে এবং নিজগুরুদের নিয়া দিয়াছে।' এই কথা বলিয়া গোসাঈজী কৃষ্ণদাসকে বলিলেন, 'বাঙ্গালীরা মাথা তুলিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদিগকে মহাপ্রভু স্বয়ং নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাহাদিগকে এখন তাড়ানো যায় কেমনে?'

তখন কৃষ্ণদাস গোসাঈজীকে বলিলেন, 'মহারাজ শ্রীনাথজী স্বয়ং আজ্ঞা করিতেছেন, বাঙ্গালীদের তাড়াও, এই কথায় আপনি আর কিছু বলিবেন না। (শ্রীনাথজী কী আজ্ঞা হৈ জো বংগালীন কোঁ নিকাসৌ তাতে আপ যা বাত মেঁ কছু মতি বোলৌ) আপনি যদি আমাকে আজ্ঞা দেন তবে আমিই সব ঠিক করিয়া লইব। যেমন করিয়া বাঙ্গালীদের বাহির করা যায় তেমন করিয়া তাড়াইব (জৈ সে বংগালী নিকসেংগে তৈসে কাঢ়ুঁগো।' তখন শ্রীগোসাঈজী বলিলেন যে "অবশ্য।" তখন কৃষ্ণদাস কহিলেন, 'মহারাজ আগে দুইখানি পত্র লিখুন, একখানি রাজা টোডরমলকে, অন্যখানি বীরবলকে।' গোসাঈজীও উভয়কে লিখিলেন, 'কৃষ্ণদাস যাহা কহেন তাহাই করিবেন।' কৃষ্ণদাস আগরা আসিয়া টোডরমল ও বীরবলের সঙ্গে দেখা করিলেন ও পত্র দিলেন। পত্র পড়িয়া তাঁহারা কৃষ্ণদাসকে কহিলেন, 'তুমি যেমন বলিবে, তেমনই করিব।' তখন কৃষ্ণদাস কহিলেন; 'এখন তবে আমি মথুরা চলিলাম, বাঙ্গালীদের তাড়াইতে'। (বংগালীন কোঁ কাঢিবে কোঁ)।

পথে অবধূতদাসের সঙ্গে দেখা। অবধূতদাস কহিলেন, 'কৃষ্ণদাসজী ঢিলেমি করিতেছ কেন? বাঙ্গালীদের তাড়াও। (ঢীল কহা করি রাখী হৈ বংগালীন কোঁ

কাঢ়ৌ) শ্রীনাথজীরও ইহাই ইচ্ছা, তাঁহার আপন ঐশ্বর্য বিস্তার করিতে হইবে।' তখন কৃষ্ণদাস বলিলেন, 'গোসাঈজীর আজ্ঞা লইয়া আসিতেছি, এখন যাইয়া বাঙ্গালীদের খেদাইব'।(অব জায়কে বংগালীন কৌ কাঢ়ত হৈঁ)

সেই সব বাঙ্গালীর বাস-কুটীর ছিল রুদ্র-কুণ্ডের তীরে। কৃষ্ণদাস একদিন বাঙ্গালীদের কুটীরে দিলেন আগুন লাগাইয়া। আগুন লাগিলে মহা গোলমাল হইল। তখন বাঙ্গালীরা সেবা ছাড়িয়া পর্বতের নীচে দৌড়াইয়া আসিল। ততক্ষণে কৃষ্ণদাস আপন লোকজন পর্বতের উপর পাঠাইয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালীরা আসিয়া দেখে কৃষ্ণদাস কুটীরে আগুন লাগাইয়াছেন। তখন বাঙ্গালীরা কৃষ্ণদাসের সঙ্গে লড়িতে লাগিল। তখন কৃষ্ণদাস সকলকেই দুই দুই চারি চারি লাঠি লাগাইয়া দিলেন। (তব কৃষ্ণদাস নে দ্বৈ দ্বৈ চার চার লাঠী সবন মেঁ দীনী)

তখন সেই সব বাঙ্গালী সেখান হইতে পলাইয়া মথুরা আসিল। রূপসনাতনের কাছে আসিয়া সব কথা কহিল। (রূপসনাতনকে তিনি একইব্যক্তি মনে করিয়াছেন ভাইদের মধ্যে এইরূপ যুক্ত নামে একের বা উভয়ের উল্লেখও দেখা যায় যথা—দাদুর কন্যাদের নাম নানীবাঈ ও মাতাবাঈ কিন্তু উভয়কেই নানামাতা বলে। পূরণশূরণও এইরূপ যুক্ত নাম। প্রথমবারে "রূপসনাতন" ও দ্বিতীয় বারে মাত্র "সনাতন" বলাতে মনে হয় রূপের ভাই সনাতনকেই তিনি বুঝাইয়াছেন) ইতিমধ্যে কৃষ্ণদাসও আসিয়া সেখানে খাড়া হইলেন। রূপসনাতন কৃষ্ণদাসের উপর রুষ্ট হইয়া কহিলেন, 'কেন তুমি শূদ্র হইয়া এইসব ব্রাহ্মণদের মারিলে?' তখন কৃষ্ণদাস কহিলেন, 'আমি না হয় শূদ্রই আছি, কিন্তু তুমিও কিছু অগ্নিহোত্রী নহ। তুমিও তো কায়স্থ।' তখন সনাতন কহিলেন, 'এইসব কথা বাদশাহ শুনিলে তুমি কি জবাব দিবে?' তখন কৃষ্ণদাস বলিলেন, 'আমি তো বেশ জবাব দিব, কিন্তু তোমার জবাব দিতে মুশকিল আছে। তোমাকে জবাব দিতে হইবে কেন তুমি কায়স্থ হইয়া এইসব ব্রাহ্মণকে দণ্ডবত করাও?' তখন রূপসনাতন চুপ করিয়া রহিলেন, বাঙ্গালীদের কহিলেন, 'তোমরা জান আর ইনি জানেন'। (এসব কথার মধ্যে আমি নাই)

তখন বাঙ্গালীরা মথুরায় হাকিমের কাছে গেল। কৃষ্ণদাসও সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। তখন হাকিম কহিলেন, 'যাহা হইয়াছে তাহা হইয়াছে কিন্তু এখন ইহাদিগকে রাখ।' তখন কৃষ্ণদাস কহিলেন, 'এখন তো আর ইহাদিগকে রাখিব না। ইহারা তো আমাদের চাকর ছিল, আমরা ইহাদের উপর সেবার ভার দিয়াছিলাম, তবে ইহারা সেবা ছাড়িয়া কেন নীচে নামিয়া আসিল। যদি

ইহাদের কুটীর জ্বলিয়াই গিয়াছিল তবে না হয় নূতন কুটীর ছাওয়াইয়া দিতাম, ঠাকুরকে ছাড়িয়া ইহারা নাবিল কেন? তাই এখন তো আর ইহাদিগকে রাখিব না। তা আপনি যখন বলিতেছেন তখন শ্রীগোসাঈঁজীকে লিখিব, তিনি যেমন বলিবেন তেমনই করিব। তা আপনি গোসাঈঁজীকে লিখিতে হয় তো লিখুন।' গোসাঈঁজীর সঙ্গে তো আগেই সব ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল।

পরে কৃষ্ণদাস গেলেন শ্রীনাথ-দ্বারে আর বাঙ্গালী সব গেল শ্রীকুণ্ডে। তখন কৃষ্ণদাস গোসাঈঁজীকে পত্র লিখিলেন। তাহাতে বাঙ্গালীদের তাড়াইবার সংবাদ সবিস্তারে লিখিলেন আর জানাইলেন, 'এখন আপনি যদি একবার আসেন তবে ভাল হয়।' পরে শ্রীগোসাঈঁ শ্রীনাথ-দ্বারে আসিলেন, তখন সেইসব বাঙ্গালী তাঁহার কাছে আসিল। তখন তাহারা গোসাঈঁজীকে বলিল, 'মহাপ্রভু শ্রীআচার্যজী আমাদিগকে সেবাতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এখন কৃষ্ণদাস আমাদিগকে তাড়াইলেন!' তখন গোসাঈঁজী বলিলেন, 'আগুন লাগিয়াছে বলিয়া তোমরা সেবা ছাড়িয়া (নিজ নিজ কুটীরের দিকে) গেলে কেন? দোষ তো তোমাদের, তাই এখন আর তোমাদিগকে সেবার কাজে রাখিব না।'

তখন সেইসব বাঙ্গালী বহু মিনতি করিতে লাগিল 'মহারাজ এখন আমরা খাইব কি?' তখন গোসাঈঁজী তাহাদিগকে নাথজীর সেবার পরিবর্তে মদনমোহনজীর সেবাতে নিযুক্ত করিলেন, এবং কহিলেন যে ইঁহার সেবা তোমরা করিও এবং যাহা (ভেট) আসিবে তাহা খাইবে। তখন সেইসব বাঙ্গালীরা মদনমোহনজীর সেবা করিতে লাগিলেন ও গোবর্ধনে বাস উঠাইয়া দিলেন। তারপর শ্রীনাথজীর সেবাতে গুজরাতী ব্রাহ্মণেরাই "ভীতরিয়া" নিযুক্ত হইলেন। (এই পর্যন্ত একেবারে অবিকল অনুবাদ। ইহার পরে মর্মানুবাদে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে)[৮]

হয়তো ইহাতে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে মদনমোহন বল্লভ-সম্প্রদায়ের মন্দির। আসলে মদনমোহন ঠাকুর শ্রীসনাতনের প্রতিষ্ঠিত। বৃন্দাবন হইতে পরে এই ঠাকুর জয়পুর করৌলীতে নীত হয়। সেখানেও মদনমোহনের সেবকেরা সব বাঙ্গালী। হয়তো শ্রীসনাতনই বিপন্ন বাঙ্গালী সেবকদের মদন-মোহনের সেবায় নিযুক্ত করেন।

এই কৃষ্ণদাস অধিকারী পরে একবার আগরা গিয়া এক নর্তকীর নৃত্যগীতে প্রসন্ন হইয়া তাহাকে দশটি মুদ্রা দিয়া কহিলেন, "রাত্রিতে তোমাদের দলবল

লইয়া আমার বাসাতে আসিও।" এক প্রহর রাত্রিতে তাহারা আসিল। নৃত্যগীত হইল। কৃষ্ণদাসের খুব ভাল লাগিল। নর্তকীকে একশত টাকা দিয়া কৃষ্ণদাস কহিলেন, "তোমার নৃত্যগীত চমৎকার।" কৃষ্ণদাস তাহাকে পূরবী রাগে একটি পদও শিখাইলেন এবং তাহাকে লইয়া নাথ দ্বারে গেলেন। ঠাকুরের উত্থানের সময় কীর্তনীয়াদের ডাকা হইল না, ঐ নর্তকীরই নৃত্যগীত চলিল। কৃষ্ণদাসের আগ্রহে শ্রীনাথজীও ঐ বাঈজীকে অঙ্গীকার করিলেন।

সেই গঙ্গাবাঈর সঙ্গে কৃষ্ণদাসের বহু প্রীতি ছিল। গোসাঈঁজীর তাহা ভাল লাগিত না। একদিন ভোগের সময় গঙ্গাবাঈর দৃষ্টি পড়াতে শ্রীনাথজী খাইলেন না। নিদ্রিত ভাতরিয়া সেবককে শ্রীনাথজী লাথি মারিয়া জাগাইয়া কহিলেন, "আমার খাওয়া হয় নাই।" গোসাঈঁজী খবর পাইয়া স্নান করিয়া পাক করিলেন ও ভোগ সরাইলেন। ভোগ অতি অপূর্ব হইল। কৃষ্ণদাস তখন দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি বলিলেন, "আপনি নিজেই ভোগ প্রস্তুত করিলেন, আপনি নিজেই তাহা খাইলেন, ইহাতে উত্তম কেন না হইবে"? গোসাঈঁজী হাসিয়া কহিলেন "তোমার জন্যই এই কর্মভোগ।"

এই কথাতে কৃষ্ণদাস চটিলেন। গোসাঈঁজীকে আর গোবর্ধন পর্বতের উপর মন্দিরে যাইতে নিষেধ করিলেন। যদিও গোসাঈঁজী শ্রীনাথদ্বারের প্রতিষ্ঠাতা বল্লভাচার্যের পুত্র, তবু তিনি অধিকারীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেন না। কিন্তু তিনি মনে বড় ব্যথা পাইলেন। এই খবর বীরবলের কানে গেল; তিনি বলিলেন, "আমি এখন যাইয়া কৃষ্ণদাসকে তাড়াইয়া দিব।" বীরবল কৃষ্ণদাসকে বন্দী করিলেন। পরম বৈষ্ণব গোসাঈঁজী তাহা শুনিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন। কহিলেন "হায় হায় মহাপ্রভুর সেবকদের এইরূপ দুঃখ সহিতে হইল!" কৃষ্ণদাসকে না দেখিলে তিনি আর ভোজন করিবেন না শুনিয়া বীরবল কৃষ্ণদাসকে ছাড়িয়া দিলেন। কৃষ্ণদাস আসিয়া গোসাঈঁজীকে দণ্ডবৎ করিয়া নূতন গান রচনা করিয়া তাঁহার স্তবগান করিলেন।*

কৃষ্ণদাস বহু বৎসর ধরিয়া মন্দিরের অধিকার চালাইলেন। একবার একজন ভক্ত আসিয়া কৃষ্ণদাসকে একটি কূপ খনন করাইতে তিনশত টাকা দিলেন। তাঁহার সময় ছিল না বলিয়া ভক্তটি কৃষ্ণদাসকেই টাকাটা বুঝাইয়া দিয়া সব ভার দিয়া চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণদাস দুইশত টাকা দিয়া কূপ করাইলেন একশত টাকা বৃক্ষতলে পুঁতিয়া রাখিলেন। কূপ সমাপ্ত হইলে একদিন কৃষ্ণদাস তাহা দেখিতে গেলেন। কূপের মুখে লাঠিভর করিয়া দেখিতেছেন এমন সময় হঠাৎ

লাঠি সরিয়া গেল, কৃষ্ণদাস কূপে পড়িয়া গেলেন। এই খবর শুনিয়া রামদাসজী বলিলেন "অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ" অর্থাৎ তামসিক লোকের অধোগতিই হয়। গোসাঙ্গিজী বলিলেন, "রামদাস, এমন কথা মুখে আনিতে নাই।"[১০]

এখানে একটি কথা উল্লেখ করার যোগ্য। শ্রীনাথজীর সেবাতে যে সব বাঙ্গালী বৈষ্ণব ছিলেন তাঁহারা সবাই ব্রাহ্মণ। কিন্তু উল্লিখিত বৈষ্ণব বার্তায় তাঁহাদিগকে কোথাও বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণ বলা হয় নাই। উপেক্ষার সহিত "বংগালী" মাত্র বলা হইয়াছে। অথচ অন্য দেশীয় বৈষ্ণবদের পরিচয় দিতে গিয়া ব্রাহ্মণাদি শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে।

প্রমাণ-পঞ্জী

১ বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী, পৃ ৪৬৭

২ চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্যখণ্ড, ১৭শ পরিচ্ছেদ

৩ বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী, পৃ ২১৬

৪ কাষ্টস এণ্ড ট্রাইব্‌স্‌ অব সাদার্ণ ইণ্ডিয়া—থার্সটন, পৃ ২৯৭

৫ বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী, পৃ ২১৪

৬ ভক্তমাল, মীরা-চরিত টীকা

৭ মৈত্রেয়োপনিষৎ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৪, ৫—অটো স্ক্রাডর সংস্করণ

৮ চৌরাশী বার্তা, কৃষ্ণদাস অধিকারী তিনকী বার্তা, প্রসঙ্গ ২

৯ চৌরাশী বার্তা প্রসঙ্গ ৭

১০ চৌরাশী বার্তা প্রসঙ্গ ৮

গৌড়ীয় সংস্কৃত বৈষ্ণব সাহিত্য

বাংলার কৃষ্ণভক্তি অতি প্রাচীন। যদি পাহাড়পুরের প্রাপ্ত মূর্তিতেই তাহার আরম্ভ ধরা হয় তবু তাহা হাজার দেড়েক বৎসর আগেকার। বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের বিশেষত্ব হইল তাহার চৈতন্য যুগ। কাব্য, নাটক, দর্শন, সিদ্ধান্ত, রসগ্রন্থ, এমন কি ব্যাকরণ পর্যন্ত কত যে গ্রন্থ কত মহা মহা পণ্ডিত সব রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। বাংলা গ্রন্থগুলি বাঙ্গালীর জন্য, বৃহত্তর বঙ্গের পক্ষে তাহার উপযোগ তেমন নয়। তাই আজ সংস্কৃত গ্রন্থের কথাই বলিব।

চৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্বেও জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস গানে গানে লোকচিত্ত প্লাবিত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে জয়দেবের গীতগোবিন্দ সর্বভারতে সমাদৃত। বাংলার বৈষ্ণব মতে প্রদেশান্তরের প্রভাব থাকিলেও, সর্বপ্রদেশে বৈষ্ণব গানের প্রভাবের মূলে বাংলার গীতগোবিন্দ।

রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী এই দুই ভাই, ইঁহাদের ভাইপো জীব গোস্বামী। তারপরই উল্লেখযোগ্য নাম কবিরাজ কৃষ্ণদাস, কবিকর্ণপুর, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি মহাপুরুষদের। ইঁহাদের প্রত্যেকে পাণ্ডিত্যের অতল সাগর। কত গ্রন্থ যে ইঁহাদের রচিত তাহা কি সামান্য সময়ের মধ্যে বলা চলে?

জীব গোস্বামী তাঁহার লঘুতোষিণীর শেষাংশে বহু গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম দিয়াছেন।

জীব গোস্বামীর অতুল কীর্তি তাহার ষট্ সন্দর্ভ। তাহাতে তত্ত্ব, ভাগবত, পরমাত্মা, শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তি ও প্রীতি সম্বন্ধে ছয়টি সন্দর্ভ। গোপাল ভট্ট গোস্বামীর লিখিত গ্রন্থের উপর আধার করিয়াই এই বিরাট গ্রন্থখানি লেখা। ইহারই অনুব্যাখ্যা সর্বসংবাদিনী গ্রন্থও জীব গোস্বামীর। গোপাল চম্পূ গ্রন্থখানি জীব গোস্বামীর রচনা। শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মসংহিতা, উজ্জ্বল নীলমণি ও ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থের উত্তম টীকা তিনি রচনা করেন।

বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থখানি সনাতনের লেখা। তাঁহারই লিখিত হরিভক্তি-বিলাস সকল বৈষ্ণব জনের নিত্য জীবনের পথপ্রদর্শক। লঘু হরিনামামৃত ব্যাকরণখানিও সনাতনের। ইহারই উপর আশ্রয় করিয়া পরে জীব গোস্বামী

আরও বড় হরিনামামৃত ব্যাকরণ রচনা করেন। সনাতন লিখিত সিদ্ধান্ত গ্রন্থগুলি বাংলার বৈষ্ণবের প্রাণ।

রূপ গোস্বামীর লেখা হংসদূত। তাঁহার বিদগ্ধ মাধব, ললিত মাধব প্রভৃতি বহু চমৎকার সব রসগ্রন্থ আছে। উজ্জ্বল নীলমণিতে রূপ গোস্বামী প্রেমের যে বিচিত্র প্রকার ভেদ দেখাইয়াছেন, তাহার তুলনা আর কোনো দেশের গ্রন্থেই পাই না। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও নাটকচন্দ্রিকা বিখ্যাত গ্রন্থ।

চৈতন্য চরিতামৃত বাংলাতে লেখা হইলেও তাহার অর্ধেক সংস্কৃত। গোবিন্দ লীলামৃত প্রভৃতি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ কৃষ্ণদাস গোস্বামীর রচিত। ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। গোপালভট্ট সম্প্রদায়ের গুণমঞ্জরীদাস গোস্বামীর পুত্র রাধাচরণ ইহার হিন্দী অনুবাদ করেন।

সংস্কৃত চৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য কবিকর্ণপুরের লেখা। কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী ও অলঙ্কারকৌস্তভও তাঁহারই রচিত। কবিকর্ণপুরের আনন্দ-বৃন্দাবন চম্পূ বাংলার বাহিরেও যথেষ্ট সমাদৃত।

বলদেব বিদ্যাভূষণের প্রসিদ্ধ কীর্তিগ্রন্থ গোবিন্দভাষ্য কেমন করিয়া রচিত হইল তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহারই সংক্ষেপ তাঁহার সিদ্ধান্তরত্ন। রূপ গোস্বামীর স্তবমালা রচনার (১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দ) সময় তিনি বর্তমান ছিলেন। ইঁহার রচিত দশোপনিষদের ভাষ্য, গীতাভাষ্য, প্রমেয়রত্নাবলী পণ্ডিত সমাজে সমাদৃত। চৈতন্যামৃত ব্যাকরণ ও ব্যাকরণকৌমুদীও ইঁহার রচনা। উৎকলের বলেশ্বরের অন্তর্গত রেমুণার নিকট এক কৃষিজীবী খণ্ডাইত কুলে তাঁহার জন্ম। কাজেই তিনি ব্রাহ্মণ নহেন। তবু বহু ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্য ছিলেন। বৈরাগী পিতাম্বর দাস তাঁর ভক্তি শাস্ত্রের গুরু। কনোজীয় ব্রাহ্মণ রাধাদামোদর দাস তাঁর দীক্ষা গুরু।

কেহ কেহ মনে করেন বেদান্তস্যমন্তক তাঁহার লেখা। কিন্তু তাহার লেখক বলদেবের গুরু রাধাদামোদর। স্যমন্তক গ্রন্থেই পাই—

রাধাদি দামোদর নাম বিভ্রাতা
বিপ্রেণ বেদান্তময়ঃ স্যমন্তকঃ—ইত্যাদি

বৃন্দাবনে অনেকের বিশ্বাস রাধাদামোদর বলদেবের শিষ্য। কিন্তু তাঁহার স্বলিখিত সিদ্ধান্তরত্নাকরের অষ্টম পাদের ৩৪ শ্লোকের টীকায় স্পষ্ট লেখা তিনি বলদেবের গুরু।

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সংস্কৃত গ্রন্থমালার ১৮৭ সংখ্যক পুস্তক প্রমেয়-রত্নাবলীর ভূমিকায় শ্রীযুত অক্ষয়কুমার শর্মাশাস্ত্রী মহাশয় বলদেবের বৈশ্যত্ব মানেন নাই। তিনি বলেন বলদেব ছিলেন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। কিন্তু এই বিষয়ে আমরা বৈষ্ণবদের বর্ণিত কথাই গ্রহণ করিলাম, এবং বৈষ্ণব ধর্মে জন্মের জন্য কিছু আসে যায় না, সেখানে ভক্তিই প্রধান কথা।

বলদেবের সমসাময়িক অনূপনারায়ণ শিরোমণি বেদান্ত সূত্রের উপর সমঞ্জস বৃত্তি লেখেন। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি ইহা লেখা।

উজ্জ্বল নীলমণির একখানি উৎকৃষ্ট টীকা বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর কৃত। তাঁহার কৃষ্ণভাবনামৃতও বৈষ্ণব সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহার রচিত প্রায় ২৫খানি সংস্কৃত গ্রন্থ। তাঁহার কৃত ভাগবত টীকা সারার্থদর্শিনী গুজরাত প্রদেশে বিশেষ সমাদৃত। ইহা ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হয়। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী হরিবল্লভ নামেও প্রসিদ্ধ।

বৈষ্ণবেরা যেমন তাঁহাদের সম্প্রদায়ের জন্য হরিনামামৃত, চৈতন্যামৃত প্রভৃতি ব্যাকরণ লিখিয়াছেন বাঙ্গালী শৈবেরাও তাহার পালটা গাহিয়াছেন। বলরাম পঞ্চানন নামে এক পণ্ডিত প্রবোধপ্রকাশ নাম দিয়া এক শৈব ব্যাকরণ রচনা করেন।

সংস্কৃত না হইলেও এইখানে ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থখানির কথা না বলিয়া পারিলাম না। বইটি বাংলা, নরহরি চক্রবর্তীর লেখা। ইহা কতকটা এন্‌সাই-ক্লোপিডিয়া ধরণের বই। তাহাতে অনেক বৈষ্ণব ও ভক্তের পরিচয়, নায়ক নায়িকা ভেদ, রাগ রাগিণীর লক্ষণ প্রভৃতির কথা সুন্দরভাবে বর্ণিত।

এইরূপ এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার মত বই ইহার পূর্বে লিখিয়াছেন পারস্যদেশ হইতে আগত মীর্জা খান ইব্‌ন ফকরুদ্দীন মহম্মদ। পুস্তকখানি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই লেখা। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক স্নেহভাজন মৌলানা জিয়াউদ্দীন ইহার কতক অংশ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার ব্যাকরণ ও অভিধান হইতে প্রাচীনতর ব্রজভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান আর দেখি নাই। রাগ রাগিণী ও নায়ক নায়িকা পরিচয় ভাগ তাঁহার খুবই বিশদ। মীর্জা খাঁর পুস্তক বিশ্বভারতী হইতে সম্পাদিত হইয়াছে।

গীত চন্দ্রোদয় নামে নরহরির একখানা সঙ্গীত সংগ্রহ পুস্তকও ত্রিপুরারাজ-পুস্তকালয়ে পাওয়া গিয়াছে।

নরহরির বৃন্দাবন বর্ণনায় তখনকার দিনের বৃন্দাবনের একটি ভক্তি রসার্দ্র চিত্র পাওয়া যায়।

নরহরি সঙ্গীত শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ও পারিভাষিক দিকটা কিরূপ ভাবে জানিতেন তাহা তাঁহার ভক্তি-রত্নাকরের পঞ্চম তরঙ্গ দেখিলেই বুঝা যায়। এই গ্রন্থখানি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম অংশে লেখা।

পূর্বেই বলা হইয়াছে ভক্তি-রত্নাকর হইতে অন্যূন পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে লিখিত মীর্জা খাঁর বিখ্যাত কোষগ্রন্থ, তুহফাতুলহিন্দ বা ভারতের উপহার। তাহাতে বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্ব ও ব্রজভাষার পরিচয় মেলে। তাহারও বহু পূর্বে, ১৫৮৩ খ্রীঃ মুসলমান কবি আলিম তাঁহার মাধব নাল সঙ্গীত গ্রন্থ লেখেন। তাহারই অংশ গ্রন্থ সাহেবের পরিশিষ্টে রাগমালা রূপে গৃহীত হইয়াছে।

বাংলার ব্রজবুলি সাহিত্য

বাংলাতে আর এক অপূর্ব বস্তু তাহার ব্রজবুলি সাহিত্য। ব্রজধাম বাঙ্গালী বৈষ্ণবের কল্পলোক। সেখানকার নামে মৈথিল বাংলা সংস্কৃত মিশাইয়া একটি বিশেষরূপ কবিতার ভাষা বাংলার বৈষ্ণব কবিরা সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন। আসামে ও উড়িষ্যায়ও এই ব্রজবুলির ধুম লাগিয়াছিল। ইহাতে ব্রজভাষারও একটু রসান দেওয়া হইয়াছিল। সর্ব ভারতের পরিচিত শৌরসেনীর একটি রূপ অবহট্ট। বিদ্যাপতির কীর্তিলতায় তার প্রভাব দেখা যায়। ব্রজবুলির মূলে এই সব আছে।

এই বিষয়ে আমাদের বন্ধু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেন যে চমৎকার গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহার পর আর আমাদের নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই। তাঁহার বইখানির নাম এ হিষ্টরি অব ব্রজবুলি লিটারেচার—গ্রন্থখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত।

তাঁহার ব্রজবুলি কবিদের তালিকায় দেখি প্রথমেই যশোরাজ খাঁর নাম (১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ), তারপরই বিদ্যানগরের রায় রামানন্দ (১৫১৫-১৫৩০), তারপর মহাপ্রভুর সমকালীন, শ্রীহট্টের মুরারি গুপ্ত। বৃন্দাবনের গোপালভট্ট গোস্বামী ও বংশীবদন দাস বিখ্যাত পদকর্তা, শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ও ভক্তিরত্নাকর প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তী। বাসুদেব ঘোষ বহু পদের রচয়িতা। কুলীন গ্রামের মালাধর বসু, বাসুদেব-ভ্রাতা গোবিন্দ ঘোষও অনেক পদ রচনা করিয়াছেন।

মহাপ্রভুর শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই ব্রজবুলি পদকর্তা। কয়জনের নাম আর করিব? শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দও এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণদাস

কবিরাজও একজন। গোবিন্দদাস, রায় শেখর, রাধাবল্লভ দাস, যদুনন্দন দাস, ঘনশ্যাম দাস, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, ঘনরাম দাস, রাধামোহন ঠাকুর, উদ্ধব দাস, বৈষ্ণব দাস প্রভৃতি কবির পরিচয় সুকুমার সেন মহাশয় দিয়াছেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, রায় রামানন্দ প্রভৃতি সংস্কৃতেও মহাপণ্ডিত ছিলেন। গোপাল ভট্ট হিন্দীরও মহাকবি।

এই ব্রজবুলিতে এখনকার দিনের বঙ্কিমচন্দ্রও লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহের কবিতা এখনকার দিনের ব্রজবুলির উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

বাংলার ব্রজবুলিপদ গুজরাতে, সিন্ধে, রাজস্থানে, পঞ্চনদ প্রদেশে বৈষ্ণবদের মধ্যেও সমাদৃত।

হিন্দী সাহিত্যে গৌড়ীয় প্রভাব

পূর্বেই রাধাবল্লভী হিত-হরিবংশীয় সম্প্রদায়ের কথা হইয়াছে। তাঁহাদের ও টাট্টী সম্প্রদায়ের ভাবধারার উপর চৈতন্যমতের বিস্তর প্রভাব। কাজেই তাঁহাদের লেখা হিন্দী সাহিত্যে মহাপ্রভুর প্রভাব আছে। তাহা ছাড়া খাস চৈতন্যমতেরও ভাল ভাল হিন্দী কবি আছেন।

দক্ষিণদেশীয় বিপ্র গদাধরভট্ট ছিলেন মহাপ্রভুর একজন প্রিয় সহচর। ইঁহার মুখে মহাপ্রভু ভাগবত শুনিতে ভালবাসিতেন। ইঁহার লেখা এমন বহু হিন্দীপদও আছে যাহা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে।

কথিত আছে তাঁহার রচিত "সখী হোঁ শ্যাম রংগ রংগী" কবিতাটি সাধুমুখে শুনিয়া জীব গোস্বামী তাঁহাকে এই শ্লোকটি লিখিয়া পাঠাইলেন—

অনারাধ্য পদাম্ভোজ যুগ্ম
মনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎ পদাঙ্কাম্।
অসংভাষ্য তদ্ভাব গম্ভীরচিত্তান্
কুতঃ শ্যামসিন্ধোঃ রসস্যাবগাহঃ॥

অর্থাৎ শ্রীরাধার পাদপদ্ম আরাধনা না করিয়া, তাঁহার চরণাঙ্কিত শ্রীবৃন্দাবন আশ্রয় না করিয়া, তাঁহার ভাবে ভাবুক গম্ভীরচিত্ত ভক্তদের সম্ভাষণ না করিয়া, কেমনে শ্যামসিন্ধুর রসে অবগাহন হইবে?

ইহার পরই তিনি বৃন্দাবনে আসেন ও মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হন। ইনি হিন্দীতেও বহু কবিতা রচনা করিয়াছেন। নাভাজী ও প্রিয়াদাস উভয়ে ইঁহার

জীবনী দিয়াছেন। ইনি যে মহাপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন তাহা না জানায় মিশ্রবন্ধুরা ইহার সময় দিয়াছেন ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দ (১৭২২ সংবৎ)। প্রয়াগ সাহিত্য সম্মেলন ব্রজমাধুরীসারের মধ্যে ইহার কিছু হিন্দী কবিতা ছাপা হইয়াছে। ইহার বংশধরগণ বৃন্দাবনবাসী। তাঁহারা হিন্দী বলিলেও বাংলা বেশ জানেন। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গেও ইহাদের বিলক্ষণ যোগ আছে।

সুকুমার সেন মহাশয় মনে করেন ব্রজবুলিপদ লেখক নন্দদাস (১৫৬৭ কাছাকাছি) ছিলেন বল্লভপুত্র বিঠ্ঠলের শিষ্য। ইনি ঐ দেশেরই লোক।

সুরদাস মদনমোহন একজন ভাল হিন্দী কবি। ইহার অনেকপদ আসল সুরদাসের কবিতার সঙ্গে গোল পাকাইয়া গিয়াছে। ইহার নাম ছিল সুরধ্বজ, মদনমোহন তাঁহার উপাস্য। উপাস্য নাম নিজ নামে যুক্ত করিয়া ইনি ভণিতা দিয়াছেন। ইনি চৈতন্য সম্প্রদায়ী। মিশ্রবন্ধুরা ইহাকে মদনমোহনের শিষ্য বলিয়া লিখিয়াছেন। মহাপ্রভুর তিরোভাবের পূর্বেও ইহার কবিতা রচিত হইয়াছে। ইনি অত্যন্ত উদার দাতা ও সাধু-সেবাপরায়ণ ছিলেন। ইহার রচিত গান গৌরগোবিন্দ নবল কিশোর ভক্তদের মধ্যে প্রসিদ্ধ।

বুন্দেলখণ্ড ওরছাবাসী সনাঢ্য ব্রাহ্মণ হরিরাম ব্যাস গৌরাঙ্গ মতে দীক্ষিত হইলেও পরে হিত হরিবংশের শিষ্য হন। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি ইহার সব পদ রচিত। গৌড়ীয় মতের সঙ্গে তথাপি ইহার বংশীয়গণ যোগরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের তিলকই ধারণ করেন। ইহাদের প্রভাবে বুন্দেলখণ্ডে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।

শ্রীঅলবেলীঅলী সখীভাবের উপাসক। ভক্তমালে ইনি উল্লিখিত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি জীবিত ছিলেন। ইনি বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের লোক। তবে চৈতন্যমতের দ্বারা প্রভাবিত।

হরীজী হিত-হরিবংশের সম্প্রদায়গত। শ্রীরাধা সম্বন্ধে ইহার লেখা বৈষ্ণব জনের আদৃত।

ললিতকিশোরীর আসল নাম কুন্দনলালজী। ইহার ভাইও ললিতমাধুরী নামে পরিচিত। ইহার গুরু শ্রীরাধারমণীর গোস্বামী রাধাগোবিন্দজী। ইহার রচিত ব্রজভাষার গদ্য ও পদ্য উভয়ই সুন্দর। ইহারা সকলেই চৈতন্যমতের দ্বারা প্রভাবিত। ইহাদের কবিতার কিছু সংগ্রহ ব্রজমাধুরীসারে ছাপা হইয়াছে।

এই সঙ্গে টাট্টী সম্প্রদায়ের সহচরী শরণের, বিঠ্‌ঠলবিপুলের[১] বিহারিণী-দাসের নামও করা উচিত। শীতলস্বামীও এই সম্প্রদায়ের।

১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি ভগবতরসিকজীর জন্ম। ইঁহার গুরু টাট্টীসম্প্রদায়ের ললিতমোহিনী দাস। টাট্টীসম্প্রদায়ের মোহান্ত পদের জন্য ইঁহারই দাবী ছিল। কিন্তু ভগবতরসিকজী সেই দিকে না গিয়া ভজন সাধন লইয়াই রহিলেন। তাঁহার রচিত ভক্তনামাবলীতে প্রায় প্রথম দিকেই গৌড়ীয় ভক্তদের নাম।

নিত্যানন্দ অদ্বৈত মহাপ্রভু সচী-সুৱন চৈতন্যা।
ভট্টগুপাল রঘুনাথগুসাঈঁ মধুগুসাঈঁ ধন্যা॥
রূপসনাতন ভজি বৃন্দাবন ভজি দারাসুত সংপতি
ইত্যাদি।

প্রায় সওয়া শত বৎসর পূর্বে পাঞ্জাব, রাওলপিণ্ডি জেলায় নারায়ণ স্বামীর জন্ম। ইনি সারস্বত ব্রাহ্মণ। অল্প বয়সে ইনি বৃন্দাবন যান, গৌড়ীয় মতে আকৃষ্ট হইয়া ইনি লালাবাবুর মন্দিরে সেবার কাজ গ্রহণ করেন। ক্রমে ইঁহার গান রচনাশক্তি বিকশিত হয়। ইঁহার রচিত ভক্তির গানে টিকারীর মন্দিরে রাসলীলা অভিনীত হইত। পরে ইনি মন্দিরের কাজ ছাড়িয়া দিয়া ভজনসাধন লইয়াই থাকেন। ইঁহার বহু বহু শিষ্য সেবক ছিলেন। তার মধ্যে প্রধান অমৃতসরের ঠাকুর মহান চন্দ্রজী ও জালন্ধরের লালা বসন্ত রায়জী। বিখ্যাত বৈষ্ণব রসবক্তা পণ্ডিত দীনদয়ালজীও ইঁহার অন্তরঙ্গ মিত্র।[৩]

হিন্দী কবিদের মধ্যে কয়জন নাগরীদাসের নাম পাই। একজন বল্লভ মতের, তাঁর নাম চৌরাশী বৈষ্ণব বার্তার মধ্যে আছে। দ্বিতীয় জন স্বামী হরিদাসের সম্প্রদায়ের। তৃতীয় জন হিত হরিবংশ সম্প্রদায়ের। চতুর্থ জন মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের। আরও নাগরীদাস আছেন।

ভক্ত গুণমঞ্জরী দাসের আসল নাম গোস্বামী গল্লূজী। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনে ইহাঁর জন্ম। ইঁহারা গোপালভট্ট শাখার। ইঁহার পদ হিন্দী সাহিত্য-রসিকদের বিশেষ সমাদৃত। ইঁহারই পুত্র ভক্ত রাধাচরণ গোস্বামী পরম পণ্ডিত ও ভাগবত। তিনি চৈতন্যচরিতামৃত বাংলা হইতে হিন্দীতে অনুবাদ করেন।

ইহার নবভক্তমালে বহু চৈতন্যমতের ভক্তের পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে তিনি একবার সভাপতি হইয়াছিলেন।

মহাপ্রভু সম্বন্ধে গুণমঞ্জরী দাসের প্রসিদ্ধ সঙ্গীত,

দেখো আলী গৌর মেঘ উল্লাস।
শ্রীঅদ্বৈত পরন পুররাঈ করুণা বিজুরি বিলাস॥
... ...
শ্রীবৃন্দাবন প্রেমসিন্ধু মিলি গুণমংজরী সুখবাস॥

গানটি পুরা উদ্ধৃত করার স্থান নাই।

গোপালভট্ট শাখার একজন মহাপুরুষ ছিলেন মধুসূদন গোস্বামী। ইহারা সবাই চমৎকার বাংলা জানিতেন। ইনি জ্ঞানের বিকৃতি নামে একখানি বাংলা বিচার-গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনের রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের সাহিত্যেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের বিশেষ প্রভাব। তাঁহারা নিত্যানন্দের মতেরই অধিক অনুরক্ত। তাঁহাদের ভাবতন্ত্রের ভাব, রাধা আগে, কৃষ্ণ পরে।

বেশি দিনের কথা নয় জয়পুরের পানদরিবাবাসী বৈষ্ণব কবি সরস মাধুরী বিস্তর গৌড়ীয় ভাবের ও চৈতন্য মহাপ্রভুর বিষয়ে পদ রচনা করিয়াছেন। তিনি পরলোকগত হইলেও তাঁহার পুত্র পণ্ডিত রাধেশ্যামজী এখনও জীবিত।

হাথরাসের বৈষ্ণব কবি রত্নেশ্বর দয়ালের বিষয়েও এই কথাই বলা চলে। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে তাঁহার চমৎকার সব পদ আছে। ইনি পূর্বে মুনসরিম অর্থাৎ দেওয়ানী বিচারক পদে আসীন ছিলেন। পরে অবসর গ্রহণ করিয়া জেলা আলিগড়ের অন্তর্গত আতরোলী গ্রামে, সাহুকার মহল্লায়, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কুটীরে বাস করেন।

বৈষ্ণব সমাজের বাহিরে শ্রীযুত শম্ভুনাথ মিশ্র কবিতা কৌমুদীর যে সপ্তম ভাগ সম্পাদন করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় বাংলা কাব্যে তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার আছে।

কাকরী ঘটনার নায়ক রামপ্রসাদ "বিসমিল" খাসা বাংলা বলিতে ও লিখিতে পারিতেন।

বিখ্যাত হিন্দী কবি "নিরালা"র আসল নাম সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী। তাঁহার জন্ম

শিক্ষাদীক্ষা মেদিনীপুর মহিষাদলে। তাঁহার পিতা মহিষাদলের রাজকর্মচারী ছিলেন।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয় শক্তিশালী। গুজরাতেও বহু বাংলা সাহিত্যরসিকের বাস। তাঁহাদের মধ্যে করুণাশঙ্কর কুবের ভট্ট বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রমাণ-পঞ্জী

১ সিদ্ধান্তরত্ন দ্বিতীয় খণ্ড। ভূমিকা—গোপীনাথ কবিরাজঃ নিত্যানন্দ হইতে তাঁহার পীঢ়ী বা গুরুপরম্পরা—নিত্যানন্দ গৌরীদাস পণ্ডিত, হৃদয়চৈতন্য—শ্যামানন্দ (জাতিতে সদ্‌গোপ)। রসিকানন্দ (জাতিতে করণ)। রাধানন্দ (জাতিতে ঐ)। নয়নানন্দ (ঐ)।

রাধাদামোদর, বলদেব বিদ্যাভূষণ

২ জন্মনা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণকুল মলঙ্কার, ভূমিকা পৃ ৮

৩ ব্রজমাধুরীসার, পৃ ৫১৫

হিন্দী হইতে অনুবাদ

বাংলাতেও হিন্দী হইতে তখনকার দিনে ভাল পুস্তকের অনুবাদ করা হইয়াছে।

পদ্মাবতী কাব্যটি লেখা হয় ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে। লেখক মালিক মুহম্মদ জায়সী ছিলেন অযোধ্যা জায়সবাসী। ইনি বিশতিয়া সাধক মহীউদ্দীনের শিষ্য। ইঁহার শিক্ষাগুরুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও আছেন। ইঁহার লেখার মধ্যে গভীর ভক্তি ও যোগের তত্ত্বকথা গল্পাকারে বলা। এই পুস্তকের খ্যাতি বাংলা ছাড়াইয়া আরাকানে পৌঁছিল। সেখানকার রাজা মাগন ঠাকুরের অনুরোধে ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি আলাউল ইহার বাংলা অনুবাদ করেন। মাগন ঠাকুর ধর্মে মুসলমান ছিলেন। এই পুস্তকখানি অপূর্ব ধর্মপুস্তক। সাম্প্রদায়িকতার নামগন্ধ ইহাতে নাই।

নাভাজীর অপূর্ব ভক্তচরিত হিন্দী ভক্তমাল। প্রিয়াদাসের টীকা ভক্তিরস-বোধিনী। তাহাতে আরও অনেক ভক্তের নাম দেওয়া হইয়াছে। বাবাজী কৃষ্ণনাথ তাহাতে আরও কিছু যুক্ত করিয়া বাংলা অনুবাদ করিয়াছেন।

শ্রীহট্টী নাগরীতে ও মুসলমানী কেচ্ছা কহানীতে বহু হিন্দী, উর্দু ও পারসী গ্রন্থের অনুবাদ পাওয়া যায়।

বাংলা রামায়ণ গায়কেরা তুলসীদাসের রামায়ণের বাংলা পালা কোথায় পাইয়াছিলেন জানি না কিন্তু ইহা দেখিয়াছি যে তুলসীদাসের রামায়ণের অনুবাদ বাংলাতে কোথাও কোথাও গীত হইত। ১৮৯৩ সালে কাশীর মদনপুরাস্থ কাকিনার রাজার ছত্রে একজন পঞ্চকোটের গায়ক রামায়ণ গান করেন। তাহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ যে নহে তাহা সকলেই বুঝিলেন। কেহ কেহ বলিলেন তাহা তুলসীদাসী বাংলা। আমরা তখন বালক। কয়দিন পরে কাশীর বিখ্যাত শিক্ষাগুরু শ্রীযুত চিন্তামণি মুখোপাধ্যায়ের অগ্রজ ভূতনাথ বাবুর উদ্যানে সেই গান আবার গীত হয়। তাহাতে মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয়কে আনা হয়। তিনি বাংলা শুনিয়াই বলিলেন ইহা তুলসীদাসী রামায়ণের অনুবাদ।

পরে এই গ্রন্থের (তুলসীদাসের) কয়েকটি অনুবাদ হইয়াছে। একটি পুরুলিয়ার মদনমোহন চৌধুরী মহাশয় কৃত। সর্বশেষ অনুবাদ খাদিপ্রতিষ্ঠানের সতীশ দাশগুপ্ত মহাশয়ের।

লক্ষ্মণসেন-পদ্মাবতীর প্রেমকথা সুদূর রাজপুতনায় গিয়া পৌছিয়াছিল। রাজপুতনার বিখ্যাত কবি দামো (খ্রী ১৪৫৯) "লক্ষ্মণ সেন-পদ্মাবতী চউপঈ" নামে বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।[১]

অনুবাদ সাধনায় বাংলা

এখনকার দিনে বাংলার উপন্যাস, গল্প প্রভৃতি পুস্তক বাহির হইতে না হইতেই হিন্দী গুজরাতিতে অনুবাদ হয়। অনেক সময় তাঁহার খোঁজও গ্রন্থকাররা পান না। বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র সর্বপ্রদেশে ছড়াইয়াছে। বঙ্কিমের উপন্যাস গল্প তো গিয়াছেই। বাঙ্গালী কবিদের কবিতাও বাদ যায় নাই। আরও বহু বাংলা কাব্য সাহিত্য গ্রন্থও অন্যদেশে আমদানী হইয়াছে।

এক একজন অসংখ্য গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন। গুজরাতের নারায়ণ হেমচন্দ্র এইরূপ একজন অনুবাদক। অনেকে আবার ভাল বাংলা না জানিয়াই অনুবাদ করিয়াছেন।

বাংলারও উচিত সর্বভাষার লেখকগণ হইতে তাঁহাদের নূতন পুরাতন সব কিছু অনুবাদ করা। শুধু দিব, নিব না, ইহাই কি ভাল? যে সব দেশে বাঙ্গালী থাকেন সেখানকার ধর্ম, সমাজ, রীতিনীতি, পুরাতন-সাহিত্য, সঙ্গীত, ভক্তচরিত, ভক্তবাণী সবই তাঁহাদের জানা উচিত। স্বধু লাভের জন্য নহে —ইহা হইল চারিদিকের সঙ্গে জীবন্ত যোগ ভাগ। গ্রীকেরা ভারতে আসিলেন —কত বিবরণই রাখিয়া গেলেন। চীনদের কত লেখা ভারত সম্বন্ধে। তিব্বতে, চীনে কত ভারতীয় গ্রন্থের অনুবাদ! অথচ ভারত চীন সম্বন্ধে কিছুই লেখে নাই। আরবেরা ভারতের কত বিবরণ দিয়াছেন; আমরা কিছুই দেই নাই। তাই আরবেরা জয়ী হইলেন, আর আমরা হইলাম পরাধীন।

অন্যদেশের সঙ্গে বাঙ্গালীর শুধু চাকুরীর যোগই প্রধান থাকিবে ইহা ভাল নয়। ইহাতেই বাঙ্গালী সবার চক্ষুশূল হইয়াছে।

চাকুরীর মায়া না থাকিলে এবং অর্থোপার্জনের অন্য পথ খুলিলে, সবার সঙ্গে যোগ বিশুদ্ধ হইবে তখন আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভাল করিয়া

জানিব, নিজ নিজ পরিচয় দিব ও নিব। ধর্মে, সাহিত্যে, দেশে সর্বভাবে এই পরিচয় চলিতে থাকিবে।

তখনই আমরা দেখিব সর্বপ্রদেশে একই ভাব ও আদর্শের সন্ধান যুগের পর যুগ চলিয়াছে। বাউলদের ভাষাতে তখন বলিব—

একই আকাশ ঘটে ঘটে।
একই গঙ্গা ঘাটে ঘাটে॥

তখন সকল দেশের সম্মিলিত মহাদরবারে প্রত্যেক প্রদেশের আপন আপন শ্রেষ্ঠ দানটি দিতে হইবে। কারণ তাহা আমার আপন বস্তু নয়। তাহা বিশ্বের ধন। তাই সবাই চাহিয়া আছে আমাদের দিকে আমরা আমাদের সেই শ্রেষ্ঠ সারবস্তু সবার দরবারে দিতেছি কি না। সবার যে দাবি আছে—

গোপালকে তোর দিতে হবে।
গোপাল যে জগতের নিধি
কেম্‌নে তারে রাখবি ধরে।
জগতেরই নিধি বলে দুর্লভ এই ধন
তোর আপন ঘরের নিধি হৈলে চাইতো বা কোন জন?
পারিস যদি দিবি মাগো দিবি হেসে হেসে।
না হয় তোর দিতে হবে আঁখির জলে ভেসে।
তবু দিতে হবে।

বাংলার ক্রোড়ে হিন্দী ও হিন্দুস্থানী ভাষা

বাঙ্গালী যে শুধু আপন ভাষারই সেবা করিয়াছে তাহা নহে। বাংলা দেশেই প্রথম হিন্দী পুস্তক ও সংবাদপত্র ছাপা হয়।

প্রথমে হিন্দী পুস্তক উর্দ্দু অক্ষরে ছাপা হইত। কিন্তু, হইত এই বাংলা দেশেই। তাঁহাদের মধ্যে মুনসী ইন্‌শা আল্লা খাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি কাশ্মীরী মুসলমান হইলেও তাঁর জন্ম মুর্শিদাবাদে। তাঁহার রাণী কেতকী কী কহানী ১৭৯৮—১৮০৫ মধ্যে লিখিত, এই কথা কেহ কেহ বলেন। কেহ কেহ বলেন, ১৮১৯ সালের কাছাকাছি ইহা লিখিত।

দেবনাগরী অক্ষরে যে হিন্দী গ্রন্থ প্রথম ছাপা হয়, তার মধ্যে রামচরণ

দাসের রামায়ণ টীকা লেখা হয় ১৭৮৭ সালে, কিন্তু তাহা মুদ্রিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। ইহার ভাষাও প্রাচীন যুগের হিন্দী।

বর্তমান যুগের ভাষাতে প্রথম গ্রন্থ লল্লূজী লালের প্রেমসাগর লেখা হয় ১৮০৩ সালে। সদল মিশ্রের নাসিকেতোপাখ্যানও লেখা হয় সেই বৎসর।

রামমোহন রায়ের বেদান্তসূত্রের হিন্দী অনুবাদ বাহির হয় ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে। এই হিসাবে বাঙ্গালী মনীষী রামমোহন হিন্দী ভাষার তৃতীয় লেখক। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে প্রথম দুই খানি পাঠ্য পুস্তক, প্রভুদের আদেশে লেখা। রামমোহনের গ্রন্থ প্রথম সংস্কৃতিমূলক লেখা, দার্শনিক আধুনিক হিন্দীর গ্রন্থ।

গোকুলনাথের মহাভারতের হিন্দী অনুবাদ ১৮২৯ সালে কলিকাতায় ছাপা হয়। বলা বাহুল্য তুলসীদাসের রামায়ণও প্রথমে বাংলা দেশেই বাহির হয়। লল্লূজী লালের প্রেস ছিল পটলডাঙ্গায়, সেখানে রামায়ণ ছাপা হয়। ১৮২৪ সালে সেই প্রেস তিনি আগরা লইয়া যান। কিন্তু তিনি পরলোক গমন করেন কলিকাতায়।

তখন দেখি চিৎপুর বটতলাতে বাংলা পুঁথির মত হিন্দী পুঁথিও সব ছাপা হইতেছে। ৩১৯ নং চিৎপুর রোডে বটতলার নৃত্যলাল শীলের কারখানায় ছাপা ও প্রকাশিত, বাঙ্গালী কর্মকার কর্তৃক কাঠের খোদাই সুশোভিত লল্লূজী লালের প্রেমসাগর দেখিয়াছি। তাহার শেষ পৃষ্ঠাতে ৭১ খানা হিন্দী পুস্তকের তালিকা ও মূল্য দেওয়া, যাহা তাঁহারা বিক্রয় করেন। তাহার মধ্যে গোপি-চংদভরথরি, তুলসী সতসই, তুলসীদাসের দোহাবলী, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও স্বয়ম্বর, প্রেমসাগর, বিহারী সতসই, ভরত মিলাপ, তুলসীকৃত রামায়ণ, গীতগোবিন্দ, সিংহাসন বত্তিসী, হাতেমতাই প্রভৃতি পুস্তকের নাম আছে।

ঐ সময় লল্লূজী লালের ছাপাখানা না থাকায় ৯৯নং আহিরীটোলার নৃত্যলাল শীলের দ্বারা মুদ্রিত। এখানে বলা ভাল লল্লূজী লাল হিন্দী ও ব্রজ ভাষাকে ভিন্ন মনে করিতেন। তাই তাঁর গ্রন্থের মুখপত্রে দেখি ইংরাজীতে লেখা আছে "প্রেমসাগর বিইং এ হিস্টরি অব কৃষ্ণ, ট্রান্সলেটেড ইন হিন্দী ফ্রম বঙ্গভাষা বাই লাল্লূজীলাল।" তাঁহার গ্রন্থের চতুর্দশ সংস্করণের মুখপত্রে ইহা আমি দেখিয়াছি।

সমাচার পত্র হিসাবেও প্রথম হিন্দুস্থানী ও ফার্সী সংবাদপত্র ১৮২২ সালে ২৮ মার্চ বাহির হয়। সরকারী কাগজ মতে ইহা বাহির হয় ১৮২৩ এপ্রিল মাসে। ইহার সম্পাদক ছিলেন লালা সদাসুখ। ১১ সার্কুলার রোড হইতে ইহা বাহির হইত।

মীরাৎউল আখবার বাহির করেন রাজা রামমোহন। ধর্মতলা ষ্ট্রীট হইতে ১৮২২ সালে ইহা বাহির হয়। স্বাধীনতাপ্রিয় কাগজ বলিয়া সংবাদপত্র আইন হইতেই ইহা উঠাইয়া দেওয়া হয়।

১৮২৩ সালে ৬ই মে লাইসেন্স অনুসারে দেখা যায় হিন্দুস্থানী ভাষায় শমৃস্ উল আখবার প্রকাশের অনুমতি প্রদত্ত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন মণিলাল ঠাকুর।

বঙ্গদূত বা বেঙ্গল হেরাল্ড ১৮২৯, ৫ই মে লাইসেন্স পায়। ইহা ইংরাজী, ফার্সী, বাংলা, নাগরী চারি ভাষার পত্রিকা।

এই চারিটি সংবাদপত্রের খবর শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় পাইয়াছি।[২]

১৮২৬ সালে প্রথম হিন্দী সাপ্তাহিক, উদন্ত মার্তণ্ড কলিকাতা হইতে বাহির হয়। সম্পাদক যুগল কিশোর শুক্ল।

১৮২৯ সালে বঙ্গদূত বাহির হয়। ইহা বাংলায় লিখিত কিন্তু ইহার হিন্দী সংস্করণও ছিল।

১৮৩৪ সালে প্রজামিত্র নামে হিন্দী একখানা কাগজের জন্য বিজ্ঞাপন বাংলা কাগজে বাহির হয়।

১৮৭২ সালে হিন্দী দীপ্তিপ্রকাশ ও ১৮৭৮ সালে ভারতমিত্র কলিকাতাতে বাহির হয়। ভারতমিত্র নামজাদা কাগজ।

প্রথম হিন্দী দৈনিক, সমাচারসুধাবর্ষণ এই সময়েই কলিকাতায় বাহির হয়, ইহার অর্ধেক থাকিত হিন্দীতে, অর্ধেক বাংলায়।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে উচিতবক্তা, সারসুধানিধি এই দুইখানি বিখ্যাত হিন্দী কাগজ কলিকাতা হইতে বাহির হয়।

এইখানে কাশীর তারামোহন মিত্রের সুধাকর (১৮৫০) পত্রিকার নাম করা ভাল।

বাংলাদেশে জন্মিয়াও হিন্দুস্থানী বংশীয়দের মধ্যে কেহ কেহ হিন্দীভাষার ভাল লেখক ও কবি হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়িতেছে কবি জগন্নাথপ্রসাদ চতুর্বেদীর নাম। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের বিজয়া দশমীর দিনে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিটকা গ্রামে তাঁহার জন্ম। ইহার পূর্ব পুরুষের নিবাস ছিল আগরা জেলার মর্মস্থানে। বিষয়কর্ম উপলক্ষে ইহাদের পূর্বপুরুষ নদীয়া জেলার ছিটকা গ্রামে বসতি করেন। অল্প বয়সেই ইনি পিতৃহীন হন। জামুই স্কুলে

কিছুদিন পড়িয়া ইনি মেট্রোপলিটন ইনস্‌টিটিউসনে ভর্তি হন ও প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলেজে ইনি বেশি দূর পড়াশুনা করিতে পারেন নাই। গদ্যে পদ্যে প্রায় ১৫খানি পুস্তক ইনি রচনা করেন। ইঁহার ঋতু বর্ণন অতি মনোরম। ইঁহার লেখার মধ্যে একটি হাল্কা হাস্যরসের আমেজ সর্বত্রই দেখা যায়।

হাস্যরসের কথায় বিশাল ভারতের সম্পাদক আমাদের বন্ধু কলিকাতাবাসী ব্রজবিহারী বর্মা মহাশয়কে মনে পড়ে। তিনি অকালে পরলোকগমন করায় সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা অপূরণীয়।

জগন্নাথপ্রসাদ হিন্দী সাহিত্যে এমন একটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন যে হিন্দী সাহিত্যের দ্বাদশ মহাসম্মেলনে লাহোরে তিনি সভাপতি হন এবং বিপুল সম্মান লাভ করেন।

মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মাঘ শুক্লা একাদশীতে পণ্ডিত সূর্যকান্ত ত্রিপাঠীর জন্ম। ইঁহার সাহিত্য নাম নিরালা। ইঁহাদের পূর্ব নিবাস উনাও জেলার গঢ়াকোলা গ্রামে। ইঁহার অধ্যাপক বাবু হরিপদ ঘোষাল ইঁহার প্রতিভা দেখিয়া মুগ্ধ ছিলেন। তাঁহার শিক্ষাগুণে ইনি বাংলা ও ইংরাজি ভাষায় চমৎকার ব্যুৎপন্ন হন। বাংলাতেও ইনি সুন্দর লিখিতে পারিতেন। ক্রমে ইনি হিন্দী ভাষার দিকে আকৃষ্ট হন। প্রথমে ইনি সামান্য ব্রজভাষা জানিতেন পরে খড়ী বোলীতে সুন্দর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সতের আঠারো বৎসর হইতেই ইনি লিখিতে আরম্ভ করেন।

অল্প বয়সে ইঁহার স্ত্রী বিয়োগ হয়, সংসারের গুরুভার মাথার উপর আসিয়া পড়ে। তখন মহিষাদলের রাজা ইঁহাকে নিজের কাজে নিযুক্ত করিয়া ও নানা ভাবে সহায়তা করিয়া রক্ষা করেন।

২৩ বৎসর বয়সে তিনি সমন্বয় পত্রের সম্পাদনায় ব্রতী হন। দুই বৎসর যোগ্যতার সহিত এই সমন্বয় পরিচালনা করিয়া নানা কারণে তাহা ছাড়িয়া দেন।

ইনি রবীন্দ্রনাথের লেখার খুব ভক্ত। নিজেও ইনি একজন মরমিয়া ভাবুক কবি। ইঁহার ভাব প্রকাশন রীতি বেশ গম্ভীর। বাঙ্গালী কবিদের ভাব ও রসের রেশ ইঁহার রচনার মধ্যে সুন্দর ভাবে মিলিয়া গিয়াছে।

এইখানে একটা পুরাতন কথা মনে হইতেছে। ঔরংজেবের পৌত্র উত্তম ব্রজভাষার কবি ও বৈষ্ণব সাহিত্যের সমঝদার ছিলেন। যখন ইনি বাংলাদেশের শাসনকর্তা হইয়া ঢাকাতে আসেন, তখন তিনি ঔরংজেবের দরবার হইতে ভাল

হিন্দী কবি সঙ্গে আনিতে চাহিলেন। ঔরংজেব নিজের কোনো প্রিয় কবিকে ছাড়িয়া দিলেন না। আজিমুশ্‌সান অবশেষে সতসইকার বৃন্দ কবিকে লইয়া ঢাকা আসিলেন। বৃন্দের সতসই গ্রন্থ সমাপ্ত হয় ঢাকা নগরে।

সংবত সসি রস বার সসি
কাতিক সুদি সসিবার।
সাতৈঁ ঢাকা সহর মেঁ
উপজ্যো যহৈ বিচার॥

অর্থাৎ ১৭৬১ সংবতে (১৭০৪ খ্রীঃ), কার্তিক শুক্লা সপ্তমীতে সোমবারে ঢাকা সহরে এই গ্রন্থ রচিত হইল।

বৃন্দের জন্ম ১৬৬০-১৬৭০ খ্রীঃ মধ্যে হওয়া সম্ভব।

প্রদেশান্তরের ভাষালেখক বাঙ্গালী

উড়িয়া ভাষার প্রথম লেখকদের মধ্যে সেই দেশবাসী বাঙ্গালী রাধানাথ রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহারও পূর্বেকার বাঙ্গালী গৌরীশঙ্কর রায় উড়িষ্যার সাহিত্য গড়িয়া তুলিতেছিলেন। বঙ্গদেশ হইতে যাঁহারা উড়িষ্যাতে গিয়া বসবাস করেন তাঁহারাই কেরা বাঙ্গালী।

আধুনিক অসমীয়া ভাষাকে তো সেইদিন বাংলা হইতে রাজাদেশে বিচ্ছিন্ন করা হইল, কাজেই তাহার কথা আর কি বলিব?

রামমোহন প্রভৃতির পরে হিন্দী ভাষার ভাল লেখকদের মধ্যে কয়েক জন বাঙ্গালীর নাম করা যায়। গাজীপুরবাসী অমৃতলাল চক্রবর্তী মহাশয় হিন্দীর একজন ভাল লেখক। বহু কাগজের বিপৎকালে তিনি সম্পাদকতা করিয়া আপৎকাল উদ্ধার করিতে পারিয়াছেন। হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের তিনি একবার সভাপতিও হইয়াছেন। তিনি বেঙ্কটেশ্বর পত্রের সম্পাদনা দীর্ঘকাল সুযোগ্যভাবে করিয়াছেন। তাঁহার শুদ্ধাদ্বৈত দর্শন সম্বন্ধে পুস্তক পড়িয়া বোম্বাইএর গোস্বামী গোকুলনাথ এত প্রীত হইয়াছিলেন যে আজীবন তাঁহাকে মাসিক একশত টাকা বৃত্তি দিয়াছেন।

আগরাতে যমুনাদাস সরকার নামে এক বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহার উর্দু ভাষায় গভীর জ্ঞান ছিল বলিয়া সকলে তাঁহাকে মুন্সী যমুনাদাস বলিতেন। তাঁহার

সম্পাদনায় নসীম আগ্রা নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র বাহির হইত।[৩]

চিন্তামণি ঘোষ মহাশয়ের ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে হিন্দী মাসিক পত্র সরস্বতী প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের উৎকর্ষে, মুদ্রণের ও চিত্রাদির পারিপাট্যে সেই কাগজ-খানি হিন্দী মাসিক পত্রগুলির মধ্যে অতিশয় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

নবীনচন্দ্র রায় মহাশয় একজন প্রখ্যাত হিন্দী লেখক ছিলেন। শরচ্চন্দ্র সেন মহাশয় মহাভারতের হিন্দী গদ্যানুবাদ করিয়া হিন্দী ভাষার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। এই উভয় লেখকের কথা মিশ্র বন্ধুরা স্বীকার করিয়াছেন্।

পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বা কৃষ্ণানন্দ স্বামী অতি সুন্দর হিন্দী বক্তৃতা দিতেন। হিন্দী লেখাতেও তাঁর বেশ হাত ছিল।

ভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের স্বামী জ্ঞানানন্দ বাঙ্গালী। তাঁর হিন্দী জ্ঞানের খ্যাতি আছে। তাঁর শিষ্য দয়ানন্দ স্বামী বাঙ্গালী হইয়া হিন্দীভাষার নানা বিভাগে উৎকৃষ্ট সব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। হিন্দী বক্তৃতায়ও তাঁহার উত্তম অধিকার ছিল।

হিন্দী ব্যাকরণ ও কোষশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন গোপালচন্দ্র শাস্ত্রীর নামও এখানে করা উচিত।

নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার হিন্দী বিশ্বকোষ সম্পাদনে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

বৃন্দাবনের গোপালভট্ট বংশীয় গোস্বামীদিগকে বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী দুইই বলা যায়। তাঁহাদের কথা অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে।

এইখানে বাংলা দেশের বিশ্বরূপ গোস্বামীর কথা মনে আসিতেছে। নদের নিমাইর তিনি আদি কবি ও প্রবর্তক। হিন্দীর গৌর বিষয়ক ও বৈষ্ণব ভাব ভক্তিরসের বহু গান তাঁহার রচিত। বৈষ্ণব পদকে ইনিই ভারতীয় রাগপ্রধান সব সুরে রচনার পথ দেখাইয়াছেন।

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম হিন্দী এম, এ ও এখন হিন্দীর অধ্যাপক। তিনি একজন হিন্দীর ভাল লেখক। হিন্দীতে তাঁহার ভাষা বিজ্ঞানের কথা পণ্ডিত অযোধ্যাপ্রসাদ উপাধ্যায় মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের হিন্দী লেখাও দেখিয়াছি। গভীর বিষয়েই সেই সব আলোচনা।

কাশীর উষা দেবী মিত্রা ও "বঙ্গ মহিলা" হিন্দীতে ভাল গল্প লিখিয়াছেন।

স্থানান্তরে বলিয়াছি রাজা রামমোহন রায় হিন্দী ভাষায় এই যুগের প্রথম লেখক যিনি ফরমাইসী ভাবে পাঠ্যপুস্তক না লিখিয়া জ্ঞান বিস্তারের জন্য লিখিয়াছেন। হিন্দুস্থানী মাসিক পত্রেরও তিনি একজন আদি প্রবর্তক। তাঁহার হিন্দীতে বেদান্ত বিদ্যার অনুবাদগুলি ও বিচারের জন্য ব্যবহৃত ভাষা বোধ হয় এই যুগের হিন্দীর একেবারে আদিম চেষ্টা। সেই চেষ্টা সর্বভাবে সার্থক ও ধন্য হইয়াছে।

শিক্ষাপ্রচারে বাঙ্গালী

বর্তমান যুগে ইংরাজী ভাষাকে উত্তর ভারতের সর্বত্র প্রচার করিয়াছেন বাঙ্গালীরা।

বিহারে গুরুপ্রসাদ সেন, টি, কে, ঘোষ, পাঞ্জাবে নবীন রায়, হায়দরাবাদে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কত নাম আর করিব। সে সব খবর আমার চেয়ে অনেকেই বেশি জানেন। বাংলার বাহিরে প্রতিস্থানেই এই কথা। তাই উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন নাই।

জব্বলপুর প্রদেশে ইংরাজী শিক্ষার একজন মহাগুরু ছিলেন, অধ্যক্ষ গুরুচরণ বসু। স্লীমান সাহেব ১৮৩৬ সালে জব্বলপুরের বিবরণীতে তাঁহার গুণপনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

রামমোহন রায়ের হাতে তৈয়ারী একজন ১০৪ বৎসরের বৃদ্ধকে আমি কাশীতে দেখিয়াছি। তাঁহার নাম রামচন্দ্র মৌলিক। ইংরাজী শিক্ষা দিয়া রামমোহন তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন সংস্কৃতিমূলক শিক্ষাপ্রচারে, মধ্য-ভারতবর্ষে। তখনও সেখানে শিক্ষাবিভাগ খোলে নাই।

মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল তাঁহার দানে কাশীতে ১৮১৮ সালে কলেজ স্থাপন করেন।

সুধু ইংরাজী কেন, সর্ববিধ শিক্ষার জন্যই বাংলার বাহিরেও বাঙ্গালীর চেষ্টা দেখা গিয়াছে।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি ১৮৪৫ সালে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকপদ গ্রহণ করেন। তাহার পর তিনি মজঃফরপুর গিয়া মিথিলাতে সংস্কৃত চর্চার অভাব দেখিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হন। তাই সেখানে সংস্কৃত শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য এক হিন্দী বক্তৃতা করেন। ১৮৮৫ সালে তিনি কাশীতে পরলোকগমন করেন।

জৈনদের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের জন্য তিনি অতিশয় যত্ন করিয়াছেন। সেই জৈনদের মহাগুরু বিজয়ধর্ম স্থরীর বাড়ী নাকি কাটিহারের নিকট। কাজেই ধরিয়া লওয়া যায় বাংলার মধ্যে।[৪]

ভারতের নানা প্রদেশে, নেপালে, ব্রহ্মে, সিংহলে ও ভারতের বাহিরে য়ুরোপে, আমেরিকায় এবং আরও নানা স্থানে বাঙ্গালী যেসব অধ্যাপক আছেন তাঁহাদের নাম আর এখানে করিলাম না। তবু বহুকাল পূর্বে রুশিয়াতে যে নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহার কথা উল্লেখ করা উচিত।

ভারতবর্ষেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম সর্বপ্রদেশে শিক্ষাগুরু হিসাবে সুপরিচিত। তাঁহার প্রবর্তিত পথও নানা প্রদেশে অনুসৃত হইয়াছে।

প্রমাণ-পঞ্জী

১ রাজস্থানরা দুহা, নরোত্তম দাস স্বামী, ভূমিকা পৃ ৫১
২ ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৩৭
৩ অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেব, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৯৩৯ পৃ ৪৯৩
৪ ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১, পৃ ৮৭৪

প্রদেশান্তরে বাংলা সাহিত্যের প্রভাব

এই যুগের ভারতের সকল প্রদেশের মধ্যে রীতিমত সাহিত্য প্রথমে গড়িয়া উঠিল বাংলা দেশে। তাহার প্রভাব হিন্দী, গুজরাতি, কর্ণাটী, মহারাষ্ট্রীয়, তেলেগু, তামিল প্রভৃতি সকল ভাষায় ক্রমে দেখা দিল।

গুজরাতিতে প্রথম বাংলা হইতে অনুবাদের কাজে হাত দিলেন নারায়ণ হেমচন্দ্র। তারপর বহু গুজরাতি সাহিত্যিক বাংলার সহায়তা লইয়াছেন, তাহা আর বিশদভাবে বলার প্রয়োজন নাই।

তেলেগু ভাষাতে বীরসিংহ পান্তলু মহাশয় বাংলা ভাষা হইতে শিক্ষা ও সাহিত্যের বহু গ্রন্থ অনুবাদ করেন। তাঁহার নামই হইয়া গেল অন্ধ্রদেশের বিদ্যাসাগর। তারপর বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি তেলেগুতে অনুবাদিত হয়। শ্রীনারায়ণ মূর্তি অনুবাদ করেন দুর্গেশনন্দিনী। শ্রী ও, ভি, ডোরাসামায্যা অনুবাদ করেন আনন্দমঠ ও কপালকুণ্ডলা। শ্রী টি, এস, রাও অনুবাদ করেন চন্দ্রশেখর। শ্রী সি, এস, রাও অনুবাদ করেন কৃষ্ণকান্তের উইল। শ্রীভাস্কর রাও প্রফুল্ল নাটকটির অনুবাদ করেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও সাহিত্যগ্রন্থগুলি ভারতীয় সকল প্রদেশের ভাষায় এত অনুবাদ হইয়াছে যে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাহার সবগুলির সন্ধান পাওয়াও কঠিন। এখন বিশ্বভারতী গ্রন্থ প্রকাশ বিভাগ তাঁহাদের আপন প্রয়োজনে সেই সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

শ্রী বি, বেঙ্কটাচার হইলেন কর্ণাটের সাহিত্যস্রষ্টা। তাঁহাকে কর্ণাটের বঙ্কিমচন্দ্র বলে। তিনি দুর্গেশনন্দিনী, ইন্দিরা, বিষবৃক্ষ, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম, কৃষ্ণকান্তের উইল প্রভৃতি অনুবাদ করেন।

ভারতের সকল প্রদেশের ভাষার খবর দিতে গেলে এই গ্রন্থের আয়তনে কুলায় না। অসমীয়া ও উড়িয়াকে বাংলা হইতে আলাদা করিয়া ধরিতেছি না। তাহা হইলে হিন্দীর মধ্যেও মৈথিলী, পূরবী বিহারী, বুন্দেলখণ্ডী, মহাকোশলী, পাহাড়ী, ডিংগল প্রভৃতি ভিন্ন ভাষা হইয়া যায়—অথচ এইসব লইয়াই হিন্দী সাহিত্যের প্রসার।

মুখ্যত আলোচনা করা যাইতে পারে হিন্দী ভাষা লইয়া। এই ভাষাতে প্রথম বাংলা প্রভাবের কথা স্থানান্তরে নানা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে কবি হরিশ্চন্দ্র ও রাজা শিবপ্রসাদ বর্তমান হিন্দী সাহিত্য ও শিক্ষাগ্রন্থের জন্মদাতা। তাঁহারা উভয়ে বাংলা ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। শিবপ্রসাদের পূর্বপুরুষ বাংলার বিখ্যাত জগৎশেঠ গোষ্ঠীয়। তাঁহারা পুরুষানুক্রমে মুর্শিদাবাদবাসী ছিলেন। নবাবের কোপে পড়িয়া কাশীতে পলাইয়া আসেন। তাঁহার পিতামহী বিবি রতনকুমারী বোধহয় প্রেমরত্ন লেখিকা। বর্তমান যুগে হিন্দী ভাষার তিনি প্রথম লেখিকা। সে সময়েও তাঁহাদের বাড়ীতে বাংলা কথাবার্তা একেবারে লুপ্ত হয় নাই।

হরিশ্চন্দ্রের প্রধান বন্ধু ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের ভক্ত রাধাচরণ গোস্বামী। হরিশ্চন্দ্র নিজে খুব ভাল বাংলা জানিলেও বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার যোগসেতু ছিলেন গোস্বামী রাধাচরণ। রাধাচরণ গোস্বামী, গৌড়ীয় বৈষ্ণব, বৃন্দাবনবাসী। বাংলা ও হিন্দী উভয় ভাষাই যেন তাঁহাদের মাতৃভাষা। কাজেই গণপতির মত ইঁহাদিগকে দ্বৈমাতুর বলা যায়। ইঁহাদের পূর্বপুরুষ শ্রীগোপাল ভট্ট মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র ছিলেন। মহাপ্রভুর আজ্ঞায় যে ছয়জন মহাসাধক বৃন্দাবনে বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচারের জন্য রহিয়া গেলেন, গোপাল ভট্ট তাঁহাদের একজন। চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় এই ছয় জনকে তাঁহার শিক্ষাগুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥১

এই গোপাল ভট্টের রচিত যেসব পদ আছে, তাহার দুই একটির রচয়িতার পরিচয় লইয়া একটু গোলমাল আছে। রসকল্পবল্লীরচয়িতা গোপাল দাস ছিলেন শ্রীখণ্ডবাসী বৈদ্য কবিরাজ বংশীয়। তাঁহার ও গোপাল ভট্টের নামের সাম্যবশতঃ কোথাও কোথাও গোলমাল চলিয়াছে। এই বংশের গল্লুজী বা গুণমঞ্জরী দাসের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

গোপালভট্টসম্প্রদায়ী মধুসূদন গোস্বামীর কথাও পূর্বেই বলা হইয়াছে। জ্ঞানের বিকৃতি গ্রন্থ তাঁহার রচিত। এই গ্রন্থ বাংলায় লিখিত এবং ভাষা অতিশয় সুন্দর।

মধুসূদন গোস্বামী মহাশয় হিন্দীরও উত্তম লেখক ছিলেন। ধর্ম বিষয়ে তাঁহার বহু লেখা হিন্দী ভাষার অতিশয় প্রৌঢ় রচনার আদর্শ স্বরূপ।

এই প্রসঙ্গে রাধাচরণ গোস্বামী মহাশয়ের সম্বন্ধে আর কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পবিত্র স্মৃতিতে রাধাচরণ একটি হিন্দী মাসিকপত্র বাহির করেন। তাহার নাম রাখেন ভারতেন্দু। এই কাগজখানি বহুদিন চলিয়াছিল। এখানে বলা উচিত "ভারতেন্দু" নামেই হরিশচন্দ্র পরিচিত।

বঙ্কিম বাবু ও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রাধাচরণ ও হরিশ্চন্দ্রেব অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহাদের প্রভাবেই রাধাচরণ বিধবা বিবাহ ও বিদেশ যাত্রার স্বপক্ষে বিভিন্ন পুস্তক রচনা করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে হরিশ্চন্দ্র অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শকুন্তলার জন্য কাশী হইতে পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দেন হরিশ্চন্দ্র।

হরিশ্চন্দ্র বাংলা খুব ভালরূপ জানিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন বাংলা ভাষা হইতে ভাল ভাল গ্রন্থ হিন্দীতে অনুবাদ করা প্রয়োজন। তাই তিনি নিজে একটি উপন্যাস হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া পথ প্রদর্শন করেন। তারপর সেই ভাবে রাধাচরণ গোস্বামী মহাশয় মৃন্ময়ী, বিরজা, সাবিত্রী প্রভৃতি গ্রন্থ হিন্দীতে অনুবাদ করেন। তাহার হিন্দী ভাষা হরিশ্চন্দ্র নিজে দেখিয়া দেন। কবি হরিশ্চন্দ্র বাংলা এত ভাল জানিতেন যে বাংলায় তিনি কবিতাও রচনা করিতেন।[২] বাংলা তো রাধাচরণের মাতৃভাষা বলিলেই হয়। হরিশ্চন্দ্রের অনুরোধে বাবু গদাধর সিংহ বঙ্গবিজেতা, দুর্গেশনন্দিনী ও কাদম্বরীর অনুবাদ করেন। হরিশ্চন্দ্রের পিসতুত ভাই বাবু রাধাকৃষ্ণ দাস স্বর্ণলতা প্রভৃতি কয়টি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। পণ্ডিত প্রতাপনারায়ণ মিশ্র রাজসিংহ প্রভৃতি আটদশখানি উপন্যাস অনুবাদ করেন। পণ্ডিত প্রতাপনারায়ণের অনুবাদ হিন্দী ভাষার এক অপূর্ব সম্পদ। ইঁহার অনূদিত রাজসিংহ প্রভৃতির ভাষা হিন্দী ভাষার প্রৌঢ় রচনার আদর্শরূপে চিরদিন সমাদৃত হইবে। ইহা ছাড়া হরিশ্চন্দ্র আরও কয়েকজন লেখককে এইসব অনুবাদের কাজে লাগান। তাহার মধ্যে বাবু রামকৃষ্ণ বর্মা, বাবু কার্তিকপ্রসাদ, বাবু গোপালদাস গহমরী, বাবু উদিতনারায়ণ লাল গাজীপুরী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কবি হরিশ্চন্দ্রের বন্ধু শিবনন্দন সহায়ের বাড়ী আরা জেলায়। ইনি ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের উৎকৃষ্ট জীবনী লেখেন। ভারতেন্দুর প্ররোচনায় ইনি

বহু বাংলা গ্রন্থ হিন্দীতে অনুবাদ করেন। ইহার গ্রন্থ নানা বিদ্যায়তনে পাঠ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে।

এইখানেই আরও কয়েকজন এই যুগের প্রখ্যাত হিন্দী কবির নাম করা যাইতে পারে। তাঁহারা বিশেষ ভাবে বাংলা জানেন ও বাংলার সাহিত্যরসে তাঁহাদের চিন্তা ও ভাব অভিষিক্ত।

রায় বেরিলীর অন্তর্গত দৌলতপুর গ্রামে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কবি মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীর জন্ম। ইনি বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার অনেক রচনা বাংলার অনুবাদ। মহাভারত তিনি বাংলা হইতে হিন্দীতে অনুবাদ করেন। বাংলা তিনি ভাল জানিতেন।[৩]

পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাসের পূর্বপুরুষ জয়পুর প্রদেশের অধিবাসী গৌড় ব্রাহ্মণ। ইহারা বহু পুরুষ কাশীবাসী। তিনি গবর্ণমেণ্টের সেবায় সংস্কৃত অধ্যাপকরূপে বিহারেই জীবন কাটাইয়া দিয়াছেন। ইনি বৈষ্ণব কবিতা রচনায় খ্যাতি অর্জন করিয়া গিয়াছেন। বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের ইনি উত্তম রসজ্ঞ ছিলেন।

রাধাচরণ গোস্বামীর নামের সঙ্গে কিশোরীলাল গোস্বামীরও নাম করা উচিত ছিল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহার জন্ম। ইহারা বৃন্দাবনবাসী হইলেও ইহার মাতামহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবজী কাশীর গোলঘর মন্দিরে বাস করিতেন। কিশোরীলাল গোস্বামী মহাশয়ের বাল্যজীবন কাশীতেই অতিবাহিত হয়। ইহার শিক্ষাদীক্ষাও হয় কাশীতে।

ইহার মাতামহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবই কাশীর বিখ্যাত কবি ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের সাহিত্যগুরু। হরিশ্চন্দ্র জন্মিয়াছিলেন বল্লভাচার্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে। বল্লভের প্রতি হরিশ্চন্দ্রের গভীর ভক্তি ছিল। তবু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের প্রভাবে হরিশ্চন্দ্র চৈতন্য প্রবর্তিত মতকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলী, কবিরাজ গোস্বামী ও রূপ-সনাতন-জীব গোস্বামীর গ্রন্থগুলি তিনি যত্নে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র নানা ভাবেই বাংলা সাহিত্য ও বাংলার বৈষ্ণব মতের সহিত সংশ্লিষ্ট। কিশোরীলালও তাই ভারতেন্দুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। রাজা শিবপ্রসাদ তাঁহার প্রতিবেশী ছিলেন, তাঁহার সঙ্গেও কিশোরীলালের ঘনিষ্ঠতা ছিল।

কিশোরীলাল ছিলেন হিন্দী সরস্বতী পত্রের প্রথম সম্পাদক। নাগরী প্রচারিণী পত্রিকা ও গ্রন্থমালার সম্পাদন কার্যও তিনি করিয়াছেন। ইহার লিখিত

অনেক গ্রন্থ আছে, তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব গ্রন্থ বিশেষ ভাবে বৈষ্ণবদের সমাদৃত।[৪]

হিন্দী কবি জগন্নাথপ্রসাদ চতুর্বেদীর জন্ম বাংলা দেশে হওয়ায় তাঁহার নাম অন্যত্র করা হইয়াছে। নদীয়া জেলার ছিটকা গ্রামে তাঁহার জন্ম (১৮৭৫ খ্রীঃ)। ইঁহার ঋতু-বর্ণন হিন্দী সাহিত্যে অতিশয় সমাদৃত।[৫]

হাস্যরসের রসিক বলিয়াও ইঁহার খ্যাতি আছে। ইঁহার গ্রন্থে, বক্তৃতায় ও কথাবার্তায় হাসির বন্যা বহিয়া চলে।[৬]

মধ্যপ্রদেশে সাগর জেলায় সে দেশের রাজাদের গুরুবংশে কবিপণ্ডিত গুরু কামতাপ্রসাদের জন্ম। ইনি উড়িয়া ও বাংলা ভাষায় কৃতী ও বাংলা সাহিত্যের মর্মজ্ঞ। ভারতীয় নানা ভাষার তুলনাত্মক ব্যাকরণে ইঁহার অধিকার সর্বজনস্বীকৃত।[৭]

পণ্ডিত মাধব শুক্লের পূর্ব-পুরুষগণ মালরা হইতে আসিয়া এলাহাবাদে বাস করেন। ইনি ইংরাজী অধিক জানিতেন না। বাংলা ভাষাতে ইঁহার ভাল অধিকার ছিল। ইনি সামাজিক দুর্গতির বিরুদ্ধে তীব্র ভাবে তাঁহার লেখনী চালাইয়াছেন।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী অধ্যাপক শ্রীযুত রামচন্দ্র শুক্ল এখন হিন্দী ভাষায় প্রখ্যাত পণ্ডিত। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বস্তী জেলায় তাঁহার জন্ম। ইনি বাল্যকাল হইতেই সংস্কৃত ভাষার অনুরাগী। জায়সবাল ইঁহার বাল্যবন্ধু ছিলেন। ইনি বাল্যকালে মির্জাপুরে থাকিতেন। যখন ইনি কাশীতে আসেন তখন ইঁহার সাহিত্যে অনুরাগ দেখিয়া পণ্ডিত কেদারনাথ পাঠক ইঁহাকে বাংলা সাহিত্যের সহিত পরিচিত করেন। ইনি রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি বাংলা হইতে অনুবাদ করিয়াছেন।

মৈথিলীশরণ গুপ্ত হিন্দী ভাষাতে একজন মহাকবি। ইঁহার কাব্যগ্রন্থগুলির এত আদর ও তাহা এত বিক্রয় হইয়াছে যে শুনিলে বিশ্বাস হইতে চাহে না। ইঁহারা পাঁচ ভাই। ইনি তৃতীয়। চতুর্থ ভাই সীয়ারাম শরণও একজন প্রখ্যাত কবি। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ঝাঁসী জেলার চিরগাঁও গ্রামে তাঁহার জন্ম।

মৈথিলীশরণ গুপ্ত মহাশয় ইংরাজী হইতে তাঁহার কাব্যসম্পদ সংগ্রহ করিবার সুযোগ পান নাই। সংস্কৃত জানিলেও ইঁহার প্রধান উপজীব্য বাংলা ভাষা। ইনি নিজেও বলেন, "বাংলা সাহিত্য হইতেই আমি আমার সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি।" ইঁহার অনূদিত পলাশীর যুদ্ধ, মেঘনাদ বধ, বীরাঙ্গনা,

ব্রজাঙ্গনা প্রভৃতি কাব্য সর্বজনসমাদৃত। নবীন সেন ও মধুসূদনের প্রায় কাব্যগ্রন্থ ইনি অনুবাদ করিয়াছেন।

মৈথিলীশরণজীর ছোট ভাই সীয়ারাম শরণের জন্ম ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। ইঁহার কাব্যের গভীরতা ও ভাষার প্রসন্নতা সকলেরই স্বীকৃত। বাংলা সাহিত্যের প্রভাব ইঁহার উপরও কম নহে।

বিলাসপুরের কবি লোচন প্রসাদ পাণ্ডে তিনটি ভাষাতে সমান অধিকারী। ইনি যেমন হিন্দী ভাষায় সুকবি তেমনি উড়িয়া ভাষাতেও প্রখ্যাত কবি। বিলাসপুর জেলার চিত্রোৎপলা গঙ্গা মহানদীর তীরে বালপুর গ্রামে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। বিলাসপুর জেলাতে বাংলা ভাষার রীতিমত চলন আছে। বহু চাষাভূষার ঘরে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত পঠিত হয়। লোচন প্রসাদ বাল্যকালে ঘরে বসিয়াই উড়িয়া ও বাংলা শেখেন। এই যুগে উড়িয়া ভাষার আদি কবি রাধানাথ রায় মহাশয় একজন বাঙ্গালী। লোচন প্রসাদজী তাঁহার একটি জীবনী ইংরাজিতে লিখিয়াছেন—তাহার নাম 'রাধানাথ দি ন্যাশনাল পোয়েট অব উড়িষ্যা।'

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত ছত্রপুর রাজ্যে পণ্ডিত হরিপ্রসাদ দ্বিবেদীর জন্ম। সংস্কৃত পড়িয়া ইনি প্রথমে অদ্বৈতবাদী হইয়া যান পরে বৈষ্ণব ভাবের প্রভাবে ইনি ভক্তির পথে আশ্রয় লন। বাংলাতেও ইঁহার বিলক্ষণ অধিকার। গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলী রসে ইনি মশগুল। ইঁহার লেখাতেও তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। লোকে কিন্তু ইহাকে ইঁহার পিতৃদত্ত নামে জানেন না। ইঁহার নাম বিয়োগী হরি বলিয়াই প্রখ্যাত। ইঁহার সম্পাদিত ব্রজমাধুরীসার নামে কাব্যগ্রন্থ হিন্দী ভাষাতে একখানা উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব-পদ-সংগ্রহ।

এখনকার হিন্দী কবিগণের মধ্যে পণ্ডিত সুমিত্রানন্দন পন্থের অসাধারণ প্রতিষ্ঠা। তাঁহার কবিতার ভাষা যথার্থই কাব্যরসের অনুরূপ হইয়াছে। এতকাল পরে বর্তমান হিন্দীকাব্য যেন তাহার উপযুক্ত ভাষা লাভ করিয়াছে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে আলমোড়ায় পন্থজীর জন্ম। বাংলা-কাব্যের ইনি একজন বিশেষ অনুরাগী। তাঁহার ভাষায় ও কাব্যে বাংলা কবিতার ভাব ও ভাষার প্রভাব বিলক্ষণ রহিয়াছে।

ইহা ছাড়া আরও কয়েকজন নূতন ও পুরাতন হিন্দী লেখকের নাম করা যাইতেছে। অযোধ্যাসিংহ উপাধ্যায় তাঁহার 'প্রিয়প্রবাসে'র আদর্শ মধুসূদন হইতে পাইয়াছেন।

জয়শঙ্কর প্রসাদজী বাংলা খুব ভাল জানিতেন ও তাঁহার নাটকাদিতে বাংলার প্রভাব বিলক্ষণ রহিয়াছে।

রামনরেশ ত্রিপাঠী বাংলা খুব ভাল জানেন। বাংলা কবিতা কৌমুদী তিনি হিন্দীতে সংগ্রহ করিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। এই কার্যে তিনি পণ্ডিত কৃপানাথ মিশ্র হইতে যথেষ্ট সহায়তা লাভ করিয়াছেন। পণ্ডিত কৃপানাথ বাংলা ও হিন্দী উভয় ভাষাতেই সমান ব্যুৎপন্ন ও সমান ভাবে লিখিতে পটু।

পণ্ডিত রূপনারায়ণ পাণ্ডেয় অনুবাদকর্মে বেদব্যাস বলিলেই হয়। তিনি সংস্কৃত ভালরূপে জানেন। বাংলায় তাঁর অসাধারণ অধিকার। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রায় সব নাটক ইনি অনুবাদ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের চোখের বালির অনুবাদ 'আঁখ কী কিরকিরী' বহুজনের প্রশংসিত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। ইনি মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থও অনুবাদ করিয়াছেন। লক্ষ্ণৌতে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রভাবে এখনকার হিন্দী কবিরা প্রায় সকলেই ভরপূর। বাংলাদেশের তরুণ কবিদের অপেক্ষা ইহারা রবীন্দ্রনাথের কাছে এই ঋণ আরও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন।

তাহা ছাড়া এত তরুণ ও অল্পবয়স্ক উদীয়মান হিন্দী সাহিত্যিকের নাম করা যাইতে পারে যে, এত স্থান এখানে নাই। বর্তমান হিন্দী সাহিত্যের প্রথম যুগে এমন সময় ছিল যখন বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্য হইতে অনুবাদই ছিল তাহার একমাত্র উপজীব্য। এখন তাহার সাধনা নানা পথগামিনী হইলেও বাংলার সঙ্গে যোগ আজিও কম নহে।

প্রমাণ-পঞ্জী

১ চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ
২ বিয়োগী হরি, ব্রজমাধুরীসার, পৃ ৬৪৯
৩ কবিতা কৌমুদী, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ ১৪১
৪ কবিতা কৌমুদী, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ ২১৭
৫ কবিতা কৌমুদী, পৃ ২৯৩—৩০৩
৬ হরিঔধ কৃত হিন্দীভাষা ঔর উসকে সাহিত্যকা বিকাশ, পৃ ৭০৬
৭ কবিতা কৌমুদী, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ ৩০৫

বর্তমান যুগে ধর্মপ্রচার

প্রাচীনকালে বাঙ্গালী জৈন বৌদ্ধ যোগীরা নানা দেশে দেশে ধর্মপ্রচার করিয়াছেন। ময়নামতীর গান ভারতের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্ম ভারতের সর্বত্র এমনকি ব্রহ্মদেশেও গিয়াছে।

বর্তমান যুগে সর্বপ্রথম এই পথে চলিলেন রামমোহন। তিনি বিচার ও প্রচারের দ্বারা কাশী ও দক্ষিণের পণ্ডিতদের কাছে তাঁহার আদর্শ উপস্থিত করিলেন। তারপর য়ুরোপে গিয়া তিনি এই জগৎ হইতেই বিদায় নিলেন।

তারপর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশে এবং ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যায় গেলেন। তারপর ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে যাত্রা করিয়া মুঙ্গের, পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ, আগরা, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লী হইয়া ১৪ ফেব্রুয়ারী মহর্ষি অমৃতসর পৌঁছিলেন। তারপর গেলেন সিমলা হিমালয়ে। সেখানে থাকিতেই সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। ১৮৫৮ সালের ১৫ই নবেম্বর তিনি দেশে ফিরিলেন।

১৮৬৪ সালে কেশবচন্দ্র সমুদ্রপথে মাদ্রাজ প্রদেশে প্রচারার্থ যান। তারপর ভারতের ভিতরে ও বাহিরে নানাস্থানে তিনি প্রচার করিয়াছেন।

এই ভাবেই বাংলা হইতে ব্রাহ্মধর্ম অন্ধ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাত, পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে গিয়াছে। মহর্ষির বহু ভক্ত বোম্বাই ও গুজরাত প্রদেশে আছেন। করাচীতে কেশবচন্দ্রের ভক্ত সাধক নন্দলাল সেন থাকিতেন। তাই সেই দেশে কেশবচন্দ্রের নাম আজও জাগ্রত। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ও করাচীতে দীর্ঘকাল ছিলেন। সিন্ধুদেশের ব্রাহ্মরা বাংলা গান করেন ও বাংলা বুঝেন। বোম্বাইর প্রার্থনা-সমাজেও বাংলার প্রচার আছে। সেই সব দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও একজন ভক্ত সাধু বলিয়াই অনেকে জানেন।

গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ ও পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ বহুস্থানে প্রচার করেন।

তারপরই আসিল স্বামী বিবেকানন্দের যুগ। তিনি ও তাঁহার অনুবর্তী সাধুগণ ভারতের ভিতরে ও বাহিরে যে নানা স্থানে প্রচার করিয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন। শ্রীঅরবিন্দের কথাও সর্বজনবিদিত। গুজরাত প্রদেশ হইতে বহু ভক্তজন সংসার ছাড়িয়া এখন পণ্ডিচেরী আশ্রমেই বসবাস করিতেছেন।

বাঙ্গালী সন্ন্যাসী নারায়ণস্বামী মাদ্রাজে দেহ রক্ষা করেন, তিনি কালীকমলীওয়ালার শিষ্য ছিলেন। হাইকোর্টের উকিল শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় সন্ন্যাসাশ্রমে শঙ্কর পরমানন্দ নাম গ্রহণ করেন। তিনি পুরীর মঠে নিজ অধিকার ছাড়িয়া দিয়া পরে কাশীতে তনুত্যাগ করেন।

পরমহংস রামকৃষ্ণের শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই সর্বত্র পরিচিত। নাগ মহাশয়কে বাংলার বাহিরেও জানে। গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ বা জটিয়া বাবা উৎকল হইতে দ্বারকা পর্যন্ত বিখ্যাত। সন্তদাস বাবাজী (শ্রীহট্টের তারাকিশোর চৌধুরী) শুধু নিম্বার্ক সম্প্রদায়গুরু নহেন, তিনি সর্বজনপূজ্য। পূর্ণানন্দ গিরির খ্যাতি তাঁহার জন্মস্থান বরিশাল গুঠিয়া গ্রামেই আবদ্ধ নহে। শ্রীহট্ট নাসিরনগরে জন্ম হইলেও তিব্বতী বাবা সর্বত্র বিশ্রুত ছিলেন। বর্ধমানের বিশুদ্ধানন্দ স্বামী শেষ বয়সে কাশীতে ছিলেন। সেখানে গোপীনাথ কবিরাজের মত মহাপণ্ডিত বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী বহু ভক্ত শিষ্য তাঁর অনুগত ছিলেন। শ্রীহট্টের দয়ানন্দ ঝাড়খণ্ডে ও বাহিরে পূজিত। পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দের খ্যাতি উত্তর-ভারতে সর্বত্র এমন কি পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ফরিদপুরের জগদ্বন্ধুর নাম, বরাহনগরের যোগত্রয়ানন্দের নাম, ফরিদপুর মাঐসারের পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারীর নাম, বাংলার বাহিরেও আছে। আনন্দময়ী প্রভৃতি বাঙ্গালী অনেক নারী-সাধিকার নামও বাহিরের লোক জানেন।

প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে বড়োদা রাজ্যে নর্মদাতীরে ভ্রমণ করিবার সময় একজন বাঙ্গালী সাধুকে দেখি। তিনি বাঙ্গালী বৈষ্ণব, নাম মাধবদাসজী। তাঁহার বাড়ী পূর্ববঙ্গে। তাঁহার উপর স্থানীয় লোকের অগাধ ভক্তি। তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া আমরা নর্মদাপথে অনসূয়া, শূলপাণি প্রভৃতি তীর্থে গেলাম। সর্বত্রই দেখি বাঙ্গালী সাধু আছেন।

ইহা ছাড়া আমি আবু পর্বতে, গিরনারে, নর্মদায় শুক্লতীর্থে, অনসূয়ায় শূলপাণি ভরুচে ও নর্মদার মূলস্থানে, নর্মদার শুক্লতীর্থে দ্বারকার গীর অরণ্যে ও হিমালয়ের সব দুর্গমস্থানে হিংলাজের মঠে এমন সব বাঙ্গালী সাধুকে দেখিয়াছি, যাঁহাদের নাম এখানে কেহ তেমন জানেন না ; কিন্তু সেই সব দেশে তাঁহাদের প্রতি লোকের অশেষ শ্রদ্ধা। ব্রজধামেও কৃচ্ছ্রাচারী বাঙ্গালী অরণ্যবাসী বাবাজীদের প্রতি লোকের অগাধ শ্রদ্ধা। সেখানকার নিম্বার্ক মঠে বাঙ্গালী সন্তদাস ছিলেন প্রধান মোহান্ত। এখনকার মোহান্তও বাঙ্গালী। বাঙ্গালী পালোয়ান শ্যামাকান্ত তিব্বতী বাবার শিষ্য হইয়া সোহংস্বামী নামে পরিচিত হন। আলমোড়ার নিকট ভাওয়ালীতে ১৯১৮ সালে ৫ই ডিসেম্বর তিনি দেহত্যাগ করেন

বাংলার বাউলদের কেহ কেহ সিন্ধুর সুফীদের সঙ্গে একসুরে গাঁথা। তাঁহাদের সাধনাও গভীর। কিন্তু বাহিরে তাঁহাদের নাম নাই বলিয়া তাঁহাদের কথা উল্লেখ করিলাম না।

বাঁকুড়া সোণামুখীর পাগল হরনাথের ও রামদাস বাবাজীর অনেক শিষ্য বোম্বাই প্রদেশে। বাংলাদেশে ছোট-বড় অনেক সাধু আছেন যাঁহাদের নাম স্বদেশ হইতে বিদেশেই বেশি।

একজন গুজরাতি সমালোচকের মতে গুজরাতের আমেদাবাদের ধনীদের মধ্যে একজন সাধুগুরু থাকা এখন একটা ফ্যাসানে দাঁড়াইয়াছে। যেমন মোটরগাড়ী, বাগানবাড়ী ইত্যাদি, তেমন সন্ন্যাসী গুরু। তেমনই আবার গুরুদের মধ্যে অনেকে বাঙ্গালী।

বাংলাতেও ব্যবসায়ী বহু দেশের সাধু ঘুরিয়া বেড়ান, অধিকাংশই পাঞ্জাবী। তাঁহারা সারা বাংলা ঘুরিয়া বেশ উপার্জন করেন।

ঢাকাতে অনেকদিন হইতেই যে শিখ ও সুথরাসাহী লোকদের বাস তাহা পূর্বেও বলা হইয়াছে, সেখানে তাঁহাদের বসতি আছে।[১]

নরওয়েতে স্বামী আনন্দ আচার্যের কথা অনেকে জানেন। রামকৃষ্ণমঠ ভারতের বাহিরে বহু স্থানেই আছে। আমেরিকার নানাস্থানে তাঁহাদের সাধুরা ধর্মপ্রচার করিতেছেন। প্রেমানন্দ ভারতী আমেরিকাতে বহুকাল ছিলেন। তাহা ছাড়াও আরও অনেক সাধুসন্ত ভারতের বাহিরে ধর্মপ্রচারে সহায়তা করিয়াছেন। লণ্ডনে এখন গৌড় মাধ্ব সম্প্রদায়েরও কাজ চলিয়াছে।

প্রমাণ-পঞ্জী

১ এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন এণ্ড এথিক্‌স্

বাঙ্গালীর তীর্থযাত্রা

যোগীদের সর্বধাম পরিভ্রমণের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তান্ত্রিকেরাও ভারতের সকল দেবীপীঠ পরিভ্রমণ করিতেন এবং এখনও করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণও তীর্থযাত্রায় কাহারও অপেক্ষা হীন নহেন। এখনও বাঙ্গালীর এই অভ্যাসটি বজায় আছে।

তীর্থভ্রমণ ভক্তমাত্রই করেন, তবে মহাপ্রভুর ও জগমোহন-রামকৃষ্ণের নানা তীর্থভ্রমণ আমাদের বাংলা সাহিত্যের মধ্যে স্থান পাইবার মত। এইসব মহাপুরুষ সেই যুগে কেমন করিয়া নানা তীর্থ দর্শন করিয়াছেন তাহা দেখিবার মত।

চৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী মধ্যলীলার সপ্তম, অষ্টম, নবম পরিচ্ছেদে পুরীধাম হইতে যাত্রা করিয়া তথায় ফিরিতে যেসব তীর্থে মহাপ্রভু গিয়াছিলেন, তাহার একটি বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন।

আলালনাথ, কূর্মস্থান, নৃসিংহক্ষেত্র হইয়া মহাপ্রভু গোদাবরীতীরে যান ও রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলন হয়। সেখানে তাঁহাদের অপূর্ব আলাপ হয়। ইহা লইয়াই সপ্তম ও অষ্টম পরিচ্ছেদ। নবম পরিচ্ছেদে বাকী আর সব তীর্থযাত্রা।

গৌতমী গঙ্গা, মল্লিকার্জুন, সিদ্ধবট, স্কন্দক্ষেত্র, ত্রিমল্ল, বৃদ্ধকাশী, তিরুপতি, পানা নরসিংহ, কাঞ্চীপুর, শ্রীরঙ্গম, মাদুরা প্রভৃতি ছোট বড় নানা তীর্থ দর্শন করিয়া মহাপ্রভু কন্যাকুমারীতে গেলেন। মল্লার দেশে পয়স্বিনী তীরে তিনি ব্রহ্মসংহিতার কিছু অংশ পাইয়া অত্যন্ত আদরে সংগ্রহ করিলেন। পয়োষ্ণী মৎস্যতীর্থাদি যাত্রার সঙ্গে তিনি মধ্বাচার্যদের স্থানে আসিলেন এবং সেখানকার ভক্তদের সঙ্গে তর্কও উপস্থিত হইল। তাহাতে তিনি তাঁহাদিগকে "তোমাদের সম্প্রদায়" বলিয়া বলিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, ঠিক মাধ্বমত তাঁহার মত নহে, যদিও তাহাদের প্রতি তিনি অশ্রদ্ধা দেখান নাই।

সেখান হইতে নানা তীর্থ সারিয়া তিনি পাণ্ডুপুর অর্থাৎ পাণ্ঢরপুরে আসিলেন। এইখানে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ অর্থাৎ শঙ্করারণ্য দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণবেন্নাতীরে তিনি কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ পান। এই যাত্রায় মহাপ্রভু কৃষ্ণকর্ণামৃত ও ব্রহ্মসংহিতা এই দুইটি রত্ন লইয়া তাপ্তি, নর্মদা, নাসিক গোদাবরীতে স্নান করিয়া বিদ্যানগর হইয়া পুরীধামে ফিরিলেন।

ভক্ত জগমোহনের জন্ম ১৫২৮ এবং তিরোভাব ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে, মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে। ইঁহার উপযুক্ত অনুবর্তী শিষ্যের শিষ্য রামকৃষ্ণের জন্ম ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং তিরোধান ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে, ৭৬ বৎসর বয়সে। ইনিই শ্রীহট্টের সুবিখ্যাত বিমঙ্গল মঠের স্থাপয়িতা। ইঁহারা পরব্রহ্মের উপাসক। কাজেই জাতি, পঙক্তি, মূর্তি, প্রতিমাদি মানেন না। রামকৃষ্ণ ভারতের সর্বতীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন। রামকৃষ্ণচরিত গ্রন্থে, কৃপালুগোসাঞির লিখিত তালিকায় আমরা এইসব স্থানের নাম পাই,—গোদাবরী, পানা নরসিংহ, গস্তর, বেঙ্কটগিরি, বালাজী, কাঞ্চী, রঙ্গনাথ, সেতুবন্ধ, কুমারীকন্যা, পদ্মনাভ, পাণ্ঢরপুর, নাসিক, সোমনাথ, প্রভাস, ডাকরাজ (ডাকোর গুজরাত), গিরনার, দ্বারকা, গোপীতলাও, পুষ্কর, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, জ্বালামুখী, হরিদ্বার, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ, বদরিকাশ্রম, নেপাল, মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী, গয়া, বৈদ্যনাথ, ঢাকা ইত্যাদি।

ইঁহাদের গানের নাম নির্বাণ সঙ্গীত। ইঁহাদের সঙ্গে পশ্চিমের সাধকদের মিল ছিল। তাই সেইসব সাধকদের কাছে ইঁহাদের কিছু পদ পাইয়াছি, তাহা বাংলা হইতে বদলিয়া আর এক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

ভজুরে আতম সাধগুরু প্রাণী।
অগমগম করে অনহদ সুনায় বাণী ॥
অভব ভবে, অমিল মিলে, পূরণ আনন্দ সিবে।
তজি পরপঞ্চ, সত্তসার বুঝ, আনংদ তনমন রীবে ॥
ক্ষীর তজি, অপন ঘর মধি, ময়ে বিচারি ভীখ।
অচেত করম, পরমাদ তজি, আতম মরম সীখ ॥

হিন্দুস্থানে রাজপুতানায়, কাঠিয়াবাড়েও এমন সব ভক্ত দেখিয়াছি তাহারা জগমোহন ও রামকৃষ্ণকে মানেন ও যথেষ্ট ভক্তি করেন। উপরের পদটি আমি কাঠিয়াবাড়, ভাবনগরের লাখনকার সাধু মোহন দাসের কাছে পাই।

বর্তমান যুগে ইন্দুমাধব মল্লিক, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির বহু বিদেশযাত্রার ভাল গ্রন্থ আছে। ভারতের ও নানা তীর্থের যাত্রা-বিবরণ আছে। তাহার উল্লেখ এখানে করিব না। কিন্তু ইংরাজ আগমনের সময়ে দুইজন বাঙ্গালীর তীর্থযাত্রার কথা আমাদের জানা উচিত।

ভূকৈলাসের মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল মহাশয়ের কাশী-পরিক্রমার কথা

পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহার তীর্থযাত্রার বিবরণ অতিশয় চিত্তাকর্ষক। বৃন্দাবন ও ব্রজভূমির পরিক্রমার গ্রন্থখানি নরহরি ঠাকুরের।

যদুনাথ সর্বাধিকারী মহাশয়ের তীর্থ-ভ্রমণকাহিনীও সেই যুগের তীর্থযাত্রার একটি সুন্দর চিত্র। এই দুইটি গ্রন্থ পড়িলে অনেক খবর জানা যায়।

তীর্থমঙ্গলগ্রন্থে অষ্টাদশ শতাব্দীর বৃহত্তর বঙ্গের তথ্য পাওয়া যায়। গোকুলচন্দ্র সেন মহাশয় তখনকার দিনে বহু প্রদেশে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠাকে স্থাপিত করিতে পারিয়াছেন।

জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, মেঘনাদ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষী বিজ্ঞানের সাধনায় ভারতের বাহিরে বাংলাকে পরিচিত করাইয়াছেন।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে তরু দত্ত, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি লেখিকারা বাংলার সাধনাকে বিদেশীর কাছে উপস্থিত করিয়াছেন; কিন্তু এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের তুলনা নাই। তিনি পৃথিবীর সর্বত্র আমাদের মাতৃভূমির নাম সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। ব্রজেন্দ্র শীল, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্র দাশগুপ্ত, মহেন্দ্র সরকার প্রভৃতি পণ্ডিতের দল নানা দেশের সঙ্গে ভারতের যোগ স্থাপন করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনের কাজে আশুতোষ বাঙ্গালীর কীর্তিকে উজ্জ্বল করিয়াছেন।

ভারতীয় রাজনীতিতে পূর্বে সুরেন্দ্রনাথ, অম্বিকাচরণ, আনন্দমোহন প্রভৃতি ছিলেন। পরে চিত্তরঞ্জন, বিপিন পাল প্রভৃতিও কম কাজ করেন নাই।

সারা পৃথিবীর সঙ্গে ভাবের যোগ-স্থাপনা করার জন্য রবীন্দ্রনাথের যে সাধনাভূমি বিশ্বভারতী তাহা বাংলা দেশকে দেশবিদেশের বহু জ্ঞানী ও সাধকের চরণরেণুতে ধন্য করিয়াছে।

ভারতীয় চিন্তাধারার প্রতি জগতে একটু ঔৎসুক্যও জাগিয়াছে মনে হয়। সেদিন অধ্যাপক কালিদাস নাগ বলিতেছিলেন, "সারা জগৎ ভ্রমণ করিলাম, সর্বত্র লোকের ইচ্ছা—জানেন ভারতের মর্মের কথাটি কি?"

বর্তমান কালের অনেক লোকেরই নাম এখানে করা গেল না। সেইসব অভাব পরে অন্য সকলে পূর্ণ করিবেন।

তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে এই কথা বলিয়া রাখি, আজ আমাদের তীর্থ শুধু ভারতে বা ভারতের নিকটস্থ দেশে মাত্র নহে, আজ সর্বজগতে আমাদের তীর্থ। সেখানে নানাবিধ সাধনা দিতে ও নিতে আমাদিগকে যাইতে হইবে। প্রাচীন কালে আপন আশ্রমে তাপসগণ যেমন তপস্যা করিতেন, তেমনি দেশদেশান্তরে

ভ্রমণ করিয়া সেই তপস্যাকে বিস্তৃত ও গভীর করিতেন। উভয়বিধ সাধনাই তপস্যার জন্য প্রয়োজন। বাঙ্গালীও যেন তাহার তপস্যাতে সেই কথা বিস্মৃত না হয়।

বাংলায় কয়টি সাধনার অর্ঘ্য

সাহিত্যে গৌড়ী একটি রীতিই ছিল। ওজঃ প্রকাশক বর্ণে, শব্দাড়ম্বরে, সমাস-সমারোহে এই রীতির বৈশিষ্ট্য।

বাংলার ভাস্কর্যেও এই রীতির অপূর্ব প্রকাশ পাই তাহার কীর্তিমুখ মূর্তিগুলিতে। কীর্তিমুখ মূর্তি বোধহয় উত্তরবঙ্গ বরেন্দ্র ও পশ্চিমবঙ্গেই বেশি। আর ছত্রমুখ মূর্তিগুলি সাধাসিধা কিন্তু ভাবগাম্ভীর্যে ও কলানৈপুণ্যে অতুলনীয়। পূর্ববাংলাতেই এইরূপ মূর্তি বেশি পাওয়া যায়। বাংলার প্রাচীন চিত্রসম্পদও চমৎকার। অজন্তা, নারা, হরিয়ুজিতে বাংলার ধরণের চিত্রই বেশি দেখা যায়। তাহার টান ও রীতি শিল্পীরাও মনে করেন বাংলার। অজন্তা প্রভৃতি চিত্রের মধ্যে গাছপালা ভাবভঙ্গী প্রভৃতি সেই দেশের সঙ্গে তত মেলে না যত মেলে বাংলা দেশের সঙ্গে।

বাংলা দেশে গ্রামে গ্রামে এখনও পটুয়ারা পট দেখাইয়া গান করিয়া ধর্মকে সচিত্র করিয়া প্রচার করেন। ইহা জৈনদের মধ্যেও আছে। বৌদ্ধ-প্রচারকদের ইহা অতিশয় প্রিয় পন্থা। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু বলেন তিব্বত এমন কি চীনেরও গুটান পটগুলির পদ্ধতিতে পুরাতন বাংলার ধরণই দেখা যায়। কাংড়া প্রভৃতিতেও এই ধরণ আছে, তাহার হেতু আছে। পূর্বে যেসব যোগী সাধুরা পট দেখাইয়া বেড়াইতেন তাঁহাদের মস্করী বলিত।

যাঁহারা বাংলা দেশের এইসব প্রাচীন কলার বিষয়ে একটু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের আইকনোগ্রাফি পুস্তক পড়া উচিত। অধুনালুপ্ত রূপম পত্রিকায় স্টেলা ক্রামরিশ ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে এই সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ফ্রেঞ্চ সাহেব কৃত পাল আর্ট নামক পুস্তকখানিও দ্রষ্টব্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা এই বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

জৈনদের পুরাতন প্রবন্ধ সংগ্রহে অভয়দেব স্যূরি প্রবন্ধে গৌড়শ্রাবকের প্রতিমাত্রয় রচনার কথা দেখিতে পাই।[১]

বাংলা দেশের তন্ত্রের মত যাদুটোনা প্রভৃতি বিদ্যায় চিরদিনই গৌড়দেশের খ্যাতি আছে।

প্রবন্ধ-চিন্তামণিগ্রন্থে আছে, একজন ব্যবসায়ী তার পত্নীকে ছাড়িয়া উপপত্নীর পায়ে আপনাকে বিকাইয়া দেয়। পত্নী তাহার প্রতিকারের জন্য একজন গৌড়-দেশীয়ের শরণাপন্ন হন। গৌড়দেশীয় যাদুবিদ্যাপণ্ডিত তাঁহার স্বামীকে গোরূপে পরিণত করিয়া তাঁহার হাতে দেন। পরে শিবকৃপায় সেই পতি পুনরায় মানুষরূপ লাভ করেন।[২]

ঐ গ্রন্থাবলীরই অন্তর্গত পুরাতন প্রবন্ধ সংগ্রহে ৩২০ নম্বর কথায় এই গল্পটি আছে।

হেমচন্দ্র চরিতে এই গল্পটি আচার্য বূলার ব্যবহার করিয়াছেন।

গানে এক সময় সারা ভারতকে প্লাবিত করিয়াছিল জয়দেবের গীতগোবিন্দ, আর এখনও সারা জগৎ ব্যাপিয়া চলিয়াছে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। তাঁহার কাব্যের ভাষা বাংলা, তাহাও অনুবাদের সাহায্যে সর্বত্র গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার গানের সুর, নৃত্যের ঐশ্বর্য, চিত্রের ব্যঞ্জনা, বাংলার সীমাকে অতিক্রম করিয়া সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে।

গৌড় নামটাই অনেকে মনে করেন গুড় হইতে উৎপন্ন। আর্যেরা যখন ভারতে আসেন তখন তাঁহারা মধুরই ব্যবহার জানিতেন। ভারতে আসিয়া দেখিলেন আর্যপূর্ব প্রাচ্য জাতির মধ্যে ইক্ষুর প্রচলন। ইক্ষুর নাম কি দেওয়া যায়? ইষু বা শর শব্দ দিয়াই তাহার নাম হইল। পৌণ্ড্র জাতির সহিত ইক্ষুর যে সম্বন্ধ তাহা বুঝা যায় ইক্ষুর নাম পৌড্রা হইতে। গুড় হইতে উৎপন্ন যে চিনি তাহার নাম শর্করা বা বালুকা। বালুকা ছাড়া ঐ বস্তুর আর কি নাম তাঁহারা দিতে পারেন? এইসব কারণেই আমাদের প্রাচীন মেধ্য বস্তুর মধ্যে মধুরই সমাদর। গুড় চিনির স্থান অনেক নীচে। পৌণ্ড্রা বাংলার মানুষ।

তার পরই হইল কার্পাস। ভাষাতত্ত্ববিদেরা বলেন কার্পাস শব্দ আর্য-পূর্বভারতীয়দের। নানার্থ-শব্দ-কোষকার মেদিনীকর বলেন কার্পাসের এক নামই "বঙ্গ"। বাংলাই কার্পাস বস্ত্রের জন্য খ্যাত ছিল। মসলিনের প্রসঙ্গে এখনও বাংলার নাম। আর্যগণ তাঁহাদের ব্যবহৃত পশমকে পবিত্র মনে করেন। কার্পাস বস্ত্রের সেই সম্মান নাই।

রাং ও সিন্দুর বাংলাতেই মিলিত। তাই রাংকে বলে বঙ্গ। এখনও ব্রহ্মদেশ, মালয় প্রভৃতি যত পূর্বদিকে যাওয়া যায় ততই রাং বেশি মেলে। তখনকার দিনে বাংলা দেশই ছিল রাং মিলিবার মত স্থান।

সিন্দুরও বাংলাতে মিলিত। তাই বাংলাতে মাঙ্গলিক কর্মে সিন্দুরের ব্যবহার। বেদে সিন্দুরের উল্লেখ নাই। তাই বিবাহের সময় বা ঘটস্থাপন-কালে যে বৈদিক মন্ত্র পড়া হয় তাহার সঙ্গে সিন্দুরের কোনো যোগই নাই। সিন্দূরের মত শোনা যায় বলিয়া এই মন্ত্রটি পড়া হয়—মন্ত্রটি শুদ্ধ করিয়া লেখা হইল—পুরোহিত দর্পণ, ৮ পৃষ্ঠা।

সিন্ধোর্ উচ্ছ্বাসে পতয়ন্তম্ উক্ষণম্॥ ইত্যাদি

ঋগ্বেদে ৯, ৮৬, ৪৩

অথর্ব ১৮, ৩, ১৮

সেখানে সিন্ধুনদের উচ্ছ্বাসের কথা! মাত্র ধ্বনিসাম্যের জন্য এই মন্ত্র দিয়াই সিন্দুর দানের মন্ত্রের কাজ চালান হয়।

শঙ্খের কাজও বাংলায় প্রসিদ্ধ। বাংলার বাহিরে এই দেশের শঙ্খের কাজের নাম আছে।

হস্তীবিদ্যায়ও বাংলার বড় স্থান। হাতীর দাঁতের কাজ এদেশে ভাল। মাহুতদের চালনাশব্দ দুর্বোধ্য ভাষায়। ইহা হয় তো প্রাচীন কোন প্রাচ্য ভারতের ভাষা।

নৌ-চালনে ও নৌকা, জাহাজ নির্মাণে বাংলার বিশেষ নাম ছিল।

পারদের ব্যবহারও অতি প্রাচীন কালে বাংলা দেশেই ছিল বেশি। পরে আয়ুর্বেদের যুগে রসক্রিয়ার জন্য বাংলারই নাম ছিল। সেদিনও বাংলার বাহিরের কবিরাজেরা রস পাক করিতে চাহিতেন না। মনে করিতেন, তাহাতে বংশ থাকে না। তাই চিরদিনই বাংলার বাহিরে বাংলার রসপাকের আদর। রস অর্থ পারা।

নানার্থ শব্দ-কোষকার মেদিনী-করের কথায় মনে হয় তরকারী বেগুনও বাংলার দান। কারণ বেগুনের এক নাম "বঙ্গ"। তাহা হইতেই কি "বংগণ" 'বেগুন' হইয়াছে?

ভারতের সেবায়

দেশের সেবা দেহের স্বাস্থ্য ও জ্ঞানধর্ম প্রভৃতি নানা কল্যাণের ক্ষেত্র রহিয়াছে।

আয়ুর্বেদের প্রচার হইয়াছে এই বাংলা দেশ হইতেই। এখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলেও সব দেশ হইতে অল্পদিন পূর্বেও সবাই আয়ুর্বেদ শাস্ত্র পড়িতে আসিতেন বাংলা দেশে। রাজপুতানায় গিয়া দেখি দাদূপন্থী সাধু লক্ষ্মীদাস বৈদ্য প্রভৃতি অনেকে দ্বারিক কবিরাজের ছাত্র। ভারতের সর্বপ্রদেশে বাঙ্গালী কবিরাজের ছাত্র পাইয়াছি।

নব্য ন্যায়ে বাংলাই সকলকে শিক্ষা দিয়া আসিতেছে। এত যে সব সদাচারী দক্ষিণী পণ্ডিত তাঁহারাও নব্য ন্যায়ের একটি "ফাঁকী" আদায় করিবার জন্য বাঙ্গালী গুরুর হুকাকল্কী সাজাইয়া নিত্য সেবা করিয়াছেন। এই কথা আমার গুরু মহামহোপাধ্যায় গঙ্গাধর শাস্ত্রীর কাছে শুনিয়াছি।

বিনামূল্যে শাস্ত্র গ্রন্থ প্রচারে বোধ হয় বাঙ্গালী কালীপ্রসন্ন সিংহই প্রথম পথ দেখান। বহু অর্থব্যয় করিয়া তিনি, বর্ধমান রাজ প্রতাপচন্দ্র রায়, তাড়াসের রাজর্ষি বনমালী রায়, শাস্ত্র-প্রচারের পথ দেখান।

পূর্ব ভারতের সর্বপ্রদেশে বাঙ্গালী ডাক্তারেরই নাম ছিল। এখনও সেই সুনাম যায় নাই। আইনেও বাঙ্গালীর খ্যাতি আছে। অবশ্য এখন নানা প্রদেশেই ভাল ভাল ডাক্তার ও আইনজ্ঞ হইয়াছেন। কিন্তু এক সময় বাঙ্গালীই ইহাতে অগ্রগণ্য ছিলেন।

ভারতের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার কেন্দ্র বাংলা দেশ। এখনও অন্য কোনো প্রদেশে ইহার প্রসার বাংলার কাছেও লাগে না। ভারতের সর্ব প্রদেশ হইতে ছাত্রেরা আসেন বাংলা দেশে হোমিওপ্যাথি শিখিতে।

ভারতের প্রত্নবিদ্যায় প্রধান ভারতীয় আদিগুরু রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র। এখনো এই ক্ষেত্রে যিনিই হাত দিবেন তিনিই তাঁহার প্রবর্তিত পথে না অগ্রসর হইয়া পারিবেন না। তাঁহার মনীষা ও পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। তাঁহাকে যে দেখিয়াছে, সে-ই তাঁহার প্রতিভার ঐশ্বর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। এখনও নানা প্রদেশে তাঁহার প্রবর্তিত পথেই কাজ চলিয়াছে। তার পরই নাম করিতে হয় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর। ইনি নেপাল প্রভৃতি স্থানের পুঁথির খোঁজ করিয়া আমাদের সংস্কৃতির অনেক নিগূঢ় সত্য দেখাইতে পারিয়াছেন। শরৎচন্দ্র দাস

ও সতীশ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তিব্বতীয় শাস্ত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করিয়াছেন। এখন যাঁহারা এই কাজ করিতেছেন তাঁহাদের নাম আমি স্থানান্তরে করিয়াছি।

প্রত্নতত্ত্বের কথা হইলেই মহারথী রাখাল দাসের নাম মনে আসে। মোহেঞ্জো-দরো প্রভৃতি স্তূপের সন্ধান ও ভিতরের রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতম সব সাক্ষ্য তিনি সকলের গোচরে আনিয়াছিলেন। এমন অতুলনীয় প্রতিভা লইয়া তিনি যে এত অল্পদিন কাজ করিবার সুযোগ পাইলেন সে দুঃখ আর বলিবার নহে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দীনেশ সেন বহু শ্রম করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বেও অনেকে এই কাজে হাত দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইহাকে জীবনের সাথী করিয়া লইলেন। বাংলা ছাড়াও অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্যের ইতিহাস-চর্চায় সে সব স্থানে এখন অনেকে লাগিয়াছেন। সব প্রদেশের কাজ সম্পূর্ণ হইলে আমরা নিজেদের আরও অনেক ভাল করিয়া জানিতে পারিব।

এই সঙ্গেই শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাংলা ভাষার সম্বন্ধে আলোচনার কথা বলা উচিত। তিনি ভারতীয় সকল প্রদেশের ভাষার তত্ত্বানুসন্ধানীদের নূতন পথ দেখাইয়াছেন। এইরূপ সুন্দর আলোচনা য়ুরোপীয় কোনো ভাষার সম্বন্ধেও পাওয়া কঠিন।

বাংলা সাহিত্য পরিষদের জন্য রামেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতি মনীষীরা যাহা করিয়াছেন তাহা দেখিয়া অন্যান্য প্রদেশের উদ্যোগী সাধকগণ নূতন আলোক পাইয়াছেন। এখন অনেক প্রদেশেই নানা নামে সব সাহিত্য পরিষদের কাজ চলিয়াছে।

এইখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। হিন্দী সাহিত্য পরিষৎ অর্থাৎ নাগরী প্রচারিণী সভা বৎসরে বৎসরে যে কতগুলি হস্তলিখিত পুঁথির সন্ধান ও পরিচয় সম্বন্ধে কয়খণ্ড পুস্তক লিখিয়াছেন তাহার মূল্য বলিয়া শেষ করা যায় না। হিন্দী ভাষার একটি সুবিধা আছে তাহার পৃষ্ঠপোষক বহু রাজা ও ধনী শ্রেষ্ঠী। এই সব কাজে বহু অর্থ পাওয়া যায়। বাংলা দেশে এই সব কাজ মধ্যবিত্ত পণ্ডিতদেরই দায়। ধনীরা আজও অনেকে তেমন করিয়া সাড়া দেন নাই। হিন্দী পুস্তকের কাটতিও বেশি হয়। তবু বাংলা দেশ এই বিষয়ে উদাসীন থাকিলে চলিবে না।

জাতীয় জীবনের গঠনের জন্য যে সুলভ সংবাদপত্রের প্রয়োজন তাহাও বহু পূর্বে বাংলা দেশে অনুভূত হয়। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান রিফর্ম

এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। তাহাতে সুলভ সাহিত্য ও সংবাদপত্র ছাপার প্রয়োজন স্বীকৃত হয় ও ঐ বৎসর ১৫ই নবেম্বর ১লা অগ্রহায়ণ ১৮৭০ সালে এক পয়সার কাগজ 'সুলভ সমাচার' প্রকাশিত হয়। এক সময়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ভারতের সকল প্রদেশের মাসিক পত্রের পথপ্রদর্শক গুরু।

কাব্য, সাহিত্য, নাটক, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, কৃষি, জ্যোতিষ, জীববিদ্যা, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ে ভাল ভাল গ্রন্থ-প্রচার-মণ্ডলী ও অনুবাদক সঙ্কলন ও সংগ্রাহক মণ্ডলী গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজন। বাঙ্গালীদের ভাল বই কিনিবার অভ্যাস আরো বাড়াইতেই হইবে। এই বিষয়ে বিশেষ করিয়া দক্ষিণ ভারতীয়েরা খুব অগ্রসর।

প্রাচ্য-প্রতীচ্য পরিচয়ের পরে সমাজ সংস্কারেরও প্রথম উৎসাহ দেখা দিয়াছিল বাংলায়। মহাপ্রভুর জাতি পঙক্তি নির্বিশেষে ধর্মদীক্ষা দিবার কথা নাই বলিলাম। রামমোহনের সতীদাহ নিবারণ চেষ্টা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ আন্দোলন প্রথম ঘটিয়াছিল এই বাংলা দেশে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে লোকসেবার জন্য যে সব সঙ্কট-ত্রাণের কাজ ভারতবর্ষে এখন সর্বত্র দেখা যায়, তাহারও প্রথম আবির্ভাব এই বাংলা দেশে। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ঘোর দুর্ভিক্ষ হয়। কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে এইরূপ একটি সেবাশ্রমের আয়োজন হয়। তাহাতে ডাক্তার ডাফ্ও উৎসাহ দেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঐ তহবিলে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন। সাধারণ লোকও সকলেই যথাসাধ্য সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহার পর বৎসর নবেম্বর মাসে বাংলা দেশে যে জ্বরের মহামারী লাগে তাহাতেও কেশবচন্দ্র এইরূপ একটি লোকসেবার আয়োজন করেন। অনেক দিন পর্যন্ত এই কাজে ব্রাহ্ম সমাজই ছিল অগ্রণী; পরবর্তীকালে লোকসেবার এই পবিত্র কাজে ভাল করিয়া হাত দেন রামকৃষ্ণ মিশন। দেশের যুবকেরাও এই সেবাকর্মে বিশেষভাবে আত্মসমর্পণ করেন। এই ব্রতটি এখন ভারতের সর্বপ্রদেশেই ব্যাপ্ত হইয়াছে। অবাঙ্গালী বহু প্রদেশে এই ব্রতের দ্বারা বাংলার যুবকেরা সকলের চিত্ত জয় করিয়াছেন।

১৮৬২ সালে ১৩ই এপ্রিল তারিখে স্ত্রীলোকেরাও অবরোধ প্রথা লঙ্ঘন করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে যোগ দেন। দক্ষিণ ভারতে স্ত্রীলোকের অবরোধ নাই। উত্তর ভারতে ঢেড় রাজভক্তের সম্প্রদায় ছাড়া আর কোথাও নারীদের এই স্বাধীনতা ছিল না। কাজেই সারা উত্তর ভারতের জন্য বাংলা দেশের এই

উদ্যম একটি স্মরণীয় ঘটনা। রাজনীতির ক্ষেত্রে কাজ করিতে গিয়াও অবরোধ প্রথার বন্ধন অনেক কমিয়াছে।

১৮৬৪ সালে বাংলা দেশে প্রথম ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ হয়, অবশ্য ব্রাহ্ম সমাজের উদ্যোগে।

বাংলার শিল্পী

বাংলার শিল্প পাষাণে, ইষ্টকে, দারুতে, মাটির মূর্তিতে ও অলঙ্করণে অনুপম। গ্রামে গ্রামে যেসব প্রতিমা ও মূর্তি মাটির নীচে পাওয়া যায় তাহার তুলনা হয় না। বিক্রমপুর সোণারঙ্গ গ্রামে প্রাপ্ত একটি অর্ধনারীশ্বর মূর্তি এখন রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে আছে। তাহার মাধুর্য মহত্ত্ব যিনি দেখিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। একটি আধটি মূর্তির নাম করিলে বৃথা অন্যায় করা হয়। কিন্তু শিল্পিগণের কোনো পরিচয় নাই। বলিতে গেলে ঐ ধীমান ও বীতপাল। তাঁহাদের কথা লামা তারানাথের কৃপায় এখন সর্বজনবিদিত। নূতন বলিবার কিছুই নাই।

মহারাজা বিজয়সেনের দেরপাড়া লিপির অন্তভাগে রায়েন্দ্রক শিল্পিগোষ্ঠী চূড়ামণি রাণক শূলপাণির নাম পাই। তাঁহার পিতার নাম বৃহস্পতি, পিতামহ মনদাস, প্রপিতামহ ধর্ম।

ধর্মো প্রণপ্তা মনদাস নপ্তা বৃহস্পতেঃ সূনুরিমাং প্রশস্তিং।
চখান বারেন্দ্রক শিল্পি গোষ্ঠী চূড়ামণি রাণক শূলপাণিঃ ॥৩

প্রত্যেকটি তাম্রশাসনের অন্তভাগে আবার খোদাইকার শিল্পীর নাম পাই, অনেক স্থলে তাহাদের বংশপরিচয়ও আছে। এইসব খোদাইকারদের মধ্যে কেহ কেহ ভাল শিল্পীও ছিলেন। বাহুল্য ভয়ে তাঁহাদের নাম আর করা হইল না।

মহীপাল দেবের সারনাথ পাষাণ লিপিতে শিল্পী অনুজ বসন্ত পাল ও স্থির পালের নাম পাওয়া যায়।[৪]

চিত্রকলায় এখনকার দিনেও অবনীন্দ্র, নন্দলাল প্রভৃতি শিল্পাচার্যরা নবযুগ সৃষ্টি করিলেন। প্রথমে এই গোষ্ঠী সম্পর্কে দেখিয়াছি বহু বিরুদ্ধতা। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহারা তাঁহাদের চিত্ত প্রসন্ন করিয়া গুরুর কাছে এই বিদ্যা শিখিতে রত হইয়াছেন।

বাদশারা বাঙ্গালী কারিগরকে লাহোরে ও এলাহাবাদে বাস করাইয়াছেন। ব্রহ্মরাজরা বাঙ্গালী শিল্পীদের ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

সোণা-রূপার কাজে বাংলার খ্যাতি আছে। বোম্বাই, গুজরাতের ছোট ছোট পল্লীতেও দেখিয়াছি ঢাকার স্বর্ণকার। শিখদের ইতিহাসেও বাংলার শিল্পীদের নৈপুণ্যের কথা আছে।

প্রমাণ-পঞ্জী

১ সিংঘী জৈন গ্রন্থমালা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৯৬

২ সিংঘী জৈন গ্রন্থমালা

৩ শ্লোক ৩৬, পৃ ৪৯

৪ ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারি ১৪ খণ্ড, পৃ ১৩৯

সংস্কৃতির দেহসঙ্কোচ

কর্তৃপক্ষের শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ক্রমেই বাংলাদেশ সঙ্কুচিত হইতেছে। উড়িষ্যা ও আসামের ভাষা বাংলা হইতে যতটা ভিন্ন তার চেয়ে অনেক বেশি তফাৎ তথাকথিত হিন্দীর পশ্চিম ও পূর্ব ভাষায়, স্থানীয় কথিত ভাষায়। মিথিলার অক্ষর ও ভাষার গঠন সবই বাংলা। তবু তাহাদের বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইল। ন্যায়শাস্ত্রে, শিক্ষায়, সংস্কারে, আচারে-ব্যবহারে খাদ্যে সর্বত্র মিথিলা ও বাঙ্গলা যুক্ত।

পুরাতন সরকারী কাগজপত্রেই দেখি গোরক্ষপুরের ভাষাকেও পুরাতন রাজপুরুষেরা হিন্দী অপেক্ষা বাংলার সঙ্গেই বেশি সাদৃশ্যযুক্ত বলিয়াছেন।

"দি ল্যাঙ্গোয়েজ অব দি পিপল ইজ এ পিকুইলিয়ার ভ্যারাইটি অব দি ভোজ-পুরী ডায়ালেক্ট, ইট ইন মেনি কেসেস এপ্রোচেস বেঙ্গলি রাদার দ্যান হিন্দী।"[১]

সারা ভোজপুরী ভাষাভাষী বিহার ও বালিয়া জেলার সম্বন্ধে এই কথা বলা চলে।

আরও একটু পুরাতন খোঁজ নিলে দেখা যায় উৎকলের ওঙ্গোল বাংলারই মধ্যে ছিল। দক্ষিণের লোকেরাই ইহাকে বঙ্গরোলু বা বঙ্গগ্রাম নাম দিয়াছিলেন। বঙ্গরোলু হইতেই ওঙ্গোল নামের উদ্ভব।[২]

কর্ণূল, নেল্লোর ও কৃষ্ণাকে পুংগী বলিত। কেহ কেহ মনে করেন পুংগী কথার সঙ্গে বঙ্গের যোগ আছে।[৩]

প্রথম রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় শিলাশাসনে দশম পঙক্তিতে রাজা গোবিন্দ চন্দ্রের সদা ঝড়বৃষ্টিময় দেশকে বঙ্গাল দেশ বলা হইয়াছে।

এলাহাবাদ জেলায় গোহরা গ্রামে প্রাপ্ত কর্ণদেবের তাম্রশাসনে দেখা যায়, বঙ্গকে বঙ্গাল বলা হইয়াছে।[৪]

উড়িষ্যার সম্বলপুর জেলায় সোণপুরে তিনটি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। সতলমাতেও একটি লেখ পাওয়া যায়। শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাহার পাঠোদ্ধার করিয়া এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকার একাদশ খণ্ডে তাহা প্রকাশ করেন। ঐ লেখগুলিতে বারবার দেখা যায়, তখন উড়িষ্যায় ঋ-কারের উচ্চারণ বাংলার মত "রি" ছিল, "রু" ছিল না।

এই "রু" উচ্চারণটি নাকি আরম্ভ হয় উড়িষ্যায় গাঙ্গ রাজাদের রাজত্বকালে।

এই স্থানগুলি এখন উড়িষ্যা ও কোশল দেশের মধ্যে অবস্থিত। তখনকার দিনে ইহা কোশলেরই অন্তর্গত ছিল।

বহুদিন পূর্ব্বেই শ্রীযুত টমাস বলিয়াছেন যে এই সব দেশের তখনকার অক্ষরগুলির সঙ্গে বঙ্গাক্ষরের অনেক স্থানেই মিল, কোনো কোনো স্থানে অক্ষরগুলি একেবারে এক। যুক্তাক্ষর ক্র, ঙ্গ, শ্চ, তু, ফ প্রভৃতি একেবারে এক। পাল ও সেন রাজাদের লেখাক্ষরের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে বঙ্গ ও উড়িষ্যা অক্ষরের ক্রম পরিণতি বুঝা যায়।

তখন বহু বাঙ্গালী কায়স্থ রাজকর্মচারী রাজা জন্মেজয় ও তাঁহার পরবর্তীদের সময় সেই দেশে বাস করিতেন। তাঁহাদের উপাধি, ঘোষ, দত্ত, নাগ প্রভৃতি। কৈলাস ঘোষ, তৎপুত্র বল্লভ ঘোষ, তৎপুত্র কোই ঘোষ, বীরদত্তের পুত্র মল্লদত্ত, জন্মেজয়ের কর্মচারী ছিলেন। চারু দত্ত, উচ্ছব নাগ, অল্লব নাগ রাজা যযাতির অধীনে কাজ করিতেন। সিংগ দত্ত, মঙ্গল দত্ত ছিলেন ভীমরথের কর্মচারী। উড়িয়া কায়স্থদের মধ্যে এইসব উপাধি নাই। ইঁহারা যে বাঙ্গালী কায়স্থ তাহা বুঝা যায়।

১৯০৮ সালে কুমার সোমেশ্বর দেবের তাম্রশাসন একটি ক্ষেত্রে হলকর্ষণের সময় পাওয়া যায়। তাহারও পাঠোদ্ধার শ্রীবিজয় মজুমদার মহাশয় করিয়াছেন। ঐ শাসনগুলির মধ্যে কোনো কোনোটি হারাইয়া যাওয়ায় পরবর্তী কালে নূতন শাসন তৈয়ারী করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহার মধ্যে যে ভুল হইয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, যে আদর্শ অনুসারে খোদনকার্য করা হয় তাহার অক্ষরগুলি ছিল বাংলার অনুরূপ।[৫]

১৮৯০ সালে রাজা যোগেশ্বর দেববর্মার তিনখানি তাম্রশাসন সোণপুর রাজ্যের মধ্যে মহড়া গ্রামে পাওয়া যায়। এগুলিরও পাঠোদ্ধার করেন শ্রীবিজয় মজুমদার মহাশয়। এই শাসনের অক্ষরগুলি এখনকার বাংলা অক্ষরের অত্যন্ত কাছাকাছি। এই শাসনে ঋ-কারের উচ্চারণ "রু"র মত। কারণ উৎকলে গাঙ্গ রাজাদের সময় এই উচ্চারণটি প্রচলিত হয়।

এই শাসন খুব পরবর্তী কালের। কারণ গণনার দ্বারা দেখা যায় ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই জানুয়ারী রবিবারে মাঘী শুক্লা সপ্তমীতে এই শাসন প্রদত্ত হয়।

মিথিলার সর্বভাবেই যোগ বাংলাদেশের সঙ্গে। তাহাদের বেশভূষা, খাদ্য, সংস্কৃতি এমন কি অক্ষর পর্যন্ত বাংলা। বিদ্যাপতি সে-দেশের হইলেও তাহা

বাঙ্গালীর ধন। মহাপ্রভুর পূর্ব হইতেও বাঙ্গালীরাই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়া আজ পর্যন্ত জীবন্ত রাখিয়াছেন। হঠাৎ বাঙ্গালীরা তাঁহার উপর সব দাবী ছাড়িলেন। যাঁহারা দাবী করিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে মিথিলার যোগ অনেক কম।

উড়িষ্যার বহু বৈষ্ণব লেখক বাংলায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

হৃদয়ানন্দ অর্থাৎ অনন্ত কৃত রামায়ণ আসামে প্রচলিত। তাহা বিশুদ্ধ বাংলায় লেখা। তখন ভাষার এই ভেদ হয় নাই।

বাংলায় ও আসামে উভয় দেশেই একই ডাকের বচন প্রচলিত। রাজপুতানাতেও ডাকের বচন প্রচলিত ছিল। যথা—

পরভাতে মেহ ডংবরা সাঁঝে সীলা বার।
ডংককাই, সুণ ভড্ডলী, কায়তেণাঁ সডার॥

'প্রভাতে মেঘাড়ম্বর, সন্ধ্যায় শীতল বায়ু যদি বহে তবে ডংক (ডাঁক) কহেন, সুন ভড্ডরী, তাহা অকালের লক্ষণ।'[৬]

কাজেই দেখা যায় বাংলাদেশ ও বাংলা সংস্কৃতি বহুবিস্তৃত ছিল। তাহার পরও ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভে যতটা ছিল, ক্রমশই একে একে আমরা তাহা হারাইয়াছি। এই যে আমরা সকলকে হারাইয়াছি তাহার মধ্যে কি আমাদের কিছু দোষ নাই। আমাদের মধ্যে অনেকে অন্য প্রদেশের লোকের প্রতি যথোচিত প্রীতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাইতে পারেন নাই। সেই সব দেশের ভাষা, সাহিত্য, সামাজিক রীতিনীতি আলোচনার ধার অনেক স্থানে তাঁহারা ধারেন না। যোগ হইবে কেমনে?

আসাম, মণিপুর, কাছাড় এমনকি আরাকানেও বাংলা ভাষা প্রচলিত ছিল। উড়িষ্যায় চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি বাংলা গ্রন্থ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত পঠিত হইত। বিলাসপুরের কৃষকদের মধ্যেও কাশীদাসী মহাভারতের চলন আছে তাহা আমি জানি।

বাংলা দিনদিনই তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হারাইয়া ক্ষীণ হইতেছে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রকেও তাহাতে সঙ্কীর্ণ করা হইতেছে। কিন্তু হিন্দী ভাষার মধ্যে মিথিলা, রাজস্থানী, ডিংগল, পঞ্জাবী, মলৱাই, পোটোহর প্রভৃতি সবই আসিয়া পড়িতেছে।

আমরা নিজেদের দোষেও অনেককে হারাইয়াছি এবং এখনও ক্রমে হারাইতেছি। ছোটনাগপুর, রাঁচী প্রভৃতি স্থান পর্যন্ত ঝাড়খণ্ডে সব অধিবাসীদের ভাষা বাংলাই ছিল। এখন যখন তাঁহাদের বাংলার কোল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া

লওয়া হইল তখন উচিত ছিল তাঁহাদের সঙ্গে যোগটি রক্ষা করা। রাঁচী জেলার মধ্যে বুংভুর দিকে বাংলা কথা, কীর্তন প্রভৃতি আজও চলিয়া আসিতেছে। মহাপ্রভু নাকি ঝাড়খণ্ড দিয়া যাইবার সময় এই বুংভুতে একরাত্রি যাপন করেন, তাই সেখানে তাঁর মন্দির বিরাজিত।

মানভূম হাজারীবাগের সরাক বা শ্রাবকদের কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। তাঁহারা বেশভূষায়, ব্যবহারে ও ভাষায় সর্ববিষয়েই বাঙ্গালী। বাংলা লেখাপড়ার চর্চাও তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত।

এখন তাঁহারা বাংলা বর্ণমালার সঙ্গে পরিচয় হারাইয়া হিন্দী বর্ণমালার সঙ্গেই পরিচিত হইতে বাধ্য হইতেছেন। তাহাতেই তাঁহাদের লেখাপড়ার কাজ করিতে হইতেছে।

প্রমাণ-পঞ্জী

১ স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেস্ক্রিপসন এণ্ড হিস্টরিক্যাল একাউণ্ট অব দি নর্থ ওয়েস্টার্নভ প্রবিন্সেস অব ইণ্ডিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৩৭২

২ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা—জে. রামায়া, ৮ম খণ্ড, পৃ ১০

৩ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা

৪ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, নবম খণ্ড, পৃ ১৮২

৫ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, দ্বাদশ খণ্ড

৬ রাজস্থানরা দুহা, নরোত্তম স্বামী ; ৯, ১, ২

মুক্তযাত্রা

যখন ব্যক্তি বা জাতি তাহার বাহিরের বিচরণকে সঙ্কোচ করিয়া আপনার মধ্যে আপনি বদ্ধ থাকিবার আয়োজন করে তখন বুঝিতে হইবে, তাহার মৃত্যু আরম্ভ হইয়াছে। তাই আমাদের সমস্ত পুরাতন গুরুগণ ক্রমাগত আমাদিগকে ডাক দিয়াছেন বাহিরের দিকে। "সকল সীমা অতিক্রম করিয়া বাহির হও"— ইহাই তাঁহাদের মন্ত্র। বাহিরের জন্য এই তাগিদই আমাদের সনাতন মন্ত্র। সীমার মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকার মন্ত্র আসল সনাতন নহে, তাহা নূতন যুগের সনাতনী মত।

ঐতরেয় ব্রাহ্ম[illegible]ল ঋগ্বেদের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে একটি উপাখ্যান দেখিতে পাই।

রাজা রোহিত বাহির হইয়াছিলেন বিশ্বের মুক্তপথে। শ্রান্ত হইয়া যখন তিনি গৃহে ফিরিতে উদ্যত, তখন দেবতা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে তাঁহার পথরোধ করিয়া বলিলেন,—

নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি রোহিত শুশ্রুম।
পাপোনৃষদ্বরো জন ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা॥
চরৈবেতি চরৈবেতি—

যে লোক চলিতে চলিতে শ্রান্ত তাহার শ্রীর আর অন্ত নাই, হে রোহিত, এই সনাতন সত্যই আমরা চিরদিন শুনিয়াছি। শ্রেষ্ঠজনও যদি মানুষের মধ্যে বসিয়া থাকে তবে সে হীন ও দীন হইয়া যায়। যে অগ্রসর হইয়া চলে, ইন্দ্র (দেবতা) তাহার সখা। অতএব তুমি অগ্রসর হইয়া চল, তুমি চল অগ্রসর হইয়া।

রোহিত বাধ্য হইয়া ফিরিলেন। কিন্তু বৎসরকাল ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার চলিলেন গৃহের দিকে। পথে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। রোহিত হয়তো ভাবিতেছেন, "এইরূপ ক্রমাগত চলিয়া চলিয়া আর ফল কি ?" ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্র বলিলেন—

পুষ্পিণ্যৌ চরণে জঙ্ঘে ভূষ্ণুরাত্মা ফলগ্রহিঃ।
শেরেঽস্য সর্বে পাপ্যানঃ শ্রমেণ প্রপথে হতাঃ॥
চরৈবেতি চরৈবেতি—

যে ব্যক্তি চলে তাহার পদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইয়া উঠে বিকশিত, তাহার

আত্মার নিত্য হইতে থাকে বিকাশ, এই মস্ত ফলই তো সে করে লাভ। তাহার সমস্ত ক্ষুদ্রতা নীচতাদি পাপ তাহার বিচরণের বেগে মুক্ত পথে পড়ে শুইয়া। অতএব চল অগ্রসর হইয়া, অগ্রসর হও।

আবার রোহিত ফিরিলেন। আবার বৎসরের পর যখন তিনি চলিয়াছেন ঘরের মুখে, পথে সেই ব্রাহ্মণ! রোহিত ভাবিতেছেন, "আমার এ কি দুর্ভাগ্য!" তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন—

আস্তে ভগ আসীনস্যোর্ধ্বস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ।
শেতে নিপদ্যমানস্য চরাতি চরতো ভগঃ॥
চরৈবেতি চরৈবেতি—

যে বসিয়া থাকে তাহার ভাগ্যও থাকে বসিয়া, ... ঠিয়া দাঁড়ায় তাহার ভাগ্যও দাঁড়ায় উঠিয়া, যে শুইয়া পড়িয়া থাকে তাহার ভাগ্যও থাকে শুইয়া পড়িয়া, যে অগ্রসর হইয়া চলে তাহার ভাগ্যও চলে অগ্রসর হইয়া। অতএব আগে চল, আগে চল।

কাজেই রোহিত ফিরিলেন। কিন্তু শ্রান্ত হইয়া আবার যখন বৎসরান্তে তিনি ঘরের দিকে চলিতেছেন, তখন পথে আবার সেই ব্রাহ্মণ! রোহিত মনে করিতেছেন, "এই অগ্রসর হইবার মন্ত্র হয়তো উপযোগী ছিল সত্যযুগে। এখনকার যুগে এই সব উপদেশের কি সার্থকতা আছে?"

তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন—

কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরন্॥
চরৈবেতি চরৈবেতি—

শুইয়া থাকিলেই তো কলিকাল, জাগিলেই তো দ্বাপর, উঠিয়া দাঁড়াইলেই তো ত্রেতাযুগ, চলিতে আরম্ভ করিলেই তো সত্যযুগ। অতএব, চল চল অগ্রসর হইয়া।

আবার রোহিত ফিরিলেন। বৎসর পরে শ্রান্ত রোহিত আবার যখন চলিয়াছেন ঘরের দিকে তখন দেখেন আবার সেই ব্রাহ্মণ! রোহিত ভাবিতেছেন,

"এইরূপ ক্রমাগত চলিয়া ফল হইবে কি? ইহাতে লাভ কি?" ব্রাহ্মণ বলিলেন—

চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্॥
চরৈবেতি চরৈবেতি—

চলাটা-ই তো পরম মধু (অমৃত), চলাটা-ই তো স্বাদু ফল (উডুম্বর)। চাহিয়া দেখ সূর্যের কী অতুলনীয় অফুরন্ত আলোক ঐশ্বর্য! সে যে চলিতে আরম্ভ করিয়া সদাই রহিয়াছে জাগ্রত কখনও পড়ে নাই ঘুমাইয়া। অতএব, চল চল অগ্রসর হইয়া।[১]

বৈদিক ঋষির মহামন্ত্র যখন ভারত গেল ভুলিয়া তখনই সে তাহার জ্ঞানশক্তি, ঐশ্বর্য সব হারাইল। তখনও যোগী ও সাধকদের মধ্যে কেহ কেহ চারিদিকের সব কৃপণ নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া সিন্ধুনদ পার হইয়া যাইতেন দেশ-দেশান্তরে তীর্থযাত্রায়। তখন আটক নগরেই ছিল সিন্ধু নদীর পার হইবার ঘাটি। বহু লোক সেখানেই পড়িত আটক।

শুধু বীর সাধকেরাই মিশরের নীলনদে, "রুসিয়া দেশের জ্বালামুখী", বাকুতে, কাশ্যপ সাগরে, কৃষ্ণসাগরে, যাইতেন তীর্থযাত্রায়। যখন তাঁহারা আটকনগরে সিন্ধুনদ অতিক্রম করিতেন, তখন চারিদিক হইতে লোকে বাধা দিবার জন্য হাঁ হাঁ করিয়া উঠিত; তখন তাঁহারা বলিতেন, "সব দেশই তো ভগবানের, তার মধ্যে আর বাধা-আটক আছে কোথায়? যাহার মনের মধ্যে আছে আটক, সেই বাঁধা পড়ে এই আটকপুরীতে।"

সবহী দেস গোপাল কী
তা মেঁ অটক কহাঁ।
জিস্‌কে মন মেঁ অটক হৈ
সোহী অটক রহা॥

প্রমাণ-পঞ্জী

১ ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, সপ্তম পাঞ্চিকা, তৃতীয় অধ্যায়, তৃতীয় খণ্ড